নির্বাচিত মঙ্গলকাব্যে তন্ত্রের উপাদান: ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

বিশ্বজিৎ ঘোষাল

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

নির্বাচিত মঙ্গলকাব্যে তন্ত্রের উপাদান: ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Dr. Ananya Baruya and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated :

Candidate :

Dated :

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের আকর্ষণ শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এমন ভাবাটা অন্যায়, গ্রাম-গঞ্জে যাত্রাপালায় বহুলাংশে মঙ্গলকাব্যের অংশবিশেষ অভিনীত হয়। মঙ্গলকাব্যের বহু অংশ তাদের মুখস্থও বটে। আমার ছাত্রজীবনে মঙ্গলকাব্যের প্রতি আকর্ষণ বিদ্যালয় জীবন থেকে। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন পাঠ্য বিষয়ে আমাদের একটি কবিতা পড়তে হত, সেটি হল দ্বিজমাধব রচিত 'ভাঁড়ুদত্তের বেসাতি'। ভাঁড়ুদত্ত কীভাবে ভয় দেখিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে জিনিসপত্র আদায় করত এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে সে পর্যুদস্ত হল তারই আখ্যান ছিল কবিতাটি। পরবর্তীকালে স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ার সময় মঙ্গলকাব্য গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, ভালো করে বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হই। সাধারণত মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়-এর সঙ্গে কম বেশি সবাই পরিচিত। কিন্তু এই কাব্যধারার অন্যান্য কবিরাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুগোত্তীর্ণ যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তাও কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। সেই বিষয়গুলি জানার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে জানার আগ্রহ বাড়ে। মঙ্গলকাব্যকে বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এটি হল প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়ত তন্ত্র দর্শন একটি বিশালাকায় বিষয়। যে বিষয়ের কোনো অন্ত নেই। ছোটোবেলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প পড়ি। সেই ধারার গল্প আরো পড়ি তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনিতে। ফলে তন্ত্র দর্শনের প্রতি উৎসাহ বাড়ে। এই ধারার অনেক বই তারপর পড়েছি এবং সংগ্রহ করেছি। মঙ্গলকাব্যের কবিরা শুধুমাত্র পুরাণ, সাহিত্য, দর্শনে পারদর্শী ছিলেন না, তাদের মধ্যে অনেক কবি তন্ত্রচর্চাও করতেন। কাব্যে সেই প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'ভাবেই পড়েছে। এই বিষয় নিয়ে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা মাননীয়া স্মৃতিকণা চক্রবর্তী। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *মঙ্গলকাব্য: পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা*- এই সূত্রে পড়ার সুযোগ হয়। মঙ্গলকাব্যে তন্ত্রের উপাদান কী রকম হতে পারে সেই বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম এবং তারই ফলশ্রুতি এই গবেষণা পত্র।

এই গবেষণার কাজে সাহায্য পেয়েছি বরানগর এরিয়া লাইব্রেরী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীকে জানাই কৃতজ্ঞতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক মাননীয়া আইভি আদক ও মাননীয় হরিশ মণ্ডল-কে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই; বহু মূল্যবান গ্রন্থ দিয়ে ওঁনারা আমায় সাহায্য করেছেন। অধ্যাপিকা স্মৃতিকণা চক্রবর্তীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি না থাকলে আমার এই গবেষণার কাজে এগোনই হতো না। অধ্যাপিকা দেবার্চনা সরকার, অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার, অধ্যাপক নির্মাল্যকুমার ঘোষ-কে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, যাঁরা বহু তথ্য দিয়ে আমায় সমৃদ্ধ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্নেহাশিস দাসকর্মকার বহু তথ্য দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন, তাকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. অনন্যা বড়ুয়া মহাশয়াকে। যার নিরন্তর উৎসাহ, সহায়তা না পেলে আমার এই গবেষণা পত্রটি পূর্ণতা পেতো না। ওঁনাকে জানাই আন্তরিক প্রণাম। উৎসাহী গবেষকদের মনে আমার গবেষণা কর্মটি এক নতুন আলোর দিশারি হবে বলে আশা রাখি।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৩
প্রথম অধ্যায়- তন্ত্র সম্পকিত সাধারণ ধারণা ও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে সম্পক নিণয়	৪-১১
দ্বিতীয় অধ্যায়- মঙ্গলকাব্যের ধারা: প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান	১২-১৯৭
ক. মনসামঙ্গল	
খ. চণ্ডীমঙ্গল	
গ. ধমমঙ্গল	
তৃতীয় অধ্যায়- মঙ্গলকাব্যের ধারা: অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান	১৯৮-৩৫৩
ক. অন্নদামঙ্গল	
খ. বাশুলীমঙ্গল	
গ. গোসানীমঙ্গল	
ঘ. কালিকামঙ্গল	
ঙ. শীতলামঙ্গল	
উপসংহার	৩৫৪-৩৫৫
গ্রন্থপঞ্জি	৩৫৬-৩৬৯

ভূমিকা

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ বিষয় হল মঙ্গলকাব্য। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এমনকি তারও পরে অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। গোটা বাংলাদেশেই এই মঙ্গলকাব্যসমূহের অসাধারণ প্রভাব দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের অনেকেই আর্য পরিমণ্ডলের নন, গ্রাম্য পরিবেশে ও সমাজে এঁদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। তাই এঁরা লৌকিক ও অপৌরাণিক গ্রামীণ আদর্শ থেকেই উদ্ভূত। চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, বাশুলী প্রভৃতি লৌকিক অর্থাৎ গ্রামের দেব-দেবী বাঙালি আর্যেতর সংস্কার বহন করেছেন। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা অনেক আগে থেকেই ছড়ায়, পাঁচালি, ব্রতকথায় নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন।

বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণের পর সমাজে ও সাহিত্যে নতুন করে একাত্মক প্রভাব দেখা গেল। বাংলাদেশে প্রথমে পাঠান আমল, তারপর এল মুঘল আমল। ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দারুণ বিপর্যয়ের ফলে সাধারণ মানুষের মনে শান্তি বা স্থিরতা ছিল না। তাই বিপদে-আপদে মানুষ ভয়ে-ভক্তিতে দেবতার স্মরণ নিত। হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চণ্ডী দেবীর পরিকল্পনা, সাপের বিষদন্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মনসার পরিকল্পনা ইত্যাদি। তাই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা ভক্তের কাছে বরাভয় মূর্তিতে উপস্থিত হয়েছেন। একদা এই সমস্ত আর্যেতর গ্রাম্য দেব-দেবী নিম্ন সমাজে পূজিত হলেও ধীরে ধীরে অস্থিরতার সময়ে সমন্বয়ের যুগ শুরু হলে তাঁরা উচ্চবর্ণের শ্রদ্ধালাভ করতে শুরু করলেন।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনির ক্ষেত্রে মূল কাহিনি ধারা মূলত তিনটি- *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* । এছাড়া অন্যান্য অপ্রধান ধারার মধ্যে- *অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অনার্য ধারার মধ্যে তন্ত্র ও শক্তিতত্ত্বের ধারণা প্রাচীনকালে নীচু শ্রেণির মানুষের মধ্যে চলে আসছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমর্থন সে কোনোকালে পায়নি। রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের দরুন মূল ধারার স্রোতে তার কিছুটা উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে ঠাঁই হয়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় দেব-দেবী থেকে শুরু করে তাঁদের কাব্যে কতটা তন্ত্রের উপাদান গৃহীত হয়েছে সেটাই আমার আলোচ্য বিষয়।

মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে কখনো দেবীর রূপ পরিকল্পনায় বা কাব্যের অভ্যন্তরে তন্ত্রের গভীর উপাদান লক্ষণীয়। যুগের সঙ্গে সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিদের ঐকান্তিক বিশ্বাস কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। গবেষণার অধ্যায় বিভাজনে ভূমিকার পরবর্তী অংশে বর্ণিত তন্ত্র সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা ও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক। ‘তন্ত্র’ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে নানান অর্থ পাওয়া যায়। অনেক সময় কৃষিকেন্দ্রিক জাদু অনুষ্ঠান হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা এই ধরনের অনুষ্ঠানের পিছনে মানবীয় প্রজননের সাহায্যে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির প্রয়াসও

পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্র বিষয়ে নানা মতকে উদ্ধৃত করে এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে তন্ত্র নিয়ে সাধারণ মতামত কী এবং এর প্রাসঙ্গিকতা বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যে কতদূর প্রভাব ফেলেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি স্থান পেয়েছে। *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* কাব্যধারার কোন কোন কবিদের কাব্যের মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মূল ধারায় সব কবি স্থান পাননি। যেসব কবিদের কাব্যের আলোচনায় তন্ত্র প্রসঙ্গ বৃহৎ পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের কথাই মূলত এখানে আলোচিত।

মঙ্গলকাব্য বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্যসাধনা হলেও এর সৃষ্টিপ্রেরণা কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাস থেকে আসেনি। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয় বহন করছে। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির ওপরই এদের প্রতিষ্ঠা। পাশাপাশি কাব্যে সেই সময়ের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি। *অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, গোসানীমঙ্গল* I মধ্যযুগের বাংলার সমাজ নতুন ও পুরনোর মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্যবিধান করে পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি সংস্কারকে একসূত্রে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছে। মাতৃতান্ত্রিক ধারা অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর সঙ্গে তন্ত্রের ধারা এই কারণেই মিলন সহজসাধ্য হয়েছিল কারণ উভয়েই স্বরূপগত দিক থেকে লৌকিক এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সার্বিক ভাবে এই মঙ্গলকাব্যগুলির গুণাগুণ বিচারের পাশাপাশি, কাব্যে তন্ত্র ব্যবহারের তাৎপর্য, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ কাব্যের নিরিখে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার অংশে গবেষণার মূল অভীষ্ট বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা কর্মের সদর্থক দিকগুলি তুলে ধরাই এই অংশের মূল অভিপ্রায়।

আমার এই গবেষণার পূর্বে মাননীয় গবেষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই বিষয়ে কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণার পরিধি প্রাচীন ও মধ্যযুগ উভয় অংশেই তন্ত্রের উপাদান অন্বেষণ মূল অভিপ্রেত ছিল। সামাজিক দায়বদ্ধতা বা পদক্ষেপগুলি এই গবেষণায় অনুপস্থিত। আমার এই কাজে আমি শুধু মঙ্গলকাব্যকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছি।

মঙ্গলকবিরা শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃত্যবিদ্য হওয়া সত্ত্বেও তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে কখনো উদাসীনতা দেখাননি। কিছুটা যুগধর্মের কারণে বা কিছুটা নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ থেকে তাঁরা কাব্যে তন্ত্রের উপাদান ব্যবহার করেছেন। আমার এই গবেষণায় কবিরা কেন তন্ত্রশাস্ত্রের উপাদানকে গ্রহণ করেছেন এবং কোথায় কোথায় কীভাবে তুলে

ধরেছেন তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। তন্ত্রের উপাদানের পাশাপাশি সমকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রদত্ত গবেষণাটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- মূল আলোচনা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, নির্ঘণ্ট- এই চারটি ভাগে গবেষণা কর্মটি বিভাজন করা হয়েছে।
- মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কবিদের মূল কাব্যগ্রন্থগুলি এই আলোচনায় পর্যায়ভুক্ত।
- সহায়ক গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে তন্ত্রগ্রন্থ, বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে।
- সমগ্র গবেষণাটি কালপুরুষ ১২ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। শিরোনামগুলি ১৪ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। লেখার মধ্যে ১.১৫ দূরত্ববিধি ব্যবহার করা হয়েছে।
- গবেষণাপত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান অনুসৃত হয়েছে।
- গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA হ্যাণ্ডবুক-এর মান্য বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

তন্ত্র সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা ও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় পৃ. ৪-২১

- তন্ত্রের উদ্ভব ৫-৮
- তন্ত্র সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা ৯-১২
- মঙ্গলকাব্যর সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক ১৩-২১

তন্ত্রের উদ্ভব

তন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ বিষয়গুলি জানার পূর্বে প্রথমে 'তন্ত্র' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'তন্ত্র' শব্দের বহু অর্থ বিদ্যমান। 'তন্ত্র' শব্দটি শুনলেই আমাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠান-এর অনুষঙ্গ মাথায় আসে। সাধারণভাবে ধর্মীয় অনুষঙ্গর সঙ্গে জড়িত থাকলেও 'তন্ত্র' শব্দটির গভীরতা ব্যাপক। *কাশিকাবৃত্তি*-তে 'তিতুত্রতথসিসুসরকসওষু' চ (৭/২/৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'উণাদিস্বপি সর্ব ধাতুভ্যঃ স্ট্রন্'- এই নিয়ম অনুসারে তন্ ধাতুর উত্তর স্ট্রন্ প্রত্যয় করে 'তন্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে। 'তন্' ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। আবার তন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে-'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন ইতি তন্ত্রম্'- এই শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞান বিস্তারিত হয় এই কারণে একে তন্ত্র বলা হয়। সংস্কৃতশাস্ত্রে 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ বহু অর্থক। জ্যোতিষশাস্ত্রের অংশবিশেষকে বলা হয়। সাংখ্যদর্শনকেও অনেকক্ষেত্রে 'তন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়।[১] সুকুমার সেনের মতে,'...'তন্' ধাতুতে 'ত্র' প্রত্যয় করে, পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে, 'মন্ত্র, যন্ত্র, বস্ত্র, পবিত্র, অরিত্র' ইত্যাদি শব্দের মতো। এই 'ত্র' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি প্রায় সবই বাস্তব 'উপায়া' (অর্থাৎ instrument) অর্থে রূঢ় হয়েছে। 'মন্ত্র'ও তাই। যাতে করে মনে করা যায়, স্মরণ করা যায়,- আউড়ে যাবার উপায়। এইরকম মৌলিক অর্থে তাঁত যন্ত্র বোঝাতে 'তন্ত্র' শব্দের ব্যবহার *ঋগ্বেদ* থেকে পাণিনি হয়ে চলে এসেছিল সংস্কৃত ভাষায়। এই মৌলিক অর্থ থেকে সহজেই এসে গিয়েছিল একটু নতুন অর্থ 'তাঁতের মতো টানা-পোড়েন করে বোনা বা গাঁথা। আমাদের দেশে প্রস্তুত সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে পুরোনো গল্পের বইটির নাম *পঞ্চতন্ত্র আখ্যান*, সংক্ষেপে *পঞ্চতন্ত্র* । এই নাম হবার কারণ বইটির মধ্যে আর একটি গল্পের মধ্যে আর একটি গল্প-এইভাবে টানাপোড়েনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলে boxing of tales, যার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ মিলছে আরব্য-উপন্যাসে।

এর সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির আরো একটি গৌণ অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল-কাঠামো (frame work), কল, কৌশল technique, (technical matter), যন্ত্রের কাজ (mechanical matter), দেহযন্ত্রের কাজ (physical exertion) ইত্যাদি এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার মিলেছে বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও পরবর্তীকালের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে।'[২] আবার আভিধানিক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে-'...যে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় সাধনা করলে জীব মোক্ষ লাভ করে সেই শাস্ত্রকে তন্ত্র বলা হয়। বিশেষ ধরণের অধ্যাত্ম সাধন শাস্ত্র। তত্ত্ব ও মন্ত্রের সমন্বয়ে ত্রাণ আসে তাই নাম তন্ত্র। তত্ত্ব ও মন্ত্রের সাধনে জীব উন্নত স্তরে ওঠে। তত্ত্ব অর্থে বিশ্বের মৌল সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ সৎ-বিষয়ের জ্ঞান। মন্ত্র হচ্ছে চিৎ-বিষয়ক জ্ঞান। সৎ ও চিৎ এর মিলনে আনন্দ। সচ্চিদানন্দ বিভব থেকে বিশ্বের সৃষ্টি। পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্ব বা শিব তত্ত্ব, ছয়টি বিশ্ব বা শুদ্ধাশুদ্ধ বা বিদ্যাতত্ত্ব এবং পঁচিশটি অশুদ্ধ বা আত্মতত্ত্ব মোট ছত্রিশটি তত্ত্ব। তন্ত্রে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই ; ফলে শিব ও শক্তি অভিন্ন।'[৩]

‘তন্ত্র’ শব্দের অর্থ নিরূপণ করা কিছুটা গেলেও তন্ত্রর উৎপত্তিস্থান বা কোথা থেকে তন্ত্রের সূত্রপাত এ নিয়ে বিতর্কের অবসান নেই। কারোর কারোর মতে, তন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছে। আবার কারোর কারোর মতে, তন্ত্র এসেছে বৌদ্ধধর্মর পরবর্তী সময়ে। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করে তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্রদর্শনের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে। এই সবকটি মতের নিরিখে তন্ত্রের প্রাচীনতা প্রমাণের চেষ্টা আমরা করব।

প্রাচ্য মনীষী ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে অনেকেই এটি প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তন্ত্রের সূত্রপাত পাশ্চাত্য দেশ থেকে। পণ্ডিত গ্রীয়ারসন ও তাঁর মতানুবর্তীদের অনেকেরই ধারণা, আর্যগণ যখন ভারতে প্রবিষ্ট হয় তখন তারা প্রধানত দুটি দলে বিন্যস্ত ছিল। একটি দল বা ভাগ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের প্রান্তদেশ স্থান গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় বিভাগ বা দলটি অবাধে ভারতভূমিতে প্রবেশ করে, বিশেষভাবে ভারতের উত্তরাঞ্চলে তাদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করে। সেখান থেকেই পরবর্তীকালে আগমনবার্তার সম্ভাব্য দিকনির্দেশ করেছেন।[৪] কিন্তু এইমতগুলি অনেকাংশে পক্ষপাতদুষ্ট। আমাদের দেশে কিছু কিছু জিনিস বা ধর্ম যা আমাদের একান্তভাবেই নিজস্ব সৃষ্টি; তাই এই মতকে কোনোভাবেই সমর্থন করেননি পণ্ডিতমহল।

অন্যদিকে তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান একদল সমালোচক ধরে নিয়েছেন যে, বৌদ্ধধর্ম থেকে আগত। সমালোচক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-র মতে- ‘The development of Tantra made by the Buddhists and the extraordinary plastic art they developed, did not fail again to create an impression on the mind of the Hindus,and they readily incorporated many ideas, doctrines and Gods, Originally conceived by the Buddhists in their religion and literature. Hindu Goddesses like Mahachinatara, Chinnamasta, Kali etc were Originally Buddhist.’[৫]

যদি বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করা হয় তন্ত্রধর্ম, তাহলে তন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম পূর্ববর্তী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবার কথা। কিন্তু তন্ত্রধর্ম বা সাহিত্যর প্রতি লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, বৌদ্ধধর্ম সংগঠিত হবার পূর্ব থেকেই তন্ত্রের অস্তিত্ব বাংলাদেশে বিদ্যমান। তাহলে কোনোভাবেই সমালোচক বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়।

তন্ত্র সংস্কৃতি কতটা প্রাচীন তার প্রমাণ দিতে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মৃন্ময়ী স্ত্রীমূর্তিগুলি প্রমাণ করে, শক্তিসাধনা বৈদিক যুগের বহুপূর্বে অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত।[৬] ড.শশিভূষণ দাশগুপ্ত-এর[৭] এই মতের স্বপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর মতে, তন্ত্রাচার হিন্দুদেরও নয়, বৌদ্ধদেরও উদ্ভূত নয়। এর উৎস অতি আদিম। সেই আদিম উৎস থেকেই দর্শন বা তত্ত্ব বাদ দিয়ে তন্ত্রাচার অবিস্মরণীয় কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং যুগে যুগে সকল ধর্মে গৃহীত হয়ে কোথাও হিন্দুতন্ত্রে কোথাও বা বৌদ্ধতন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি যদি লক্ষ করা যায় তাহলে পালযুগে যে বৌদ্ধধর্ম পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়, পরবর্তীকালে সেন রাজাদের উদাসীন মনোভাব ও অত্যাচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম আত্মগোপন করে এবং সমাজের নিম্নশাখায় বসবাসকারী ধর্মের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্তকরণ করে। ফলে পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্ম তন্ত্র ধর্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে এবং তারই ফলশ্রুতিরূপে বৌদ্ধধর্মর বিভাজন রেখার সূত্রপাত হয়।

মূলত তন্ত্র ধর্মের পীঠস্থান যে বাংলাদেশ এবং তার বৃদ্ধিমূল যে বাংলাদেশ থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল সমালোচকও ঐতিহাসিকরা বারে বারে তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন—'আর্যবর্তে শাক্তধর্ম যে গুপ্ত-গুপ্তোত্তর পর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল আগম ও যামল গ্রন্থগুলিই তাহার প্রমাণ। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ্য অন্যান্য ধর্মের স্রোত-প্রবাহের সঙ্গেই শক্তিধর্মের স্রোতও বাংলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই দেশ পরবর্তী শক্তিধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব আগম ও যামল গ্রন্থের ধ্যান ও কল্পনাই, অন্তত আংশিক কত, পরবর্তীকালে সুবিস্তৃত তন্ত্র সাহিত্যর ও তন্ত্র ধর্মের মূলে এবং এই তন্ত্র সাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে। তন্ত্র ধর্মের পরিপূর্ণ ও বিকাশও এই দেশেই।'[৮]

বাংলাদেশ থেকেই অন্যান্য দেশে তন্ত্রর শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হয়েছে। সমালোচক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর স্বপক্ষে অধ্যাপক উইন্টারনিটস এর মতকে উল্লেখ করে বাংলাদেশকেই তন্ত্রর উৎপত্তিস্থান হিসেবে পরোক্ষে মান্যতা দিয়েছেন। তাঁর মতে—'বাঙ্গালা দেশকেই তন্ত্রের আদিস্থান বলিয়া মনে হয়। সেই স্থান হইতে উহা আসামে ও নেপালে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়া ভারতের বাহিরে চীন ও তিব্বতেও বিস্তার লাভ করে।'[৯] [দ্র.১]

কিন্তু তন্ত্র বিষয়ক অর্থাৎ উৎপত্তি নিয়ে আরেকটি মতও সমালোচক মহলে চলমান আছে। সেটি হল তন্ত্রের আগমন বা উৎপত্তি *বেদ* থেকে গৃহীত। অনেকের মতে, *অর্থব বেদ* ও *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এ তান্ত্রিক মন্ত্র 'ফট, খট, বৃষট্, নমঃ' প্রভৃতিকে ম্যাজিকাল বা অভিচারিক মন্ত্র বলেন যা তন্ত্রপ্রভাবযুক্ত বলে মনে করা হয়।[১০]

সমালোচক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী *রুদ্রযামলম্*[১১] গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মহাদেবী অথর্ব বেদসাক্ষিণী বা বুদ্ধেশ্বরী বৌদ্ধ দেবীশক্তি বলে কল্পনা করেছেন তিনি।[১২] [দ্র.২] *বেদ*-এ যে তন্ত্রের প্রভাব আছে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। কিন্তু তার থেকে এটি প্রমাণিত নয় যে, *বেদ* থেকে তন্ত্রের সৃষ্টি। *বেদ* কারোর একার সৃষ্টি নয়, নানান সময়ে এটি সংকলিত। তন্ত্রের বিষয়েও একথা খাটে। সাধারণত যখন সমান্তরালভাবে কোনো দুটি ধর্ম পাশাপাশি চলতে থাকে তখন উভয় ধর্মের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবেই দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং একে অপরকে প্রভাবিত করে।

তন্ত্র ও *বেদ*-এর সংকলন ঠিক কোন সময় থেকে তা পুঁথি-পাঁজি দেখে বলা যায় না, এটি নির্ণয় করা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু দুই ধর্মের স্বরূপগত ঐক্য বা ভাব দেখে কিছুটা বোঝা সম্ভব যে সম্ভবত দুই ধর্মের দর্শন গত ঐক্য

এক। আসল কথা বেদে প্রবাহিত ধর্মস্রোতই কালে তন্ত্রর নতুন ধারায় বেগমান হয়েছে। *বেদ* ও তন্ত্রের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। উভয়কে একত্র করলে সনাতন ধর্ম নীতির শাস্ত্রীয় পূর্ণরূপ লক্ষণীয়। তন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান যেমন *বেদ*-এ গৃহীত হয়েছে তেমনি তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ, আচার-সংস্কারের ক্ষেত্রে বৈদিক রীতিনীতি গ্রাহ্য হয়েছে। উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই চরম লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি।

বেদ ও তন্ত্র যে একে অপরের পরিপূরক *মহাভাগবত*-এ এর স্বপক্ষে অন্যভাবে কথাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— 'দেবী শিবকে বলছেন-শঙ্কর,আগম আর বেদ আমার দুই বাহু। আমি এই দুই বাহুদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ধারণ করে রয়েছি। যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি মোহবশে এই উভয়কে লঙ্ঘন করে সে আমার এই উভয় হস্তভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়। বেদ ও তন্ত্র উভয়ই শ্রেয়ের হেতু, দুরূহ ও দুর্ঘট, সুধী ব্যক্তিদেরও দুর্জ্ঞেয় এবং অপার। বুদ্ধিমান এই উভয়ের ঐক্য বিবেচনা করে ধর্ম আচরণ করবে, মোহগ্রস্ত হয়ে কখনও এদের মধ্যে ভেদ করবে না।' [১৩]

এছাড়াও *পরশুরামকল্পসূত্রম্*-এ উল্লেখিত-'ভগবান পরমশিব ভট্টারক সেই-সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে অষ্টাদশবিদ্যা, সমস্তদর্শন, লীলাচ্ছলে প্রণয়ন করে স্বাত্মাভিন্না সংবিন্ময়ী ভগবতী ভৈরবীর প্রশ্নের উত্তরে বেদের সারভূত অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। করুণাময়ী ভগবতীর প্রশ্ন এবং করুণাময় পরমশিবের উত্তরে উভয়েরই উদ্দেশ্য জীবের শ্রেয়োবিধান। বিশেষ করে যেসব লোক নিখিল বেদার্থ গ্রহণে সমর্থ নয় বা বেদে যাদের অধিকার নাই সেইসব লোকেদের প্রতি কৃপা করে পরমশিব তাদের মুক্তির জন্য বেদের সারভূত তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণয়ন করেন।[১৪] দ্র.৩

সুতরাং বলা যায় এই প্রেক্ষিতে যে, তন্ত্র ও *বেদ* ভাবগতভাবে এক, এবং একে অপরের পরিপূরক। *বেদ* তন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা নয়, তন্ত্রের সৃষ্টি ও পত্তন বাংলাদেশের ভূমিতে। তাতেই তার শ্রীবৃদ্ধি এবং তাতেই তার বিকাশ । *বেদ*-এর সঙ্গে তন্ত্রের আচার-সংস্কার-এর মিল পাওয়া যায়। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-এর স্বপক্ষে যুক্তিও খাড়া করেছেন- 'Elements of the Various Tantrika rites are distinctly traceable to the Vedic rites... They are to be found even in the earliest Vedic works e.g. the Rigveda, as also in other parts of the Vedic Literature.[১৫] তান্ত্রিক আচার ও সংস্কার যেমন *বেদ*-এ বর্ণিত ক্রিয়াকলাপকে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি *বেদ*-এর আচার তন্ত্রদর্শনকেও প্রভাবিত করেছে । সুতরাং উভয়দর্শনই একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত, কেউ কারোর সৃষ্টিকর্তা নয়। বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই তন্ত্রের আবির্ভাব এবং সেখানেই তার বিকাশ, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও সম্ভাব্যতার দিক থেকে এটিই সত্য।

তন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

তন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জনমানসে নানারকম সংস্কার প্রচলিত আছে। কখনো সেটি ধর্মসংক্রান্ত একটি বিষয় বা কখনো সেটি 'Black Magic' কালা যাদু, বশীকরণ, মারণ, উচাটনের সাথে সম্পৃক্ত। আবার অনেকের ধারণা শাক্ত ধর্ম ও তন্ত্র একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সাধারণত ভারতীয় ধর্মবিকাশের প্রারম্ভ লগ্ন থেকেই লোকায়ত চিন্তাচেতনার, জ্ঞানবিকাশের সাথে ওতোপোতভাবে জড়িত ছিল তন্ত্রের অনুষঙ্গগুলি। বাংলাদেশেই তন্ত্র ধর্মের প্রকৃত ভিত্তিভূমি এবং এর পল্লবিত শাখা মধ্যযুগ থেকে সারা বাংলাদেশে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে আপন মহিমায়।

'তন্ত্র' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—তন্ ধাতুর উপর স্ট্রন্ প্রত্যয় তনোতি তন্যতে বা তন্ স্ট্রন্।'তন্' ধাতুর অর্থ বিস্তৃত করা। বংশবিস্তার-এর একটি মুখ্য অর্থ-তন্+অয়ট=তনয়। মনিয়ার উইলিয়ম্স্ এর মতে পুরানো পুঁথিপত্রে তন্ত্রের প্রজননার্থক ব্যবহার বিরল নয়।[১৪] তন্ত্রের প্রাচীনত্বের ক্ষেত্রে অনেক সময় কৃষিকেন্দ্রিক যাদু অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা এই ধরনের অনুষ্ঠানের পিছনে মানবীয় প্রজননের সাহায্যে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির প্রয়াস ও পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সবর্ত্রই আদিম কৃষিজীবী কৌমসমাজে ধরণীর ফলোৎপাদিকা শক্তিকে নারীজাতির সন্তান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার রীতি বর্তমান। সংস্পর্শ বা অনুকরণের দ্বারা একের প্রভাব অন্যের উপর সঞ্চারিত করা সম্ভব, এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যান ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

তন্ত্র মতে, 'যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। অর্থাৎ দেহরহস্যের মধ্যেই বিশ্বরহস্যের পরিচয় বা মূলসূত্র। তন্ত্রমতে, সৃষ্টিকার্য পুরুষ ও নারী উভয় আদর্শের সংযোগের ফল, তবে গুরুত্বের বিচারে নারী শ্রেষ্ঠ। পরবর্তী বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভের ফলে তন্ত্রর স্বাভাবিক ধারার সাথে বৌদ্ধধর্মের মিলন ঘটে এবং তন্ত্রের রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুষঙ্গ বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধতন্ত্রে নারী ও পুরুষ এই দুই আদর্শ প্রজ্ঞা ও উপায়। অথবা শূন্যতা এবং করুণা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনই হচ্ছে যুগনদ্ধ বা সমরস, নিজের ক্ষেত্রে যিনি তা ঘটাতে পারেন, তিনিই পূর্ণজ্ঞান ও পরম সুখ লাভ করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন। দেহই সকল সত্যের আবাসস্থল, বিশ্বের যা কিছু রহস্য তা দৈহিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। হিন্দুতন্ত্রে দেহের মধ্যে ষটচক্রের বা ছয়টি স্নায়ুচক্রের কথা আছে যেগুলি হল মূলাধার (পায়ুদেশ ও লিঙ্গমূলের তলদেশের মধ্যবর্তী অংশ), স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলের উপরদিক), মণিপুর (নাভি অঞ্চল), অনাহত (হৃৎপিন্ড অঞ্চল), বিশুদ্ধ (সুষুম্নাকান্ড ও গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগের সংযোগস্থল) এবং আজ্ঞা (দুই ভুরুর মধ্যবর্তী অংশ)। এছাড়া সর্বোচ্চ মস্তিষ্ক অঞ্চলকে বলা হয় সহস্রার। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের মাধ্যমে সহস্রার অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারলেই এই শক্তি তার উৎসে মিলিত হতে পারে।[১৫]

তন্ত্রের প্রকাশ বা অবতারণা সম্বন্ধে *শিবতত্ত্বরহস্য* গ্রন্থ থেকে জানা যায় সদাশিবের পাঁচটি মুখ হতে পাঁচপ্রকার তন্ত্রের উদ্ভব। পূর্বমুখের নাম 'সদ্যোজাত'। এই মুখ থেকে প্রকাশিত তন্ত্রগুলি 'পূর্বন্নায়' নামে খ্যাত। দক্ষিণ মুখের নাম 'অঘোর'। এই মুখ থেকে নিঃসৃত তন্ত্রগুলির নাম 'দক্ষিণন্নায়'। পশ্চিমমুখের নাম 'তৎপুরুষ'। এই মুখ থেকে প্রকাশিত তন্ত্রসমূহের নাম 'পশ্চিমান্নায়'। 'বামদেব' নামক উত্তরমুখ হইতে উদ্ভূত তন্ত্রগুলি 'উত্তরান্নায়' বলে। ঊর্দ্ধ্বমুখের নাম 'ঈশান'। এই মুখ থেকে বিনির্গত তন্ত্রসমূহের নাম 'ঊর্ধ্বন্নায়'।[১৬]

তন্ত্রের ধারণায় সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে সর্বোচ্চ দেবতা একজন নারী, যিনি নানা নামে ও নানা রূপে কল্পিতা। শাক্তপুরাণসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী স্বয়ং আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীক রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন। এই আদ্যাশক্তি বা শক্তিতত্ত্বের মূল সুপ্রাচীন যুগের মানুষের জীবনধারণ ও পালনের সঙ্গে যুক্ত। নারীর ভূমিকা সেখানে জীবনদাত্রীর ভূমিকা। সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরগুলির এই নারীশক্তির ভূমিকাই ছিল প্রধান। নারীশক্তির সঙ্গে পৃথিবীর, মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার যে ধারণার উৎপত্তি হয় তার থেকেই শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব। সমালোচক আহমদ শরীফ এর মতে—'নারীই জগৎকারণ আদ্যাশক্তি। তিনিই মহামায়া, কালী, তারা, শিবানী। নারী শক্তিতেই পুরুষ হয় শক্তিমান। শিব হচ্ছেন শক্তিমান। শিব-শক্তি অদ্বয়ও বটে, ভিন্নও বটে। সাধনায় শক্তিমান হওয়া তথা শিবত্ব উপলব্ধি করাই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য।'[১৭]

তন্ত্রের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য পরিষ্কার। তন্ত্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধী। তন্ত্র মতে, নারী কখনো অধঃপতিত হতে পারে না, ইচ্ছেমতো দীক্ষাদাত্রীও হতে পারেন। অসংখ্য নীচ জাতীয় গুরুর উল্লেখও তন্ত্রে দেখা যায়, যাঁদের মধ্যে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল সকলেই আছেন। এর পাশাপাশি তন্ত্রশাস্ত্রে আচার এক প্রসিদ্ধ বিষয়। আচার শব্দে সাধনার পদ্ধতি বা প্রণালী বোঝায়। এই তান্ত্রিক অনুশাসন অবলম্বন করে সাধককে অগ্রসর হতে হয়। প্রত্যেক আচার একে অপরের থেকে ভিন্ন, তাতে বিভিন্ন নির্দেশ আছে যা অবলম্বন করে আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিকাশ করতে হয়।

সাধকের শক্তি ও চিত্তবৃত্তির গঠনানুসারে আচার বিভিন্ন। পশু আচার প্রাথমিক সোপান। সাধারণ জীবের জন্যে এই আচারের ব্যবস্থা। পশু শব্দের অর্থ জীব। এ আচার শাস্ত্রবিধিসম্মত অধ্যায়। এ আচার শাস্ত্রবিধিসম্মত স্বাধ্যায়, দেবতা, পূজা, যম, নিয়ম, ধ্যান ইত্যাদি। এ বিধিমার্গসঙ্গত অনুষ্ঠানপ্রধান আচার। পশুমার্গে জীব ভাব থেকে যায়। জীবত্ব শিবত্বে লয় হয় না।

পরবর্তীস্তর বীর পর্যায়ে উন্নত চরিত্রের মানুষ বোঝায়। চরিত্র ও সদগুণের সাধনার দ্বারা পশু বীরে পরিণত হয়। বীরপর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন, সামাজিক মঙ্গলের স্বপক্ষে কাজ, ইন্দ্রিয়দমন, সমদৃষ্টি-অর্থাৎ এককথায় একটি মানুষকে সৎ ও সজ্জন হতে গেলে যা কিছু করার প্রয়োজন তা করতে হবে।

বীরপর্যায়ের পরবর্তীস্তর দিব্য পর্যায়ে আরো উন্নত স্তর যখন তার অর্জিত গুণাবলিকে তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দিব্য স্তরে তার বাইরে ও ভিতরের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। দিব্যপর্যায় আরো উন্নত স্তর যখন তার প্রাপ্ত তার নিজস্ব হয়ে যায়, যে গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যাবলি তার সত্তা থেকে আলাদা করা যায় না। এই স্তরে সে সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচারে দীক্ষা নিতে পারে। বীরাচারীর মধ্যে কিছুটা অহমিকাবোধ থাকে; সে সাচ্চা মানুষ, কিন্তু অন্তরে কোমল হলেও বাইরে কঠোর,কাজে কর্মে তার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ থাকে। কিন্তু দিব্যস্তরে সে নিষ্পাপ শিশুর মতো, সদা সন্তুষ্ট, সর্বক্রোধ থেকে মুক্ত।[১৮]

আরেকটি বিষয় যেটি তন্ত্রদর্শনের মূল আলেখ্য। তার প্রথমটি হল শিবশক্তির কামকলা, সাধক ও তাঁর সঙ্গিনীর আনুষ্ঠানিক বা প্রতীকী মিলন যা পঞ্চ-মকার সাধনা বা পঞ্চতত্ত্ব নামে খ্যাত। আর দ্বিতীয়টি হল শক্তির উৎসে প্রত্যাবর্তন বা ষটচক্রভদ। এই বিষয় নিয়ে বহু মতামত থাকলেও বিষয়টি পরিষ্কার করা আবশ্যক। এগুলি ধর্মীয় রীতিনীতির এক একটি অঙ্গ। পঞ্চ-মকার সাধনার চারটি ম-কার হল মুদ্রা, মাংস, মৎস্য, মদ্য। মুদ্রা শস্যর প্রতীক ,মৎস্য প্রজননের, মাংস ও মদ্য সৃষ্টির উপাদান কারণের। প্রজননের প্রতীক হিসাবে মৎস্য প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই মাতৃদেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত। মদ্যকে বলা হয় কারণ যা সর্বত্রই জীবনীশক্তি হিসাবে কল্পিত এবং সেই হিসাবেই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। শেষ ম-কার হল মৈথুন। মৈথুনে বীর্যধারণের দরকার হয় না। রেতক্রিয়া অবিধেয় নয়। এ সাধনা করতে হয় নারীভাবে-'বামা ভুত্বা যজেৎ পরাম্‌। 'লতা, ভগযানযন্ত্র, পদ্ম তথা নারীর যোনি-প্রতিম পূজার উপাদান। আসন, ন্যাস, মুদ্রা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, বর্ণ রেখাত্মক যন্ত্র, যোগক্রিয়া, দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ। এ সাধনা গুহ্য।

দ্বিতীয় রহস্যটির মূল কথা শক্তির নিজস্ব উৎসে প্রত্যাবর্তন। শক্তি অণুতে ও মহতে যুগপৎ বিরাজমান এবং মানব দেহে কুণ্ডলিনীশক্তিরূপে মূলাধারচক্রে সুপ্ত থাকেন। এই কুণ্ডলীশক্তিকে কায়সাধনের দ্বারা জাগ্রত করে মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান আর পর্যায়ক্রমে মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধি ও আজ্ঞাচক্রের মধ্য দিয়ে সহস্রারে উপনীত করাই সাধকের লক্ষ্য। কুণ্ডলিনীশক্তিকে সম্যক্‌ জাগরিত করে নিম্নতর চক্রগুলির মধ্য দিয়ে সহস্রারে প্রেরণ করার অর্থশক্তিকে তাঁর উৎসে পৌঁছে দেওয়া। তাহলেই শিবশক্তির সামরস্য ঘটবে।[১৯]

তন্ত্রের আরেক অংশে উল্লেখিত হয়েছে শান্তিক, পৌষ্টিক, মারণ, বশীকরণ, উচাটন প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়ার পদ্ধতি। এই ক্রিয়াগুলি একমাত্র ঐহিক ফললাভের উপায়স্বরূপ। এতে চিত্তশুদ্ধি বা অপর কোনপ্রকার পারত্রিক ফল লাভের আশা নেই। অনেক সমালোচক বা সাধারণ জনমানসে তন্ত্রের নিন্দিত বিষয় এই কারণেই। এগুলি তন্ত্রশাস্ত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ হতে পারে কিন্তু সাধকজীবনে বৃহত্তর পরিসর গড়ে তুলতে পারে না। জীবনের বৃত্তি ভোগের চরিতার্থতা চায়। এই স্পৃহাকে সহজে সরানো যায় না। জীবনে ভোগ স্বাভাবিক বৃত্তি, এতেই জীবনের আনন্দ, বৃদ্ধি ও অখণ্ড অনুবৃত্তির বিকাশ সহসা নিরোধ করে এর উল্লাস নষ্ট করতে তন্ত্র চায় না। জীবনের সবখানিই তন্ত্র গ্রহণ করেছে-ভোগ ও মোক্ষ। জীবনবাদ ও মোক্ষবাদ দুই-ই তন্ত্রে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতিবশ্যতা,

সংকল্পসিদ্ধি তান্ত্রিক সাধক সবটাই আয়ত্ত করতে চেয়েছে; কিন্তু এ ভোগ শুধু ভোগের জন্যই ভোগ নয়। জীবনে দেখার প্রকৃত পথ সাধকের মানসিক দৃষ্টির উপর নিহিত।

যেসব ভোগবৃত্তি মানবজীবনকে এত চঞ্চল করে সেগুলি তন্ত্র একেবারে পরিহার করতে চায় না, বৃত্তিগুলি জীবনে এমনভাবে বহমান যে, তাদের বিনাশে জীবনের পরিসমাপ্তি। তত্ত্বের অধিকারের দ্বারা তন্ত্র তাদের পরিশীলিত করতে চায়। স্থূল বৃত্তিগুলিই সূক্ষ্মে পরিণত করাই এ সাধনার প্রথম স্তর। মহাশক্তিকে গ্রহণ করে জীবনের প্রবৃত্তিগুলিকে সজীব ও সুতীক্ষ্ম করা ও তাদের পূর্ণ বিকাশ করাই তন্ত্রের লক্ষ্য।[২০]

মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক

মঙ্গলকাব্যর সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলে তৎকালীন বাংলাদেশের তিনটি বিষয় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন; প্রথমত তৎকালীন সময়ের সমাজজীবন, দ্বিতীয়ত সামাজিক জীবনের সাথে ওতোপোতভাবে জড়িত ধর্মীয় জীবন, তৃতীয়ত সমাজের চালিকা শক্তি রাজনৈতিক কর্মধারা বা শাসকশক্তির কর্মকাণ্ড। মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা এবং অপরদিকে তন্ত্র একটি ধর্ম-দর্শন শাখার অঙ্গ সর্বোপরি ধর্মসংস্কৃতির নিগূঢ় জীবনচর্যার ফল। অনেক সময় সেই ধর্ম এক একটি জনগোষ্ঠীর কাছে গৃহীত, সেটি সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে হতে পারে বা উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছে কিছুটা পরিশীলিতভাবে গ্রহণীয় হতে পারে। সমাজ-সংস্কৃতির পারম্পর্যে মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাছে গৃহীত হয়েছে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে। মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত লিখিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেকার সময়। উনবিংশ শতাব্দী যুগ পরিবর্তনের সময় তাও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মঙ্গলকাব্য দু-একটি রচিত হয়েছে। এই সময়সাপেক্ষে মঙ্গলকাব্যর সঙ্গে তন্ত্রের কীভাবে মেলবন্ধন হল বা বলা যেতে পারে কিভাবে ভাববন্ধন দৃঢ় হল তাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা যদি লক্ষ করা যায় তাহলে ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষাপটের একটি রূপ রেখা পাওয়া যাবে। পাল আমলের সময় মূলত পাল রাজাদের যদি আমরা দেখি, তারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বেশি আস্থাবান, যার ফলশ্রুতিরূপে বৌদ্ধবিহার, স্থাপত্য ও ধর্মের প্রসার ঘটে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, পরধর্মপীড়ক হিসাবে তাদের নাম ইতিহাসে খুব একটা উল্লেখ নেই। পরবর্তী সময়ে পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা বাংলার সিংহাসনে বসেন; তারা ছিল ঘোর বৌদ্ধধর্ম বিরোধী এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাদের আমল থেকেই বৌদ্ধধর্ম গৌরবের সিংহাসন থেকে স্থানচ্যুত হয় এবং বাংলাদেশ থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম বলা ভুল হবে, অন্যান্য ধর্মও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক সেনরাজাদের ভয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

সেনরাজাদের পরবর্তীকালে অরাজকতার সুযোগে মুসলিম আক্রমণ শুরু হয় এবং হিন্দুরাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে। সাধারণ আপামর জনগণ এতদিন হিন্দুরাজার অত্যাচার সহ্য করছিল, এবার শুরু হল মুসলমান শাসকের অত্যাচার এবং বিধর্মীর ধর্মের পীড়ন। সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করল, বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ এমন এক শক্তির আশ্রয় খুঁজতে লাগল যা তাদের মানসিক ও আত্মিক আশ্রয় হয়ে উঠবে; কারণ মুসলমান শাসক যখন সাধারণ মানুষের ধর্মীয় নিরাপত্তার প্রাচীর ভেঙে দেয় তখন সাধারণ মানুষ দুঃসহ জীবনের অন্ধকারে পদদলিত হতে থাকে। ইতিহাসেও এর প্রমাণ মেলে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর রাজত্বকালের বিবরণ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-‘সমগ্র অঞ্চলটিকে

তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাঁহার সহযোগী বিভিন্ন সেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন হয় তুর্কী নাহয় খিলজী জাতীয়। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বখতিয়ার আলী মর্দান, মুহম্মদ শিরান, হসামুদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বখতিয়ার তাঁহার রাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা, ও খানকা প্রতিষ্ঠা করিলেন। হিন্দুদের বহু মন্দির তিনি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন।’[২১]

ঠিক এইরকম পরিবেশেই মঙ্গলকাব্যর রচনার পরিবেশ গড়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্য-এ দেবীদের প্রাধান্য। *ধর্মমঙ্গল*-এ যেমন দেবীর নয়, সেখানে পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। মূলত মনসা, চণ্ডী দেবীকে কেন্দ্র করে প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে উঠেছে। অপরদিকে অপ্রধান দেবী যেমন শীতলা, ষষ্ঠী, বাশুলী প্রমুখদের নিয়ে গড়ে উঠেছে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য। সমাজে যখন মানুষ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে জর্জরিত তখন জনসাধারণের প্রয়োজন নিরাপদ আশ্রয়। সেই আশ্রয় তৎকালীন সময়ে মানুষ সর্ব ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হবার প্রয়োজন অনুভব করে। এমন এক শক্তির কাছে তাদের কামনা প্রার্থিত যিনি হবেন বরাভয়দাত্রী। মঙ্গলকাব্যর দেব-দেবী সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে এবং পূজিত হন।

দ্বিতীয়ত মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের লক্ষ করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ দেবতাই নিম্নসমাজে গ্রহণীয়, উচ্চসমাজের কাছে কোনোদিনই গৃহীত হননি। ব্রাহ্মণ্য সমাজ কোনোদিনই এইসব দেবতা বা দেবীদের তাদের সমপর্যায়ের আসনে বসাতে চাননি কিছুটা তাদের কৌলিন্য ও দাম্ভিকতার বশে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ বরং তাদের সমাজ থেকে নির্মূল করতে চেয়েছিল রাজশক্তির সহায়তায়। কিন্তু যখন রাষ্ট্রিক বিপর্যয় সংগঠিত হয় তখন উচ্চ-নীচ, জাতি, বর্ণ সবকিছুই ধুয়ে মুছে যায়। অত্যাচার যখন সর্বস্তরে তখন মিলন হতে বাধা থাকে না, মিলন তখন সর্বাত্মক রূপে সর্বস্তরে পৌঁছায়।

তৃতীয়ত মঙ্গলকাব্যের এইসব দেবীদেরই কেন আনয়ন করা হল ? কেন নির্দিষ্টভাবে মনসা, চণ্ডীর উপর জোর প্রদান করা হল ? উত্তরে বলা যায় সমকালীন পরিবেশে সাধারণ মানুষের কাছে এমন কোনো আদর্শ বা বিকল্প ছিল না যে তাদের সামনে রেখে জীবনধারণ করা সম্ভব। মনসা, চণ্ডী বা পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুর এবং অপ্রধান দেবীগণ যারা নিম্নসমাজের কাছে পূজিত হয়ে আসছিলেন তাদের কাছে শুধুমাত্র তারা ধর্মীয় দেবী হিসাবেই পূজিত হয়ে আসছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক বিপর্যয়ের নিম্নসমাজের দেব-দেবীগণ উচ্চসমাজ তথা ব্রাহ্মণ্যসমাজের কাছে গৃহীত হল নবরূপে। পৌরাণিক আদর্শে ও স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যরীতিতে তারা পূজিত হতে লাগল। তাই একটি জিনিস লক্ষণীয় যেসব কবিরা মনসা, চণ্ডী বা অন্যান্য দেবীদের গীত রচনা করেছেন তাঁরা বেশিরভাগই কিন্তু সমাজের উচ্চ

সম্প্রদায়ের হিন্দু। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ কুলের অধিবাসী। তাঁদের কাছে এইসব দেবীরা নতুনভাবে যেমন উপস্থিত হল তেমনি ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য সব ধর্ম-বর্ণের কাছে গৃহীত হল।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের উদ্ভবের কারণ ও সমাজে সর্বাত্মক পরিচিতির একটি ধারণা দেওয়া গেল, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক সূত্রটা কী তা নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। তন্ত্রের প্রাচীনতা নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তন্ত্রের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগসূত্রের বিষয়টি দেখা যাক। প্রাচীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি ধারা প্রবহমান ছিল। অনেকের ধারণা মাতৃদেবী পূজার পরে পুরুষ দেবতার পূজার চল হয়েছে, বিশেষ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার পর। সম্ভবত কৃষিসমাজের উদ্ভবের পর পিতৃতন্ত্রের বিকাশ হয় এবং তখন থেকেই পুরুষ দেবতারূপে পূজ্য হয় বা পূজার স্থান দখল করে। এ নিয়ে মতবিরোধ বিদ্যমান।

বৈদিক সমাজ বা বেদের সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদেবতার আধিক্য ছিল। যাগ-যজ্ঞ, হোম ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে পুরুষ দেবতারাই মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কিন্তু সময় পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের দিকে মাথায় রেখে পুরুষ দেবতারা ধীরে ধীরে উপাস্যর পদ থেকে বিদায় নিতে থাকে। শিশুর যেমন খিদে পেলে প্রথম মায়ের কাছে এসেই অভাব-অভিযোগ জানায়, অনুযোগ করে তেমনি সমাজের অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষরা বরাভয়দাত্রী, দুঃখকষ্ট হরণকারী শক্তিদেবীর উপাসনায় মনোনিবেশ করতে থাকে।

পুরুষ দেবতা কিছুটা গৌণ হয়ে পড়লেও দেবীদের পাশাপাশি তারা সঙ্গী হিসাবে অবস্থান করে। সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার এ বিষয়টি সুন্দর করে বিবৃত করেছেন—'শক্তি, ক্ষমতা যার কোন সীমায় ধরা যায় না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, যা সহজেই মানুষকে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠাতে পারে, আবার তেমনি সহজেই অতল গহ্বরে ডুবাতে পারে। এমন এক শক্তির কল্পনা করে এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে, সেই পরিবেশকে জয় করার চেষ্টা করেছে। এই শক্তির আরও একটি দিক আছে, সেটা হলো সৃষ্টির; এই শক্তি মেয়ে-দেবতা, তাই প্রচণ্ড হলেও তা মাতৃরূপা।'[২২]

বেদের সময় বা তার পূর্ববর্তী সময়ে তন্ত্রধর্ম বিদ্যমান ছিল এ নিয়ে সমালোচক মহলে তর্কের সীমা নেই এ নিয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। তন্ত্রের আচার-সংস্কার, ক্রিয়াকলাপ বৈদিক ধর্মে প্রভাব ফেলেছিল; দুই ধর্মই দু'ভাবেই প্রভাবিত করেছিল একে অপরকে; এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। *বেদ* যেখানে সমাজের শীর্ষস্থানীয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; অপরদিকে তন্ত্র সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। বেদে নারীদের অগ্রাধিকার একসময় ছিল না কিন্তু তন্ত্রে একজন নারী গুরুস্থানীয় হতে পারে, সে নীচ বর্ণ বা জাতি থেকেও আসতে পারে। তন্ত্রের এই নীতি নির্ধারণের জন্যই সাধারণ জনসমাজ কোনোদিন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে

নেয়নি বিশেষত সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়গণ। আমাদের সমাজ যে মাতৃতান্ত্রিক অধিকারেরই অংশ তার প্রমাণ *বেদ*ও উল্লেখিত। *অথর্ব বেদ*-এর *পৃথিবী-সূক্ত* [২৩] (১২।১।৬) –তে উল্লেখিত---

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশিনী।

বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমন্ত্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু।। টী.১

অথর্ব বেদ-এর *পৃথিবী-সূক্ত*-এর এই শ্লোকে পৃথিবীর সন্তানবৎসলা মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তির অপূর্ব বর্ণনার সাক্ষাৎ মেলে, সেই ভাবধারা বাংলাদেশের হিন্দুধর্মর মধ্যে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে অন্তঃসলিলা ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে এবং বর্তমানেও হচ্ছেও। এখানে পৃথিবী হলেন মা এবং মাতৃপূজা আমাদের দেশের সবস্তরের মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে মাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষদের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এই ধারা ও তন্ত্রর মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যর প্রবহমান ভাবধারা তার মূলে একই চিন্তা: শক্তিপূজা। তৎকালীন সময়ে সাধারণ মানুষ এই শক্তিরই ধ্যানে সচেষ্ট ছিল এবং মঙ্গলকাব্যের দেবীরাও এই শক্তি ও মাতৃশক্তিধারার এক-একটি প্রতিনিধি মাত্র। মধ্যযুগে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মই বাঙালির প্রধান অবলম্বন ছিল। পরবর্তী সময়ে চৈতন্য আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবধর্মের জোয়ার সমাজে সর্বব্যাপ্ত হয়। প্রাক্-চৈতন্যপর্বে মধ্যযুগের বাংলার তন্ত্র প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতামত প্রণিধানযোগ্য- 'ধর্মভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনা ও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, সুতরাং উভয়ে মিলিত হইতে অধিক সময় লাগে না। তাই অর্বাচীন বৌদ্ধের সহজসাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শাক্ততান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্বে যোগিনীসাধন ইত্যাদির ব্যাপার বাংলার নরম মাটিতে সত্বর পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিকসাধনার অপব্যবহারে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শক্তিসাধক ইন্দ্রিয়-সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাসলী প্রভৃতির পূজা ও তামসিক উৎসবে যখন সাধারণ লোকের সহজ ধর্ম কর্ম বিকৃত হইতেছিল...।'[২৪] পরবর্তীকালে অন্যান্য সমালোচকরাও এর সত্যতা নিয়ে অস্বীকার করেননি।

মঙ্গলকাব্য ও তন্ত্র উভয়ই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মনোভাবের দিকে একে অপরের পরিপূরক। ধর্মের দিক থেকেও নিম্নশ্রেণির মানুষদের কাছেও সর্বাত্মক গ্রহণীয়। মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার এই দুটি ধারার মিলন ঘটেছিল দেশের আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল বলে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *সাহিত্য* [২৫] গ্রন্থের বক্তব্য সবথেকে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি মঙ্গলকাব্যর কবিরা ও তন্ত্রের সমন্বয়বাদী দর্শন মিলিত হয়েছিল বা বলা যায় সম্পর্ক স্থাপন করেছিল ধর্ম তথা সামাজিক স্থিতিশীলতার কথা মাথায় রেখে। সমালোচক বিনয় ঘোষ এর

বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য-‘জন্মের সময় মা। জীবনে চলার পথে মা। মৃত্যুর পরেও মা। তাই মাতৃপূজা সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, নানাবিধ প্রত্যয় ও প্রতীকের ভিতর দিয়ে, বিচিত্ররূপে প্রচলিত।’[২৬]

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা একদিকে সংহারক, অন্যদিকে পালনকর্ত্রী। এই ভয়মিশ্র ভক্তিভাবনা সাহিত্যকে মাহাত্ম্যকীর্তনে উৎসাহিত করেছে। ভক্তিভাবনার ভিন্নতা হেতুই একদিকে স্বতঃপ্রণোদনা, অন্যদিকে লক্ষ্যপূরণ। কবিদের কাব্যে বাস্তবজীবন এবং অনুভবের জগৎ মিলিত হয়ে অভিন্ন স্বাদ পরিবেশন করেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এই মনোভাবের দরুন মঙ্গলকাব্যর সঙ্গে তন্ত্রের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

দ্রষ্টব্য

১. সমালোচক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী উইন্টারনিট্স্-এর *History of Indian Literature* গ্রন্থের মতকেই তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে তন্ত্রের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ বলে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই মতকে তিনি নিঃসংশয় বলেননি, তর্কাতীত বলে অভিহিত করেছেন।

২. অথর্ব্ববেদচক্রস্থা কুণ্ডলী পরদেবতা।

এতন্মায়াং পৃথিব্যাং হি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ কৃতাম।।

শরীরে দেবনিলয়ে ভক্তো জ্ঞবাত্মা প্রমুচ্যতি।

সর্ব্বদেবময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্র-স্বরূপিণী।।

সর্ব্বমন্ত্রাত্মিকাবিদ্যা বেদবিদ্যা-প্রকাশনী।

----সৌমানন্দ নাথ ও বিজনবিহারী গোস্বামী সম্পা. *রুদ্রযামলম্*, পৃ. ৬৩।

৩. ভগবান্ পরমশিব ভট্টারকঃ শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ সর্বাণি দর্শনানি

লীলয়া তত্তদবস্থাপন্নঃ প্রণীয়,সংবিন্ময়্যা ভগবত্যা ভৈরব্যা স্বাত্মাভিন্নয়া

পৃষ্টঃ পঞ্চভিঃ মুখৈঃ পঞ্চাম্নায়ান্ পরামার্থসারভূতান্ প্রণিনায়।।

----*পরশুরামকল্পসূত্রম্* পৃ. ৩৪।

টীকা

১. মা হলেন পৃথিবী। এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা বসুন্ধরা সুবর্ণবক্ষা এবং যা কিছু চলমান তাদের নিবেশিনী। এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে, ইন্দ্র তার ঋষভ।এই ভূমি আমাদের সম্পদ দান করুক। এই ভূমি আমাদের দুগ্ধ দান করুক। আমি পৃথিবীর সন্তান। তোমার যে গন্ধ পুষ্করে প্রবেশ করেছে, অমর্ত্যগণ প্রথমে যে গন্ধের দ্বারা আমাকে সুবাসিত কর,আমাদের কেউ যেন হিংসা না করে। এই পৃথিবীতে শিলা আছে, মাটি আছে, পাথর আছে, ধুলো আছে, সুবর্ণবক্ষা সেই পৃথিবীকে নমস্কার করি। হে পৃথিবী, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা, তোমার শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত, তোমার দিন রাত্রি, এরা সকলেই যেন আমাদের উপর রস বর্ষণ করে। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, তোমার ভূমিতে যে সভা, যে সমাবেশ আমরা সে সম্বন্ধে চারুবাক্যই বলব। যা কিছু দেখব তাই আমার চিত্ত জয়

করবে। হে মাতা পৃথিবী, তুমি মঙ্গলসহ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সঙ্গে আমাকে শ্রী এবং সম্পদ দান কর।

২. বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ-বিপদ সম্পদের দ্বারা নিজেকে ইষ্টদেবতার বিচার করতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে-দেবতা ইচ্ছা-সংযমের আদর্শ, তাহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন চণ্ডীর উপাসকরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন ? অবশ্যই নহে? কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। পৃ. ১৪৬।

গ্রন্থসূত্র

১. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১১ আগস্ট।

২. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ , *তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০১৮ জুলাই।

৩. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০১০ এপ্রিল।

৪. Banerjil, *R.Pre-historic Ancient and Hindu India*, Bombay, Blackie and Son(India) Limited, 1939.

৫. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ১৪২৩ আশ্বিন।

৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৪১৬।

৭. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *নিবন্ধ সংগ্রহ ১ তন্ত্র,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০।

৮.স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০১৮ জুলাই।

৯. সৌমানন্দ নাথ ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পা., *রুদ্রযামলম্(উত্তরতন্ত্রম্)* , নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা ১৪০৪।

১০. Chakraborty ChintaHaran. *The Tantras; Studies of Their Religion and Literature*, Punthi Pustak, Calcutta , 1999.

১১. উপেন্দ্রকুমার দাস,প্রাগুক্ত গ্রন্থ ,পৃ. ১০৫৬।

১২.উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পা., *পরশুরামকল্পসূত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১২।

১৩. Chakraborty ChintaHaran.ibid.

১৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন,* নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৩,১৪১৬।

১৫. অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পা., *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১২।

১৬. সুখময় ভট্টাচার্য, *তন্ত্রপরিচয়,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৪ ফেব্রুয়ারি।

১৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* প্রথম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১৪।

১৮. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য , *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস,* জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০০।

১৯. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ধর্ম ও সংস্কৃতি/প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯ জানুয়ারি।

২০. মহেন্দ্রলাল সরকার, *তন্ত্রের আলো,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬।

২১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড [মধ্যযুগ], জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. , কলকাতা, ২০০৩।

২২. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯।

২৩. পরিতোষ ঠাকুর, বিজনবিহারী গোস্বামী ও আমান-আল আব্দুল আযীয সম্পা., *বেদ,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২-১৩।

২৪. কমল চৌধুরী সম্পা., *কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মধ্যযুগে বাঙ্গলা সাহিত্য,* দে'জ পাবলিশার্স,

কলকাতা , ২০১৫ মে।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য,* বিশ্বভারতী, ১৪১৭ মাঘ।

২৬.পথিক বসু , সম্পা., *বিভাব প্রবন্ধ সংকলন,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৪ জানুয়ারি, পৃ. ২৯২-৩০৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

মনসামঙ্গল কাব্যধারা পৃ. ২২-৬৮

- জগজ্জীবন ঘোষাল ২৫-৩৫
- তন্ত্রবিভূতি ৩৬-৪৭
- বিপ্রদাস পিপিলাই ৪৮-৫৮
- রাধানাথ রায় চৌধুরী ৫৯-৬৮

মনসামঙ্গল কাব্যধারা

মঙ্গলকাব্যধারার দুটি শাখা। প্রধান শাখার মধ্যে অগ্রগণ্য হল *মনসামঙ্গল* কাব্যধারা। *মনসামঙ্গল* কাব্যধারা সব থেকে সুপ্রাচীন বলে সমালোচকেরা মনে করেন। দেবী মনসার পূজা ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রথমে গৃহীত হয়নি। নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবী মনসার পূজা সীমাবদ্ধ ছিল। ঝড়, বৃষ্টিতে সাপের প্রকোপে সাধারণ মানুষের জীবনহানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। যেমন ভাবে মহামারি, বসন্ত ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যধির দেবী রূপে জন্ম নেন মা শীতলা তেমনই ভাবে সাপের দেবী রূপে মা মনসার পরিকল্পনা করা হয়। সমাজে বিপর্যয়ের ফলে নিম্নশ্রেণির দেব-দেবীদের আর্যীকরণ ঘটে; শাস্ত্রে, পুরাণে তাঁরা নব ধারায় অভিষিক্ত হয়। সমাজের উচ্চ আসনে তাঁরা পর্যবসিত হন। দেবী মনসা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতমা।

'মনসা' শব্দটি সমালোচক স্বামী শংকরানন্দ-র মতে 'মনচা' শব্দ থেকেই উদ্ভূত। সমালোচক সুকুমার সেন এর উলটো মত পোষণ করেন। সমালোচক স্বামী শংকরানন্দ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন-'আমার তো মনে হয় "মন্চা" হইতেই মনসা ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। মন্চা শব্দকে সংস্কৃত করিয়া অতি সহজেই মনসাতে পরিণত করা যায়। বিশেষতঃ 'মন্চা' শব্দটি সংস্কৃত ধাতু "মনচ্পূজায়াং" হইতে ব্যুৎপন্ন করা সম্ভব।'[১] সংস্কৃত 'মন্চ' ধাতুর অর্থ পূজা করা। দেবী মনসাকে অনেক সমালোচক বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলী-র সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। কবিদের কাব্যে তাঁর প্রমাণ মেলে। বিপ্রদাস পিপিলাই-এর কাব্যে দেবী মনসার অপর নাম 'জাগুলি'। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে '... 'সাধনমালা'-র 'জাঙ্গুলী' যে বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যে জাগুলিতে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।'[২]

দেবী মনসার স্বীকৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সংকলিত *তন্ত্রসার* গ্রন্থে দেবী মনসার ধ্যান মন্ত্র উল্লেখিত হয়েছে। দেবী মনসার বাহন সর্পের তান্ত্রিক তাৎপর্য আছে। যোগশাস্ত্রে সর্পের অর্থ ভিন্ন। 'যোগশাস্ত্রে সর্প আত্মারূপ। ইহাকে কুলকুণ্ডলিনীও বলা হইয়া থাকে।'[৩] এই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ তন্ত্রে মূল অভিপ্রেত। সমালোচক স্বপনকুমার ঠাকুর তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থে সমালোচক সোমব্রত সরকারের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন- 'শক্তিকে সাপ বলা হয়ে থাকে তন্ত্রমতে। যা সুপ্ত অবস্থায় থাকে কুণ্ডলীতে। গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলে সাপ থাকার কথা বলেন দেহসাধক।'[৪] ত্রয়োদশ শতকের বিশিষ্ট জৈন সাধক মল্লিনাথ নাগদেবী পদ্মাবতীর ছয়টি তান্ত্রিক রূপভেদ উল্লেখ করেছিলেন।[৫] তার মধ্যে একটি হল 'তোতলা'। কবি তন্ত্রবিভূতি-র কাব্যে দেবী মনসার এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমালোচক স্বপনকুমার ঠাকুর-এর মতে-'অষ্টাদশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত কালীকুলের মহাবিদ্যাদেবী হলেন ত্বরিতা। ইনি সর্পভয় নিবারণকারী এবং মনসার তান্ত্রিক রূপ।'[৬] দেবীর নানা রূপের মধ্যে তন্ত্রের রূপ মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় কতটা আলোচিত এবং কাব্যের কাহিনীতে কতখানি তন্ত্রের উপাদান গৃহীত হয়েছে তাই আমার আলোচনার দিক।

মনসামঙ্গল কাব্যধারার বহু কবি বিদ্যমান। সব কবিদের কাব্য বর্তমানে পাওয়া যায় না। আবার সব কবিদের কাব্যে তন্ত্রের উপাদান নেই। বহু কবি তন্ত্রের উপাদান ব্যবহারই করেননি। সময়ের দাবি রেখে তাঁরা নিজেদের কাব্যে তাঁদের মন পসন্দ ধর্মের উপাদান ব্যবহার করেছেন। সেইজন্য বিপ্রদাস-এর কাব্যে যত না তন্ত্রের উপাদান পাওয়া যায় তার থেকে বেশি উপাদান কবি তন্ত্রবিভূতি-র কাব্যে দেখা যায়। আমার এই গবেষণা গ্রন্থে চারজন কবি আলোচিত হয়েছেন- বিপ্রদাস পিপিলাই, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, রাধানাথ রায় চৌধুরী। অন্য কবিদের কাব্যে তন্ত্রের উপাদান যথোচিত পরিমাণে না পাওয়া যাওয়ায় তাঁদেরকে এই আলোচনার বাইরে রাখা হল। কাব্যের কাহিনীর নিরিখে এই উপাদানগুলি কেমনভাবে আলোচিত হয়েছে তাই আমার গবেষণার বিচার্য।

তথ্যসূত্র

১. স্বামী শংকরানন্দ, *মনসাচরিত*, সোপান, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৫০।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* , দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭-১৮, পৃ. ৫০।

৩. স্বামী শংকরানন্দ, *মনসাচরিত* , ঐ, পৃ. ৭৬।

৪. স্বপনকুমার ঠাকুর, *নাগ দেবদেবী ও সর্প ঐতিহ্য*, কারিগর, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ৬০।

৫. তদেব, পৃ. ২২০।

৬. তদেব, পৃ. ২১৯।

জগজ্জীবন ঘোষাল

মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম কবিদের মধ্যে একজন হলেন কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। কবির কাব্যধারার দুটি খণ্ড-প্রথম হল দেবখণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড বানিয়া খণ্ড। কবির সময়ধারা সম্পর্কে কবির নিজের সময়কাল উল্লেখ করেছেন এভাবে-

ব্রাহ্মণ ঘোষাল রাঢ়ি কুচিআ মুড়াতে বাড়ি প্রাণ মহিম নৃপতির দেশ।

জয়গুরু রূপরাএ তাহার নন্দন গাএ পদ্মার পুরাণ চন্দ্রপতির আদেশ।।[১]

কবি এই বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বিবরণও দিয়েছেন। পিতামাতার নামের উল্লেখও তাতে পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলার কুচিয়ামোড়া বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে কবির বাসভূমি ছিল। সমালোচকরা মনে করেন কবির পোষক ছিলেন রাজা প্রাণনাথ। সম্ভবত তিনি ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজা হন।$_{দ্র.১}$ তাঁর পরবর্তী সময়ে কবি তাঁর কাব্য লেখেন। সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাস অন্যান্য বিশিষ্টজনের মতামতকে মান্যতা দিয়ে কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যরচনা কাল নির্ধারণ করেছেন- ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে এবং ১৬৮৭-র পর কোনো একটি সময়ে।

কাব্যে কবি দুটি বিষয়কে দুটি অংশে ব্যক্ত করেছেন। মনসার জন্ম বৃত্তান্ত ও তৎসংলগ্ন কাহিনী তিনি দেবখণ্ডে ব্যক্ত করেছেন এবং চাঁদ সদাগরের কাহিনী এবং দেবী মনসার পূজা পাওয়ার বৃত্তান্ত বানিয়া খণ্ডে কবি বিবৃত করেছেন। কবির কাব্যে কাহিনীর শুরুতে একটু বিশিষ্টতা দেখা যায়। 'হরগৌরী মিলন' পর্ব অংশে প্রথমে কবি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন-

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বটপত্রের উপর।

জলমধ্যে ভাসে দেব অনাদি ঈশ্বর।।

সৃষ্টি স্থিতি করিতে দেব করিলে মন।

রচিল পাচালি কবি জগত জীবন।[২]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ছাড়াও দেবী মনসার সৃজনের ক্ষেত্রে নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। দেবখণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীতে মনসার তিনটি জন্মকথা উল্লেখিত। প্রথম জন্মে দেবী মনসা ধর্মের কন্যা ও পত্নী, দ্বিতীয় জন্মে তিনি ধর্মপুত্র শিবের স্ত্রী ও গৌতম ঋষির পালিতা কন্যা এবং তৃতীয় জন্মে সমকালেই তিনি শিব দুহিতা রূপে পরিচিতা।

কবির এই জগৎ সৃষ্টির বর্ণনায় নাথ-যোগী ধর্মের অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়। *শূন্যপুরাণ*-এর সঙ্গেও এর কিছুটা সাদৃশ্য মেলে। *শূন্যপুরাণ*-এর সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ণিত-

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।

রবি সসী নহি ছিল নি রাতি দিন।।

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।

মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস।।[৩]

কবি জগজ্জীবনের কাব্যের শুরুতে বর্ণিত-

জলময় সংসার সকল জলময়।

সজড় আজড় নাই সকল প্রলয়।।

স্বর্গমর্ত নাহি ছিল অষ্ট লোকপতি।

যদুপতি প্রলয় নাহি পুরুষ প্রকৃতি।।[৪]

কাব্যের এই ভাবনার সঙ্গে *শূন্যপুরাণ*-এর সাদৃশ্য আছে। নাথধর্ম ও *শূন্যপুরাণ*-এর দ্বারা কবি হয়ত অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেইভাবেই কবি কাব্যে শুরু করেছেন। বাংলার নিজস্ব পুরাকথার অবলম্বনে কবি কাব্যের সূচনা করেছেন। *ধর্মমঙ্গল*-এর কাহিনীতে আমরা দেখি শূন্য নিরঞ্জন ধর্ম, ধর্ম নিরঞ্জন রূপে নিজেকে প্রকাশ করে জগৎ সৃষ্টির কাজে রত হন। কবির কাব্যে ধর্মের চারটি সন্তান- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনিল। এখানে কবি সামান্য পরিবর্তন করে উলূককে পক্ষী না করে করেছেন বাতাস। কিন্তু কবি এই কাব্যের গঠন কৌশল সম্পূর্ণভাবে *ধর্মমঙ্গল*-এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি দেবী মনসার জন্মকাহিনী তিনবার ব্যক্ত হয়েছে। আদি পুরুষ ও দেবীর সাথে এই যে বিচিত্র সম্পর্কের বিন্যাস সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাস[৫] খুব সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন-

ধর্ম----------মনসা

↓ ↓

মহাদেব-----------পার্বতী

↓

বীর্যপাত

↓

মনসার জন্ম

সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাস-এর মতে-'মনসা আদি দেবী। মহাদেবের মাতৃস্থানীয়া। মনসার রূপান্তরিত হওয়া পার্বতী তাঁর ভগিনী স্থানীয়া। ধর্মের অর্ধঅঙ্গ শূলপাণির শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায় পার্বতী শিবের কন্যাস্থানীয়া। মহাদেব পুষ্পবনে বীর্যপাত করার ফলে মনসা-এর জন্ম হল। এই মনসা মহাদেবের কন্যা স্থানীয়া। এই পুরাকথার মৌলিক অভিনবত্ব সুদূর অতীত সমাজের চিত্র বহন করছে।'[৬] সমালোচক রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর *ভোলগা থেকে গঙ্গা* গ্রন্থটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

কবি কাব্যে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের চিত্র তুলে ধরেছেন কিন্তু সেই তুলনায় কাব্যে তন্ত্রের উপাদান অনেকাংশে কম। কবি তাঁর কাব্যে সমাজ-সংসারের নানান ছবি তুলে ধরেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের লাম্পট্য কতদূর যেতে পারে তার ছবি অঙ্কন করেছেন। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে যুবতী কন্যার বিবাহ সেই সময়ে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেখানে কন্যার মা-বাবার আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। মেনকার আক্ষেপ সেজন্য-

কি জানি ব্রত গৌরী করিল কুন কালে।

মিলিল এমত বর গৌরীর কপালে।।

মর মর ঋষি তোর চক্ষে পড়ুক ফুলা।

দেখিয়া আনিলে বর উন্মত্ত বাউলা।।[৭]

কিন্তু পুরুষের কোনো দায় নেই; সে বহু বিবাহে ব্যস্ত। বয়স যাই হোক না কেন, বুড়ো বয়সে তার পত্নীর পাণি গ্রহণে কোনো বাধা নেই। গঙ্গার আক্ষেপ এখানে ধরা পড়েছে-

গঙ্গা বোলে মুই বয়সে হৈলু হীন।

বৃদ্ধকালে দিল মোকে দারুণ সতীন।।[৮]

তার পাশাপাশি আছে যৌবন লালসা। কবি শিবের চরিত্রে এই চিত্র এঁকেছেন। দেবী গোয়ালিনী বেশে শিবকে ছলনা করলে শিব রূপ লাবণ্যে ভুলে তার প্রেমে মোহিত হয়ে পড়ে-

তুমার রূপ দেখি মোর চঞ্চল নয়ন।

হাত ধরু গোয়ালিনী দেহ মধুপান।[৯]

শুধু এখানেই এই কীর্তি পরিসমাপ্তি ঘটে না; দেবী শিবকে কুচনীর বেশে ছলনা করলে শিব তাকেও রেহাই দেন না-

কুচুনীর রূপে মোহিত শূলপাণি।।

গোসাঞি বোলে কুচুনী বচন মোর ধর।

আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।।[১০]

এর ফলে দেবীর গর্ভে জন্ম নিল গণেশ ও কার্তিক। পরোক্ষে এরা দেবীর পুত্র হলেও এর থেকে সহজেই অনুমেয় ঘরোয়া পরিবার থাকা সত্ত্বেও অন্যের গর্ভে সন্তান উৎপাদন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক প্রকার অবৈধ কাজের অঙ্গ। পুরুষের এই অনৈতিক কাজের মূল্য দিতে হয়েছে শিবের কন্যা দেবী মনসাকে। দেবী দুর্গা মনে করেছেন- দেবী মনসা শিবের নানান কুকীর্তির সঙ্গী। তাঁর বক্তব্য-

দুর্গা বোলে মালঞ্চে করিলে নানা কেলি।

সঙ্কট দেখিয়া স্বামীকে বাপ বোল বালি।।

কোপিত হইয়া লাথি মারে ভদ্রকালী।

সম্মুখে লাগিল পদ্মার ভাঙ্গিল কাঁকালি।।[১১]

গণেশ, কার্তিক শিবের চিহ্ন হিসাবে 'সুবর্ণের কাতি আর সুবর্ণের অঙ্গুরি'[১২] দেখিয়েছিল বলে দেবী রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু দেবী মনসা একে কন্যা সন্তান তার উপর সুন্দরী। দেবীর তার উপরে ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজের নানা দিকের অন্ধকার দিক কবি নানান রূপকে তুলে ধরেছেন। দুর্গার মোহিনী রূপ দেখে ব্রহ্মার বীর্য স্খলিত হয়, পরবর্তী সময়ে দেবী দুর্গা ঋতুবতী থাকার দরুন গর্ভবতী হন। কিন্তু ভয়ের কারণে তিনি গর্ভপাত করেন সবার অজান্তে।

গঙ্গা বোলে দুর্গা ভায়া মোর বাক্য ধর।

গর্ভনাশ কর এই বালুর উপর।।

গঙ্গার বচনে দুর্গা গর্ভে দিল হাত।

বালুর উপরে দুর্গা করে গর্ভপাত।।[১৩]

কবি দেবীর কাহিনী বললেও এটাই সমাজের বাস্তব সত্যি। বহু নারীকে এইভাবে সবার অজান্তে পুরুষের পাপকে বিনষ্ট করতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। নাহলে সেই পুরুষই তাকে সমাজে টিকতে দেবে না। নয় কুলটা বা অসতী আখ্যা দিয়ে সমাজচ্যুত করবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আরেকটি ভয়ংকর নিদর্শন হল নারীদের উপর শারীরিক

বলপ্রয়োগ। সেক্ষেত্রে নিজের পরিবারের মানুষজনও ছাড় পায় না। লখাই নিজের মামীকে দেখে তার রূপ-যৌবনে প্রলুব্ধ হয়ে তার সঙ্গ কামনা করে, তার মামী তাকে সাবধানবাণী শোনায়-

পরদার কর যদি করি অহঙ্কার।

অকালে যাইবে তুমি শমন দুয়ার।।[১৪]

কিন্তু সে যুক্তি না মেনে লখাই বলপূর্বক তার মামীকে ধর্ষণ করে। পুরুষ বলেই তার উপর এই অত্যাচার করা সম্ভব। পরবর্তী সময়ে মামী লখাই-এর নামে তার মায়ের কাছে নালিশ করতে গেলে উলটে সনকা তাকেই গালিগালাজ দিয়ে দোষ দেয়, বলে-

সনা বলে শুন বেটি টেট মরু দারি নটি না বোল শিশুকে কিছু মন্দ।

গন্ধ বানিয়ার বালা টেট নহে আলা ভোলা বদনে দুগ্ধের আছে গন্ধ।।[১৫]

সনকার কাছে তার পুত্র দুধের শিশু। শত দোষ করলেও সে পুত্র সন্তান, কোনো কিছুতেই তার কোনো দোষ দেখা যাবে না। তার উপর সমাজের বড় সম্পদ কড়ি মাহাত্ম্য। কড়ি থাকলে আর কিছুই চিন্তা নেই-

যদি কোড়ি দিতে পারি সাজি আসি পরনারী জাতিকুল না করে বিচার।

যার নাই কোড়ি ধন প্রিয় নহে পুত্রগণ নিজ নারী না দেন শৃঙ্গার।।[১৬]

কড়ি যার কাছে আছে সে চাঁদের 'মহাজ্ঞান' সমতুল্য সম্মান পাবে। এটাই সমাজের রীতি। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাব্যেই বর্তমান। ধর্ষিত মামীকে সনকা যখন বহুমূল্যের সম্পদ ও বস্ত্র প্রদান করে তখন তার মনে কোনো ক্ষোভ থাকে না। সন্তোষজনক চিত্তে সে ঘরে ফিরে যায়। অপরদিকে নারীর দুঃখ কষ্টের দলিল হয়ে রয়েছে 'বানিয়া খণ্ড'-এর *নারীগণের পতিনিন্দা* অংশে-

এক যুবতী বোলে মাও মোর কপাল পো।

মুই হেন সুন্দরী রামা মোর স্বামী খোঁড়া।।

লাঠি ধরি বৈসে খোঁড়া লাঠি ধরি উঠে।

কর্মে কার্যে ভাজন নাই বোলে প্রাণ ফাটে।।

আর যুবতী বোলে সখী মোর কথা শুন।

আমার কালুয়া স্বামী দুই চক্ষে ঊন।।[১৭]

এই অংশের তালিকা দীর্ঘ। নারীজীবনের অপ্রাপ্তি নিয়ে সমাজের শীর্ষ নেতৃত্ব কোনোদিন মাথা ঘামায়নি আর কোনোদিন তা নিয়ে জানার আগ্রহও প্রকাশ করেনি। তার কাছে নারী কামনা-বাসনার একটা মাধ্যম মাত্র। এর বহু উদাহরণ কাব্যে পাওয়া যাবে। বেহুলার ভাসান যাত্রায় একটি চরিত্রের সাথে সাক্ষাৎ পাই আমরা সেটা হল গোদা চরিত্র। গোদার নিজের অবস্থা শোচনীয়; নিজের বাড়িতে দু'জন স্ত্রী-একজন জন্ম কানী, আরেকজন খোঁড়া। তা সত্ত্বেও সে বেহুলার সঙ্গ কামনা করে। বেহুলার কথামত সে নিজের বাড়িতে আগুন দিয়ে পরিবার পরিজনকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বেহুলার ভেলা চলে যেতে দেখে সে তার পিছু নেয় তাকে পাবার আশায়। অবশেষে দেবী মনসার তৎপরতায় বেহুলা রক্ষা পায়।

অপরদিকে আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হল বেহুলার প্রতি কামুক শিবের প্রলুব্ধতা। বেহুলার প্রতি তার বক্তব্য-

শিব বোলে অহে কন্যা শুনহ বচন।

হাতে ধরি অহে কন্যা দেহ আলিঙ্গন।।

দুই স্ত্রী ছাড়িব পার্বতী আর গঙ্গা।

তুমাকে লইয়া আমি হইব অর্ধ অঙ্গা।।

যদি কন্যা দেহ রতি কহে ত্রিপুরারি।

অর্ধ অঙ্গ হৈব তোর ত্রৈলোক্য অধিকারী।।[১৮]

পুরুষের কাছে নারীর সৌন্দর্য ভোগ করাই প্রধান। সেখানে তার পরিবার সমস্যায় থাকলেও তার কিছু যায় আসে না। দেবাদিদেব শিবের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে-

ভাঙ্গের খিয়ালে বুড়া অন্ন সকল খায়।

কার্তিক গণেশ পুত্র খিদায় লালায়।।

গঙ্গা দুর্গা দুজন মরি অন্ন দুখে।

আর বিভা করিতে চাহে কুন মুখে।।[১৯]

এটা শুধু দেবতার ঘরের বিষয় নয়, সারা সমাজের প্রতিচ্ছবি। তাদের কোনো দায়িত্ব বা কোনো অধিকারবোধ নেই সংসারের প্রতি। তাদের একটাই চেতনা কাজ করে সেটা হল নারীদেহ সম্ভোগ করা। কাব্যে উল্লেখিত-

পরস্ত্রীকে পাইলে পুরুষ নাকি এড়ে।

আহার পাইলে তবে ব্যাঘ্র নাকি ছাড়ে।।[২০]

নারীদের জীবন ছিল ক্ষণিকের, প্রয়োজন মিটে গেলে সবাই তাকে আস্তাকুড়ে ফেলে দেবে-

নারীর যৌবন জুয়ারের পানি।

ভাটি মুখে ছাড়ি কভু না রবে উজানি।।

নারীর যৌবন যেন ধুতুরার ফুল।

দিনা চারি গেল পর বহিবেক কড়াকে মূল।।

নারীর যৌবন যেন তিলকের ফোঁটা।

ঘামের চোটে উঠিয়া বহিবেক কাল খটা।।[২১]

সমাজে যার অর্থ হাতে আছে তার হাতেই প্রধান ক্ষমতা। স্বর্গের ক্ষেত্রেও একই ছবি, শিব নিজের প্রতিপত্তি নিজেই ঘোষণা করেছে-

আমি দেব শঙ্কর ত্রিলোক অধিকারী।

সুখ মোক্ষ সম্পদ সকল দিতে পারি।।[২২]

এছাড়াও আছে জাত-পাতের বিভাজন। মধ্যযুগের এই বিভাজন আজো বর্তমান, কাব্যে উল্লেখিত-

সুবর্ণ থালেতে অন্ন বাড়ে বানিয়ানী।

সেই অন্ন সোনকা ডোমনীকে দিল আনি।।

ডোমনী বোলেন মাঅ আমরা নীচ জাত্যে।

তোমার সাক্ষাতে অন্ন ভুঞ্জিব কেমতে।।[২৩]

তন্ত্রের প্রসঙ্গ হিসাবে কিছু কিছু বিষয় উঠে এসেছে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তন্ত্রে-মন্ত্রে বিষ ঝাড়ন প্রসঙ্গ-

ব্রহ্ম জ্ঞানে পদ্মা মারিল হুহুঙ্কার।

কালকূট গরল হইল ছার খার।।[২৪]

বা

মহামন্ত্র জপ করি জল দিল বিষহরি ঘট মধ্যে পশিল জীবন।

আইলেন পঞ্চভূত উঠ্যা বৈসে সাধুযুত চক্ষ মেলি চাহে ছয় জন।।[২৫]

মহামন্ত্র ধন্বন্তরী সর্প তাড়ানোর ক্ষেত্রে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রয়োগ করেছেন। মন্ত্রের প্রভাবে দেবী মনসার অঙ্গ থেকে সব সাপ পলায়ন করেছে। বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলীর সঙ্গে কিছুটা এক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। দেবী জাঙ্গুলীর এমন অনেক মন্ত্র আছে যা তাঁর সামনে উচ্চারণ করা উচিৎ নয়। সমালোচক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-র মতে-'...মন্ত্রপদের শব্দগুলি কোনো সর্প সহ্য করিতে পারে না এবং শুনিলেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাহাদের মস্তক সপ্তধা স্ফুটিত হয়।'[২৬] বিষ ঝাড়নের ক্ষেত্রে কাব্যে ব্রহ্ম মন্ত্র প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী মনসা এই ব্রহ্ম মন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে লখাইকে জীবনদান করেছেন-

শিয়রে বসিয়া পদ্মা মারে হুহুঙ্কার।

কালকূট সমস্ত বিষ করিল ছারখার।।

পুন পুন ব্রহ্ম মন্ত্র জপে অদ্ভুত।

ঘট মধ্যে জীব থুঞা গেল যমদূত।।

ধড়ের মধ্যে যদি প্রবেশিল জীবন।

নাক মুখ হৈতে বাহিরায় পবন।।[২৭]

বা

মহা মন্ত্রে পদ্মাবতী মারিল হাংকার।

উঠিয়া বসিল তবে কিশোর কুমার।।[২৮]

কাব্যে এখানে 'মহামন্ত্র'-র উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'মহামন্ত্র' তন্ত্রানুসারী; কাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়-

উত্তর শিয়রে রাখে ত্রিদশের ঈশ।

তন্ত্রে মন্ত্রে পদ্মাবতী বিনাশিল বিষ।।[২৯]

এই 'মহামন্ত্র' সর্বরোগ হরণকারী মন্ত্র। এই মন্ত্র ভগবান শিবকে স্মরণ করে রচিত। এই মন্ত্র পাঠে সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখানেও সেই প্রতিফলন লক্ষণীয়। মৃত মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে এই মন্ত্র বলে। দেবী মনসাকে কবি কাব্যে 'মহামায়া বলে উল্লেখ করেছেন-

শুন মাগো মহামায়া দেহ মোকে পদ ছায়া আমি মূঢ় নিবেদন করি।। [৩০]

দেবী মাত্রই কাব্যে শক্তিতত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। কবি জগজ্জীবন ঘোষাল-এর কাব্যে অন্যান্য কবিদের তুলনায় তন্ত্রের উপাদান কম। কাব্যে শৈব ভক্তির অনেকস্থানে পরিলক্ষিত হলেও অপেক্ষাকৃত

ভাবে বৈষ্ণব ভক্তির চিহ্ন প্রকট। সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাস-এর মতে- 'জগজ্জীবনের বৈষ্ণব ভক্তিভাব অন্যত্রও স্পষ্ট। শ্রী চৈতন্যের ধর্মান্দোলন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। সুতরাং এতগুলি বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুক্ত ধুয়া পদ মনসামঙ্গলে সন্নিবেশিত হওয়া আশ্চর্য নয়।'[৩১] কাব্যে দেবীকে নিয়ে অনুরাগের পরিচয় পাওয়া গেলেও সেই পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। কাব্যে তৎকালীন সমাজের বহু উপাদান পাওয়া যায় কিন্তু সেই তুলনায় তন্ত্রের উপাদান নগণ্য।

দ্রষ্টব্য

১. কবির পোষ্টা সম্বন্ধে সমালোচক আশুতোষ দাস জানিয়েছেন, তাঁর নাম মহারাজ প্রাণনাথ। কবি তাঁর কাব্যে জমিদার বংশের সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন-

শিব নারায়ণ নাম লক্ষ্মী নারায়ণ অনুপাম তার ভাই নারায়ণ।

তার দেশে রূপ রায় তাহার নন্দন গায় দ্বিজ কবি জগত জীবন।। (পৃ. ১০৯)

তথ্যসূত্র

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পা., *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০ ফেব্রুয়ারি, পৃ. ১২৮।

২. তদেব, পৃ. ৩।

৩. আনন্দ ভট্টাচার্য সম্পা., *রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩।

৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পা., *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল*, ঐ, পৃ. ৩।

৫. তদেব, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৯৫।

৬. তদেব, পৃ. ৯৫।

৭. তদেব, পৃ. ৩৩।

৮. তদেব, পৃ. ২৮।

৯. তদেব, পৃ. ৪০।

১০. তদেব, পৃ. ৪১।

১১. তদেব, পৃ. ৪৫।

১২. তদেব, পৃ. ৪৩।

১৩. তদেব, পৃ. ৪৭।

১৪. তদেব, পৃ. ৯২।

১৫. তদেব, পৃ. ৯৩।

১৬. তদেব, পৃ. ৬৮।

১৭. তদেব, পৃ. ১০৬।

১৮. তদেব, পৃ. ১৭১।

১৯. তদেব, পৃ. ১৭৩।

২০. তদেব, পৃ. ১৫৬।

২১. তদেব, পৃ. ১২০।

২২. তদেব, পৃ. ১৭৪।

২৩. তদেব, পৃ. ১৯৯।

২৪. তদেব, পৃ. ৫২।

২৫. তদেব, পৃ. ১৮২।

২৬. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী সম্পা., বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-র *বৌদ্ধদের দেবদেবী*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫ জুলাই, পৃ. ৭৫।

২৭. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পা., *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল*, ঐ, পৃ. ১৭৯।

২৮. তদেব, পৃ. ১৫০।

২৯. তদেব, পৃ. ৫২।

৩০. তদেব, পৃ. ১৮৯।

৩১. তদেব, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৭৭।

তন্ত্রবিভূতি

মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম কবি হলেন কবি তন্ত্রবিভূতি। উত্তরবঙ্গের মঙ্গলকাব্যধারার কবিদের মধ্যে কবি তন্ত্রবিভূতি অগ্রগণ্য। তাঁর রচনার অনেকখানি অংশ কবি জগজ্জীবনের রচনায় প্রতিফলন দেখা যায়। কবি জগজ্জীবনের কাব্যে কবি তন্ত্রবিভূতি-র কাব্যের অনেক অংশ কবি কোন পরিবর্তন না করেই ব্যবহার করেছেন। কবির কাব্যের যে জনপ্রিয়তা মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মধ্যে ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কবির বিষয়ে সেইভাবে কিছুই পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সবটাই সমালোচকদের অনুমানের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। কবির আত্মপরিচয় বিষয়ক ভণিতায় উল্লেখিত-

তন্ত্রবিভূতি পদ রচিল বিদ্গাদ

পদ্মা দেবীর পাঞা বর।।

মনসার পাঞা বর পদ্মামুখী প্রাণেশ্বর

রচিল বিভূতির পদে গান।।

তন্ত্রবিভূতে কবি বন্দগো মনসা দেবী

বিরচিল দ্বিজ মহামতি।।

তন্ত্রবিভূতি পদ রচিলেন বিদ্গাদ

আজ্ঞা পাঞা মনসাপুরাণ।।[১]

কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কবি নিজে থেকেই নীরব। সমালোচক আশুতোষ দাস-এর মতে-'...স্থান, কাল, বংশপরিচয় ও রাজ্যেশ্বর বা ভূস্বামীর উল্লেখ কবির অভিলষিত না হওয়ার পশ্চাতে তন্ত্রাভিলাষী কবির নিঃসঙ্গ জীবন-স্বরূপ ও ষোড়শ শতকের বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শের প্রতি বিফলতার জন্য স্বজন পরিত্যক্ত জীবনের লাঞ্ছনা উপসৃত আছে কিনা সংশয় জাগে।'[২]

সমালোচক সুকুমার সেন অনুমান করেছেন- 'মনে হয় কবি জাতিতে তাঁতি ছিলেন, তাই ভণিতায় নিজেকে 'তন্ত্রবিভূতি' বলিয়াছেন।'[৩] এর স্বপক্ষে বলা যায় কবির যেখানে কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে সেখানে অনেক তাঁতির বাস। আবার সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে-'অবশ্য উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে তন্ত্র ও শাক্ত ধর্মের প্রভাব আছে ; কবি তন্ত্রমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া নিজেকে 'তন্ত্র' অর্থাৎ তান্ত্রিক বলিয়াছেন; এরূপ অনুমানও নিতান্ত যুক্তিহীন নহে। উপরন্তু এই কাব্যে নানা পুরাণ গ্রন্থের এরূপ নিপুণ অনুকরণ আছে যে, কবিকে উচ্চতর সমাজের

ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।'[৪] সমালোচক ও কবিকৃত কাব্যের সম্পাদক কবির নামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রথমত কবির নামের ক্ষেত্রে তিনি জানিয়েছেন-'...তন্ত্র হয়েছে বিভূতি যার এ অর্থে কবির নাম তন্ত্রবিভূতি ধরে নেওয়া যায়। কবি তান্ত্রিক বা তন্ত্রধারী ব্রাহ্মণ এ গৌরবগর্বিত পরিচয়ের অভিলাষে তন্ত্র শব্দটি বিভূতি নামের অনুষঙ্গী হয়েছে মনে হয়। তন্ত্রবিভূতির গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনানিবহে কবির তন্ত্রাভিলাষী মন অভিব্যক্ত।'[৫]

দ্বিতীয়ত সমালোচক আশুতোষ দাস জানিয়েছেন, কবির কাব্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ বা বন্দনা নেই। কবির জন্মস্থান থেকে রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর পুণ্য জন্মভূমি রামকেলির তিন ক্রোশ দূরে অবস্থান। তা সত্ত্বেও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ কাব্যে অনুপস্থিত। এর থেকে সহজেই অনুমেয় কবির চিন্তাভাবনা তন্ত্রানুসারী।

কবির কাব্যের দিকে এবার লক্ষ করা যাক। কাব্যের প্রথমে উল্লেখিত-

তোতলা সর্বেশ্বরী নমো দেবী বিষহরি

বালকেরে জদি কর দয়া।[৬]

এখানে দেবী মনসাকে কবি 'তোতলা' বলে সম্বোধন করেছেন। অন্যান্য কবির কাব্যে এই রকম দেখা যায়নি। কবি তন্ত্রবিভূতি সম্ভবত প্রথম এই ধরনের নামের ব্যবহার করেছেন। সমালোচক সুকুমার সেন এই নামের স্বপক্ষে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারেননি। উনি কিছু সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন।দ্র.১ সমালোচক স্বপনকুমার ঠাকুর দেবী মনসা সম্পর্কে জানিয়েছেন[৭] যে জৈন সাধক লেখক মল্লিনাথ নাগদেবী পদ্মাবতীর তান্ত্রিক রূপভেদ দেখিয়েছেন, যেমন ১) তোতলা ২) ত্বরিতা ৩) নিত্যা ৪) ত্রিপুরা ৫) কামসাধিনী ৬) ত্রিপুর ভৈরবী। তোতলা দেবী চতুর্ভূর্জা। দেবীর চারহাতে রয়েছে পাশ, বজ্র, ফল এবং পদ্ম। তাঁর গাত্রবর্ণ লাল। তিনি সর্পবাহনা। কবির কাব্যে দেবীর বর্ণনা এই রকম-

হংসের উপরে দেবী করে আরোহণ।

অষ্টকুলা নাগ দেবী করিল ভূষণ।।

চতুর্ভূর্জ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর।

নানা অভরণ সর্প অঙ্গের উপর।।[৮]

দেবীর এই রূপের সাথে নাগদেবী পদ্মাবতীর তান্ত্রিক রূপভেদ তোতলা দেবীর অনেকাংশে মিল দেখা যায়। দেবীর সঙ্গে হংসের সংযোগসূত্র এখানে তন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে।দ্র.২ কবি দেবী তোতলার সঙ্গে মিল রেখেই দেবীর

নামকরণ করেছেন। কবি আবার দেবী মনসাকে কাব্যের শুরুতেই 'ত্রিপুরা সুন্দরী' বলে অভিহিত করেছেন। কবির বর্ণনা-

ত্রিভুবন ভৈরবী তুমি ত্রিভুবনেশ্বরী।

আগমে আপনি তুমি হইলা মহেশ্বরী।।

ব্রহ্ম সনাতনী তুমি দেবীত ব্রাহ্মণী।[৯]

এখানে কবি দেবী 'ত্রিপুরা সুন্দরী'-র সঙ্গে অভিন্ন করে কাব্যে দেখিয়েছেন। আগমশাস্ত্রে দেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে-

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশাদি-ত্রিদশৈরর্চিতা পুরা।

ত্রিপুরেতি ততো নাম কথিতং দৈবতৈস্তব।।

অর্থাৎ 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি ত্রিদশগণ (দেবগণ) কর্ত্তৃক পুরা (প্রাচীন কালে) অর্চিতা হইয়াছিলেন। সেই হেতু দেবতাগণ কর্ত্তৃক তোমার ত্রিপুরা এই নাম কথিত হইয়াছে।

প্রপঞ্চসারতন্ত্র-এ এই ব্যুৎপত্তি উক্ত হইয়াছে-ত্রিমূর্ত্তিসর্গাচ্চ পুরাভবত্বাৎ ত্রয়ীময়ত্বাচ্চ পুরৈব দেব্যাঃ। লয়ে ত্রিলোক্যা অপি পূরণত্বাৎ প্রায়োহম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম। অর্থাৎ দেবীর ত্রিমূর্ত্তি হইতে পুরাকালে সর্গ (সৃষ্টি), স্থিতি ও লয় হেতু, দেবীর পুরাকালে ত্রয়ীময়ত্ব (ত্রিবেদরূপত্ব) হেতু ও ত্রিলোকের লয়ে পূরণহেতু প্রায় অম্বিকার ত্রিপুরা এই নাম হইয়াছে।'[১০] দেবীর এই গুণকেই কবি দেবী মনসার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাতে চেয়েছেন। এছাড়া কবি দেবীকে 'নারায়ণী'-র সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন-

নমগো নমগো মাতা নম নারায়ণী।

শিবকন্যা বটগো মা বিজয়া ব্রাহ্মণী।।[১১]

দেবী নারায়ণী-র ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে দেবী মনসার সাদৃশ্যগত কিছুটা মিল পাওয়া যায়-

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়ং নানালঙ্কার ভূষিতাং

চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং

রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্ক-সদৃশী তনুং

রত্নেদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে

প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবসুন্দরীম্।[১২]

দেবী নারায়ণী চতুর্ভুজা, মহাদেবীর সঙ্গে অভিন্না এবং 'নাগযজ্ঞোপবীতিনীং' । দেবী মনসার সঙ্গে এই মিল হেতু কবি এখানে দেবী মনসাকে 'নারায়ণী' সঙ্গে এক করে দেখেছেন। লোকবিশ্বাসে দেবী নারায়ণী তিনি মহাদেবের শক্তি নারায়ণী বা ভগবতী, নারায়ণের শক্তি নন। সমালোচক দেবব্রত নস্কর জানিয়েছেন-'...মহামায়া দেবী দুর্গার সাথে দেবী নারায়ণীর সাযুজ্য কল্পনা করা হয়। দেবী নারায়ণীকে বনদুর্গা ও বনচণ্ডী বলা হয়।'[১৩] দেবী মনসার লৌকিকত্ব এবং দেবী নারায়ণী-র লৌকিকত্ব এভাবে কবি একভাবে দেখাতে চেয়েছেন কাব্যে।

কাব্যে কিছু অংশে তন্ত্রের উপাদান লক্ষ করা যায়। শিবের বিষ ঝাড়ন ক্ষেত্রে দেবী মনসা যে প্রক্রিয়া সাধন করেছেন তা তন্ত্রপ্রসূত-

অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট গোরূড় দিল সমর্পিঞা।।

বাজে শঙ্খধ্বনি আর ফুকরে কাহাল।

দক্ষিণে বিশাল কাঢ়া বামে করতাল।।

শরীরের অত বিষ সমাধি করিঞা।

আদি মন্ত্র পাঞা শিব উঠিল বসিয়া।।[১৪]

অন্যদিকে মনসা লক্ষীন্দরের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে মহামন্ত্রের প্রয়োগ করেছেন-

মহামন্ত্রে পদ্মা দেবী করিল হুঙ্কার।

উঠিঞা বসিল বালা বানিঞাকুমার।।[১৫]

আবার বেহুলার শরীর সুন্দর করবার ক্ষেত্রে দেবী মনসা ব্রহ্মমন্ত্রের প্রয়োগ করেছেন-

ব্রহ্মমন্ত্রে মনসা মস্তকে দিল নীর।

পূর্ব্ব হৈতে সুন্দর হৈল বালীর শরীর।।[১৬]

কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ সদাগরের ক্ষেত্রেও তন্ত্রের অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। চাঁদ সদাগরের সাধনার পন্থা অভিনব। 'হেটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদ' তার সাধনার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই সে সিদ্ধিলাভ করেছে এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করেছে-

ঊর্দ্ধপদে সেবা কৈল তবে শিব তুষ্ট হৈল

মোরে দিল মন্ত্র ষড়াক্ষর।

সেবিয়া পশুপতি নগরে পাইল স্থিতি

অমূল্য রতন বাসর ঘর।।[১৭]

কালীপূজার ক্ষেত্রেও 'হেটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদ' পদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায়-

গন্ধ পুষ্প চন্দন কালিকা নামে দিল।

নৈবেদ্যাদি ধুপ দীপে অন্ধকার কৈল।।

রূপে গুণে হাজরা দেখিতে আগল।

হেট মুণ্ডে ঊর্দ্ধ পদে চিন্তে চরণকমল।।[১৮]

এছাড়াও কাব্যের কিছু কিছু অংশে তন্ত্রের অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। দেবী মনসার সাপের বিষে যখন চাঁদ সদাগরের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত তখন ধনন্তরি ওঝা এসে তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে আবার চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনে জীবনদান করেছে-

চান্দো বোলে রোঝা তুমি সুনহ সত্বর।

ঝাড়িঞা জিঞাও তুমি আমার কোঙর।।

ব্রহ্মজাল মন্ত্রে রোঝা ঝাড়িতে লাগিল।

ঝাড়িতে ঝাড়িতে রোঝা বিষ সার কৈল।।

উঠিঞা বসিলা পুত্র নিদ্রা চিয়াইঞা।[১৯]

এই কাব্যে ধনন্তরি ওঝার মুখোমুখি হয়েছে দেবী মনসা। দেবী মনসা সমস্ত সর্পকুলকে নিয়ে ধনন্তরি ওঝাকে আক্রমণ করেছে-

কুলিশ কর্কট সাজে তক্ষক নাগিনী।

ত্রিভুবন কাপে জার সুনি নামের ধ্বনি।।

পদ্ম মহাপদ্ম সাজে শঙ্খ মহাশঙ্খ।

সাজিলেন অষ্ট নাগ তক্ষক সারঙ্গ।।[২০]

বশীকরণ-তন্ত্রম্-এ অথ *সর্পবিদ্যা* অধ্যায়ে এই অষ্ট নাগ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। অষ্ট নাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

অনন্তঃ কুলিকশ্চৈব বাসুকিঃ শঙ্খপালকঃ।

তক্ষ্যকশ্চ মহাপদ্মঃ কর্কোটঃ পদ্মঃ এব চ।

কুলনাগাষ্টকং হ্যেতৎ তেষাং চিহ্নং শিবোদিতম্।।[২১]

সাপের সম্মুখীন হয়ে ধনন্তরি ওঝা মহামন্ত্রবিদ্যার প্রয়োগ করেছে, ফলে সাপেরা নিজের জীবন নিয়ে পালিয়েছে-

মহামন্ত্র ধন্নন্তরি করিল চালন।

পলায় সকল সর্প নইঞা জীবন।।

মনসার আগেত আছিল জত সাপ।

পলায় সকল সাপ মন্ত্রের প্রতাপ।[২২]

ডাকিনীতন্ত্র-এ সাপ তাড়ানোর বহু মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে এবং তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে এর বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক, সেই জন্য এখানে সেটি দেওয়া হল না। তক্ষক সাপের দংশনে ধনন্তরি ওঝার মৃত্যু হয়েছে। এই সাপ কামড় দিয়েছে ধনন্তরি ওঝার মূলস্কন্ধে। স্কন্ধে কামড় দিলে কী করতে হবে সে বিষয়ও তন্ত্রে উল্লেখিত-

স্তনয়োঃ স্কন্ধয়োঃ কুক্ষৌ লিঙ্গবৃষণনাভিষু।

মর্ম্মসন্ধিষু সর্ব্বত্র সর্পদষ্টো ন জীবতি।।[২৩]

এর অর্থ হল সাপ স্কন্ধ স্থানে দংশন করে তাহলে তাকে শয়নগৃহে নিশ্চিতভাবে গমন করতে হবে। ধনন্তরি ওঝার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আবার নেতা ধোপানির নিজের সন্তানকে মুহূর্তের খাতিরে প্রাণশূন্য করে নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়। আবার তাকে জাগিয়ে তোলে কাজ শেষ হলে-

নেতাই কাপড় ধয় সুবর্ণের পাটে

ধনাইনন্দন বসি কান্দে উচ্চ রায়।

পুত্রকে মারিঞা নেতাই রাখে সেই ঘাটে।

আনন্দে কাপড় ধয় সুবর্ণের পাটে।[২৪]

নেতা ধোপানির এই ক্রিয়াকলাপ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রপ্রসূত। সমালোচক আশুতোষ দাস-এর মতে-'...মনসামঙ্গলের লোকায়ত কাহিনীর মধ্যে ওঝা ধনন্তরির সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইবার উপায় ও সিদ্ধি, বিবাহ বাসরে লক্ষ্মীন্দরের আকস্মিক জীবনসঙ্কট উত্তরণে কালিদহে বেহুলার আত্মাহুতি প্রীত মনসাপূজা, নেতার ঘাটে কাজে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য দুরন্ত শিশুপুত্রকে মারিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তে নেতার কাপড় কাচা ও কাপড় ধোয়া শেষ হইলে মৃত পুত্রকে জীয়াইয়া স্তন্যপান করান এবং বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনায় বেহুলার ছয়ঘাট অতিক্রম অন্তে সহস্রারে শিবলোকে পৌঁছিয়া দয়াবতী মনসার দাক্ষিণ্যে মৃত লক্ষ্মীন্দরের প্রাণজীবন তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তন্ত্রসাধনার এক অচিন্তিতপূর্ব সন্ধানসূত্র।'[২৫]

আবার এখানে ধন্বন্তরি দেহ সৎকারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অভিনব পদ্ধতি। তার শিষ্যরা সর্পের বিনাশের জন্য তার দেহখণ্ড মাটিতে পুঁতে রাখার পরিকল্পনা করেছে। এখানে তন্ত্রের ক্ষেত্রে দ্রব্যগুণের ইঙ্গিত মেলে। বাধ্য হয়ে মা মনসা ব্রাহ্মণী রূপ ধরে শিষ্যদের বুঝিয়েছেন গুরুর শরীর নষ্ট করলে নরকে ঠাঁই হয়-

ইহার শরীর নষ্ট করো কি কারণ।

গুরুকে কাটিলে হয় নরক গমন।।

অগ্নিক্রিয়া করি ইহার করহ সৎকার।[২৬]

তন্ত্রের পাশাপাশি সমকালীন সমাজের বহু বর্ণময় ছবিও কবি কাব্যে উপস্থিত করেছেন। সমাজে নারীর দুঃখের অবধি ছিল না। চাঁদ সদাগরের পুত্রকে দেখে অবহেলিত নারীবৃন্দের মধ্যে ফুটে উঠেছে নিজ যৌবনের প্রতি হাহাকার। কবি তন্ত্রবিভূতির কাব্যে এই বঞ্চিত নারীর সংখ্যা অনেকটাই; আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরব-

আমি হেন সুন্দরী আমার স্বামী খোড়া।

লাঠি ধরি বৈসে খোড়া লাঠি ধরি উঠে।।

আমার ঘরে কানা স্বামী চক্ষের আগুন।।

আর যুবতী বোলে সখী মোর বড় দুঃখ।

কুবুড়া আমার স্বামী পাতিল হেন মুখ।[২৭]

এই তালিকা আরো দীর্ঘ। সমাজ নির্দেশিত পথেই নারীদের চলতে হত। স্বামীই তাদের হর্তা কর্তা বিধাতা-

করিহ স্বামীর সেবা মনোনীত কর্ম্ম।

শাস্ত্রে কহে স্বামী হয় যুবতীর ধর্ম্ম।[২৮]

এই নিয়ম নির্দেশনা বহু যুগ ধরে চলে আসছে। সমাজের উঁচু স্তরেও এর অন্যথা ছিল না। বেহুলার স্বামী মারা যাবার পর তাকেও অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সামিল হয়েছে সমাজ নির্ধারিত অগ্নি পরীক্ষায়। সমাজের বিধিই ছিল-

স্বামীহীন জেই নারী বৃথা তার ধন কড়ি

বৃথা তার মাতা পিতা ভাই।

কি করিব কোথা জাব কোথা গেলে স্বামী পাব

স্বামী বিনে আর কেউ নাই।।[২৯]

বেহুলা যখন স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য মরণপণ লড়াই করছে তখন সেও বুঝেছে তাকে স্বামীর প্রাণ নিয়ে যে করেই হোক ফিরতে হবে, নাহলে সমাজে তার ঠাঁই হবে না। তার আবেদনে তখন তীব্র কাতরতা প্রকাশিত-

স্বামী সে পরম ধন স্বামী মোর জীবন

স্বামী হয় গয়া গঙ্গা কাশী।

কে আছে এমন জন জিঞাইবে স্বামীধন

তার আমি হব দাসের দাসী।।[৩০]

কিন্তু ঠিক উলটো নিয়ম ছেলেদের বেলায়। নখাই কামসোনা নারীকে দেখে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে এক প্রকার ধর্ষণই করেছে। সে নিজেকে স্বামীর অধীন বললেও নখাই তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করেছে এবং নিজের কামজ্বালা মিটিয়ে তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। উপরন্তু সেই নারী সোনকাকে অভিযোগ করতে গেলে সে নিজের ছেলের দোষ চাপা দেবার জন্য তাকে বহুমূল্যের জিনিস দিয়ে তার মুখ বন্ধ করেছে-

কে তোকে করিলে বল করিয়া শিশুর ছল

ভাণ্ডিয়া বেড়াও সভার মন।

জে হৈল সে হৈল মাও　　　　চুপে চুপে ঘরে যাও

দ্বিগুণ পোঢ়িয়া অভরণ।।[৩১]

কাব্যে সামাজিক বৈষম্য এর পাশাপাশি নারীদের সামাজিক অবস্থান কবি সুচারুভাবে দেখিয়েছেন। বর্তমান সমাজের মতোই তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ছিল কড়ি নির্ভর। কড়ি মাহাত্ম্যের গুণ কবি বর্ণনা করেছেন এভাবে-

কড়ি জগতের মূল　　　　কড়ি রাখে জাতিকুল

সঙ্কটে করেন পরিত্রাণ।

এই কড়ি আছে জার　　　　সফল জীবন তার

কড়ি হৈলে হয় মহাজ্ঞান।।[৩২]

এছাড়া দৈনন্দিন জীবনের লোকাচার কাব্যে কিছুটা উঠে এসেছে। যাত্রাপথে এই সংস্কার মেনে চলা হত-

হাঁচি জিঠি বাধা পড়ে মাথায় ঠেকে চাল।

বামে সর্প দেখিলেন দক্ষিণে স্রিকাল।।

মাথায় পসার করি তেলিনী চলি জায়।

শুখান কাঠেতে বসি কাগে কাড়ে খায়।।[৩৩]

এগুলি সবগুলিই অমঙ্গলের সূচক। সামাজিক রীতিনীতির স্তরে এগুলি সবাই মেনে চলত। কবি এই বিষয়গুলি সুন্দরভাবে কাব্যে তুলে ধরেছেন। কাব্যে তন্ত্রের উপাদান ব্যবহারের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়গুলি কবি যেভাবে দেখিয়েছেন তা সততই প্রশংসার দৃষ্টান্ত বহন করে। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের কবিগণ কবি তন্ত্রবিভূতির এই কাব্যের ধারাকে নিপুণভাবে আত্মসাৎ করেছেন, তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। মৌলিকতার পাশাপাশি বিষয়ভাবনার বৈচিত্র কবির কাব্যকে অনন্য দিকের দিশারী করে তুলেছে।

দ্রষ্টব্য

১. কবি তন্ত্রবিভূতির *মনসাপুরাণ* কাব্যের শুরুতে 'দু-চার কথা' অংশে সমালোচক সুকুমার সেন দেবী মনসার 'তোতলা' নামের স্বপক্ষে কিছু সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-' এদিকে ভোজপুরী মনসার কাহিনীতে পাঁচ বোন মনসার মধ্যে একজনের নাম 'দোতোলা ভবানী'। 'দোতোলা' নামটি যদি ঠিক হত তবে মনসাকে দন্তুরা বলা যেত, কিন্তু তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মহাযান বৌদ্ধধর্মের মহাদেবী তারার মন্ত্রে তাঁকে 'তুত্তারা' বলা হয়েছে।–"ওঁ তারে তুত্তারে......."। এই তুত্তারার সঙ্গে তোতলা নামটির ধ্বনিসংগতি আছে। কিন্তু মানে ?' এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

২. দেবী মনসা হংসে আরোহণ করেন। শুধুমাত্র দেবীর বাহন রূপে হংস এখানে গুরুত্ব পাচ্ছে তা নয়। সমালোচক সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় 'সরস্বতী ও মনসা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন হংসের ধর্মীয় অনুষঙ্গ। তাঁর মতে-'...হংস এখানে কেবল বাহন নয়। সংসার-বারিধিতে সে পরমহংসের মতো বিচরণ করে।' সে জ্ঞানেরও প্রতীক বটে।

সূত্র: সনৎকুমার মিত্র সম্পা., *উর্বরতার দেবী সরস্বতী,* লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০০৬। পৃ. ৪০-৪৪।

তথ্যসূত্র

১. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৮।

২. তদেব, পৃ. ১৯।

৩.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* , তৃতীয় খণ্ড : প্রথম খণ্ড, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮-১৯, পৃ. ৬৫।

৪. তদেব, পৃ. ৬৬।

৫. আশুতোষ দাস, *তন্ত্রবিভূতি* ; বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পা., *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা* , দ্বিতীয় বর্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০, পৃ. ৮৭।

৬. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ*, ঐ, পৃ. ১।

৭. স্বপনকুমার ঠাকুর, *সর্পদেবী মনসা ও নেতার তান্ত্রিক রূপ বৈচিত্র্য* ; জয়দেব দাস সম্পা., *আমাদের চারুপাঠ*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১৮৩।

৮. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ*, ঐ, পৃ. ৮।

৯. তদেব, পৃ. ২।

১০. পঞ্চানন শাস্ত্রিণা সম্পা., রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য রচিত *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ* , নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২০২।

১১. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ*, ঐ, পৃ. ৯।

১২. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা* , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০৬।

১৩. দেবব্রত নস্কর, *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮ অক্টোবর, পৃ.১১৯।

১৪. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ*, ঐ, পৃ. ৫২।

১৫. তদেব, পৃ. ৩০৮।

১৬. তদেব, পৃ. ৩০৯।

১৭. তদেব, পৃ. ২০১।

১৮. তদেব, পৃ. ১০৩।

১৯. তদেব, পৃ. ১১৩।

২০. তদেব, পৃ. ১১৫।

২১. মহাত্মা নাগভট্ট, *বশীকরণ-তন্ত্রম্‌-* বা *কামরত্ন,* অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১০৬।

২২. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ,* ঐ, পৃ. ১১৬।

২৩. মহাত্মা নাগভট্ট, *বশীকরণ-তন্ত্রম্‌-* বা কামরত্ন, ঐ, পৃ. ১০৮।

২৪. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ,* ঐ, পৃ. ৪৫৭।

২৫. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ,* ঐ, ভূমিকা অংশ, পৃ. ২৫।

২৬. আশুতোষ দাস সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ,* ঐ, পৃ. ১১২।

২৭. তদেব, পৃ. ২৯৭।

২৮. তদেব, পৃ. ৩১৪।

২৯. তদেব, পৃ. ৩৭২।

৩০. তদেব, পৃ. ৪৩৩।

৩১. তদেব, পৃ. ২৪৬।

৩২. তদেব, পৃ. ১৫৬।

৩৩. তদেব, পৃ. ২৫৫।

বিপ্রদাস পিপিলাই

মঙ্গলকাব্যের ধারায় *মনসামঙ্গল* কাব্য প্রধান শাখার একটি অংশ। *মনসামঙ্গল* কাব্যধারায় যেমন পৌরাণিক চেতনা আছে তেমনি মিশে আছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভক্তির নিগূঢ় নির্যাস। এই কাব্যধারায় বহু কবির পরিচয় আমরা পাই, তার মধ্যে কবি বিপ্রদাস পিপিলাই অন্যতম। দেবী মনসার উৎপত্তি নিয়ে নানা কবি নানান ভাবে কাহিনী ব্যাখ্যা করেছেন। কবি বিপ্রদাসের কাব্য বিষয় বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। আখ্যান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমসাময়িক ইতিহাস চেতনা। কাব্য বিশ্লেষণের নিরিখে সেই বিষয়গুলি আমরা আলোচনায় রাখব।

কবি বিপ্রদাসের কাব্যরচনা কাল পঞ্চদশ শতাব্দী। কাব্যে বর্ণিত-

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শাক পরিমাণ।

নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।।[১]

অর্থাৎ 'অঙ্কস্য বামাগতি' সূত্রে ১৪১৭ বঙ্গাব্দ বা ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ এই কাব্যের রচনাকাল; সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় বিপ্রদাস পিপিলাই-এর *মনসামঙ্গল* কাব্যর রচনাকাল ১৪৯৫-৯৬ সালই ধরেছেন।$_{দ্র.১}$ সেই সময়ে সিংহাসনে বসে আছেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তাঁর রাজত্বকালের সময়সীমা ১৪৯২-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ।.

কাব্যের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে দেবী মনসার জন্ম বৃত্তান্ত-

মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারি।

তথির কারণে নাম মনসা কুমারী।।

নিরঞ্জন কায়ভেদ সর্বশাস্ত্রে জানি।

ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া নাম হইল ব্রহ্মাণী।[২]

এখানে কাব্যে দেবাদিদেব শিবের মানসকন্যা। শিবের মানসকন্যা হবার সুবাদে তাঁর কিছু ক্ষমতা দেবী মনসা পেয়েছেন-

মহাজ্ঞান দিলা যদি দেব শূলপানি।

যোগেশ্বরী নাম আর সরস যোগিনী।।[৩]

মহাদেব তাঁর কন্যাকে মহাজ্ঞান প্রদান করেছেন। এই মহাজ্ঞান শব্দের তাৎপর্য আছে। সবাই এই শক্তির অধিকারী হয় না। এর অর্থ আমরা পরে ব্যাখ্যা করব। দেবী মনসাকে কবি ‘আদ্যাশক্তি’-র সাথে তুলনা করেছেন-

ত্বং ভব আদ্যাশক্তি ত্বং সতী পার্বতী

ত্বং ভব সাগর সারং।

ভবতি সত্ত্ব রজ ত্বং ভব অগ্র অজ

ত্বং ভব শুচি অধিকারং।।

ত্বং ভব কাক্তি মুক্তি ত্বং ভব যুক্তি ভক্তি

ত্বং ভব ভূত নিদানং।

ত্বং ভব ব্রহ্মজ্ঞানং ত্বং তত্ত্ব নিরুপম

প্রকৃতি ত্বং ভব ধ্যানং।।[৪]

দেবীকে এখানে কবি শক্তিতত্ত্বের সাথে একাত্ম করে কাব্যে তুলে ধরেছেন। দেবী সমস্ত সৃষ্টির মূল। তাঁকে বাদ দিয়ে জগৎ সংসার অচল। তাতেই বিশ্বশক্তির প্রধান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমাহিত। এই তত্ত্ব শুধু দেবী মনসার ক্ষেত্রে খাটে না, সব দেবী শক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আদ্যা শক্তি সম্পর্কে কবি বলেছেন-

আদ্যা শক্তি সৃজন করিলা মহাশয়।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলা তেজোময়।।

সত্ত্ব রজ তম গুণে ব্রহ্মা হরিহর।

সৃজন পালন ক্ষয় করে নিরন্তর।।[৫]

এই আদ্যাশক্তির অংশ হল দেবী মনসা। দেবী মনসার সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছেন কবি-

জীবন্যাস করিয়া মনসা থুইল নাম।

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দেখি অনুপাম।।[৬]

দেবীর সৃষ্টিতেও এসেছে তন্ত্রের অনুষঙ্গ। 'জীবন্যাস' একটি তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া। পূজা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এখানে দেবীর উদ্ভাবন প্রসঙ্গে কবি কথাটি এনেছেন। আবার এই মনসাকে দেখে তার পিতা শিব তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছে-

মনসা দাঁড়াইলা মহাদেবের অগ্রেতে।

দেখিয়া লোভিত হর চাহে কামচিত্তে।।[৭]

পরবর্তী সময়ে মহাদেব তার কন্যাকে 'ব্রহ্মজ্ঞান' দান করেছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থপ্রসঙ্গে সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস বলেছেন-' শাক্তদের মতে শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী। দেব্যুপনিষদে আছে-সব দেবতা দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: মহাদেবি ! কে তুমি ! দেবী বললেন: আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমার থেকে প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আমি শূন্য ও অশূন্য, আনন্দ ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞন।'[৮] শুধু দেবীকেই শিব এই শক্তি প্রদান করেননি, এই শক্তি দিয়েছেন শিব নেতোকে। নেতো নিজের পরিচয় দিয়েছে এইভাবে-

শিব-লোচনের জলে জনম আমার।

ব্রহ্মজ্ঞান দিল মোরে বাপু মহেশ্বর।।[৯]

কন্যার মঙ্গলার্থে মহাদেব তাঁকে সৃজন করেছেন। সেও দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে নিজেকে 'ভগিনি' রূপে পরিচয় দান করেছেন। কন্যার ভালোর জন্য মহাদেবের এই পদক্ষেপ পিতৃসত্তার দিককে উন্মোচিত করে। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তার স্বরূপ জানা যায় না, সেই জন্য এখানে নেতো সেই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।

অপরদিকে আরেকটি বিষয় কাব্যে উল্লেখযোগ্য, সেটি হল ধন্বন্তরি প্রসঙ্গ। সমুদ্র মন্থনে তাঁর উত্থান। কাব্যে উল্লেখিত-

জতনে অমৃত লৈয়া ব্রহ্মা তার তরে দিয়া

সিদ্ধি-ঝুলি দিল জয়নেত।

বিষ্ণু অংশে অবতরি নাম হৈল ধন্বন্তরি

মথনে জন্মিল আশ্চম্বিত।।[১০]

এখানে জয়নেত ও সিদ্ধিঝুলির অর্থ ভিন্ন। এর সাথে আবার মহাজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। মহাজ্ঞান কথার অর্থ হল- '...শরীরের মৃত্যুবীজকে অস্বীকার করার সাধনা-মৃত্যুকে জীবনে ফিরিয়ে দেবার প্রয়াস যাদের, তাদের শক্তি-

'মহাজ্ঞান'।'[১১] এই মহাজ্ঞান যতক্ষণ সিদ্ধপুরুষের হস্তগত ততক্ষণ শত বাধা এলেও তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই মহাজ্ঞানের মধ্যে তন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়-'তন্ত্র মন্ত্র আদি যত দেহ মহাজ্ঞানে।' জয়নেত ও সিদ্ধিঝুলি এই মহাজ্ঞানের অংশবিশেষ। সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাস এর বিবরণ দিয়েছেন-'মহাজ্ঞানের দুটি চিহ্ন- **১.** জয়নেত ; **২.** সিদ্ধঝুলি। জয়নেত, অর্থাৎ জয়পতাকা; সিদ্ধঝুলি অর্থাৎ - জটা এবং অক্ষগুটিকা (বীজমন্ত্র পড়ার)। জটা মাথায় পরে অক্ষগুটিকার ঝুলি হাতে রেখে বীজমন্ত্রের সাধনা করে মহাজ্ঞান লাভ করতে হয়।'[১২] চাঁদ সদাগরের কাছে এই মহাজ্ঞান তার জীবনের অঙ্গস্বরূপ। মহাজ্ঞান আছে বলেই চাঁদ সদাগরের অধিকার সর্বত্র-

মহাজ্ঞান জানে সার কারো ডর নাহি তার

সিদ্ধি বিদ্যা জানে মহা বলে।।[১৩]

মহাজ্ঞানের জোরে দেবী মনসা যখন চাঁদের নখরা বন ধ্বংস করে, নিমেষে মহাজ্ঞান স্মরণ করে সে সব কিছুকে জীবন্ত করে তোলে-

মহাজ্ঞান জপে মনে জয় নেত আচ্ছাদনে

নিমিষে নাখরা জিয়াইল।[১৪]

এই রকম দৃষ্টান্ত আরো লক্ষ করা যায়। শত শিষ্য যখন বিষপুষ্পের জ্বালায় মৃত তখন ধন্বন্তরি মহাজ্ঞান প্রয়োগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শত শিষ্য বেঁচে ওঠে-

শিরে জয়নেত ছিল তুরিতে বাড়ায়্যা দিল

ধনা মনা ধরে দুইপাশ।।

শতেক কুমার জীল মনসা তরাস পাইল[১৫]

এখানে জয়নেত এমন এক বস্ত্র যা বুলিয়ে দিলে রোগীর বা বিষদগ্ধ প্রাণীর জীবনী শক্তি ফিরে আসে। আবার এই মহাজ্ঞান হারিয়ে চাঁদ সদাগরের অবস্থা দেখবার মত হয়েছে। কাব্যে উল্লেখিত-

হতজ্ঞান রাজা মনে ভাবয়ে বিষাদ।

মৃতবৎ হইয়া কান্দে ডাকে আর্তনাদ।।[১৬.]

সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাস-এর মতামত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-'...মনসামঙ্গল আর নাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে লৌকিক বিশ্বাস মোটামুটি এই রকম-মহাজ্ঞান যতক্ষণ সিদ্ধপুরুষের আয়ত্ত, ততক্ষণ কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। বিষবিদ্যা আর শরীরবিদ্যা-যোগ ও তন্ত্র এই দুই সাধনার ধারা এইভাবে মনসামঙ্গল ধারায় একাকার হয়েছে।'[১৭]

এই মহাজ্ঞান ও তৎসংলগ্ন শিক্ষা তন্ত্র জাত। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ধন্বন্তরি ও কমলার কথোপকথনে। কমলা তাঁর কাছে এই বিদ্যা শিখতে গেলে আলোচনা সূত্রে উঠে এসেছে তন্ত্রের প্রসঙ্গ-

প্রাণের সমান তুমি সএয়ার বনিতা।

তন্ত্রে মন্ত্রে সর্বগুণে তুমি সাবহিতা।।

তার কিছু বিদ্যা শিখাও আমারে।

দাসীরূপ হৈয়া সেবা করিব তোমারে।।[১৮]

এছাড়াও সঙ্ক ধন্বন্তরির মৃত্যু কীভাবে হবে তার অদ্ভুত পদ্ধতি এখানে উল্লেখিত-

জয়নেত সিদ্ধিঝুলি   যদি হরে পদ্মা বালি

উদয়কাল খায় বক্ষস্থলে।

আপনি মনসা যদি   ভার হানে নিরবধি

তবে ওঝা ধন্বন্তরি ঢলে।।[১৯]

কিন্তু মৃত্যুকে হারিয়ে আবার বেঁচে ফিরে আসা সম্ভব, এখানে তার বিষয়ও উল্লেখিত-

ধনা মনা যায় ধয়্যা   গন্ধমাদনে গিয়া

সালি বিসালি আনে যদি।

সমুদ্রের ফেনা আর   ঘা-মুখে দিবেক মোর

তবে রক্ষা করিব গোসাঞি।[২০]

মানুষের জীবন চলে গেলে তা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। লৌকিক পদ্ধতিতে জীবদেহে প্রাণ সঞ্চারণের উল্লেখ কাব্যে কবি করেছেন-

জলজন্তু যত ছিল সকলি মরিল।

নদী দেখি মহাসঙ্ক সবিস্ময় হৈল।।

জীব সঞ্চারণ বাণ এড়ে সঙ্ক রায়।

মহাজ্ঞানে ধন্বন্তরি কাটিয়া ফেলায়।।[২১]

বা

পৃথিবী বিজয় গুরু নাম ধন্বন্তরি।

তাহার চৌষট্টি বিদ্যা সভে মোরা ধরি।।

....

মহাজ্ঞান চিন্তি ধনা বসিল আসনে।

জীব সঞ্চারিণী বিদ্যা ভাবিলেক মনে।।

অমৃত করণ ভাবি দিলেন হুঙ্কার।

যেমত আছিল বৃক্ষ হৈল পুনর্বার।[২২]

কবি বিপ্রদাস কাব্যের স্থানে স্থানে সর্পবিদ্যকদের মৌখিক পরম্পরা- 'চৌষট্টি বিদ্যা', 'জীব সঞ্চারণী' বিদ্যা, 'অমৃত করণ' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এগুলি তন্ত্রোক্ত নানান ক্রিয়া বা আচারের উদাহরণ। নিম্নবর্গীয় সমাজের লৌকিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তন্ত্র অভিচারের সূক্ষ্ম দিকগুলি এখানে লক্ষণীয়।

জীবনদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের সর্পবিদ্যার উল্লেখ কাব্যে কবি উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রের আগম শাস্ত্র অনুযায়ী এর নিদান পাওয়া যায়-

গুরুর যতেক জ্ঞান আগমের বাণী।

উভার সম্ভার নিসম্ভার তত্ত্ব জানি।

সিদ্ধি বাণ তন্ত্র কাঁচ ধাতু সবিশেষ।

নাগ-বাচা শিক্ষা জানি গুরু-উপদেশ।।

নিরীক্ষণ স্তম্ভন মোহন গুণ ধরি।

হুঙ্কারেতে মৃত জীব জিয়াইতে পারি।।[২৩]

'স্তম্ভন', 'মোহন' এসব তন্ত্রোক্ত নিম্নশাখার একেকটি ভাগ। জীবন রক্ষার্থে এগুলি যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনই মানুষের অনিষ্ট সাধনে এর ভূমিকা অনবদ্য। *কামাক্ষ্যা তন্ত্র-মন্ত্রসার, ডাকিনীতন্ত্র, বশীকরণতন্ত্রম্* এই তন্ত্রোক্ত গ্রন্থগুলিতে মোহনবিদ্যা, স্তম্ভন প্রভৃতির বিস্তারিত উল্লেখ আছে। বিষ বিতাড়নের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তন্ত্রের ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য, কাব্যে বর্ণিত-

খড়্গ ভেদিয়া বিষ গগন শিখর।

ঈঙ্গলা পিঙ্গলা চিত্ত সমুদ্র ভিতর।।

কেনি প্রাণনাথ হেরো আপনা পাসর।

মন পবনেতে জীব পরিচয় কর।।[২৪]

এই বিবরণ দীর্ঘ। এখানে বিষগ্রস্থকে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। এই রীতিতে তন্ত্রোক্ত বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। 'ঈঙ্গলা'(ইড়া), 'পিঙ্গলা' নাড়ি সহযোগে চিত্তের সঙ্গে যোগাযোগ এই ক্রিয়া একমাত্র নাথ ও তন্ত্রদর্শনের বিষয়। এখানে কবি বিষ নামানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিষ নামানোর প্রক্রিয়ায় যেমন তন্ত্রের ভূমিকা লক্ষণীয় তেমনি অস্থি চর্মহীন কঙ্কালকে মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে কাব্যে কবি তন্ত্রের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। লখিন্দরকে বাঁচানোর বিষয়ে তন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়-

বসিলেক খড়্গ ভেদি পবনের সন্ধি।

পবনের পাশে অস্থি চিত্ত কৈল বন্দী।।

মুষ্টি মুষ্টি নিবিষ্টী জপিল মূল মন্ত্র।

গরুড় আসনে বসি নিরক্ষর তন্ত্র।।[২৫]

এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। মনকে আগে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে, তারপর মন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে হবে তন্ত্রমতে। তারপর প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হবে। অন্যদিকে বিষ উৎপাটনের ক্ষেত্রে দেবী মনসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। 'নাগবাচা বিদ্যা' দেবী লখিন্দরকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন-

নাগবাচা বিদ্যা দেবি পড়িল আপনি।

ঝাটো আসিলেন বিষ কালনাগিনী।।

মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে।

ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে উঠে।।[২৬]

বিষের এই অনুশীলন পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তন্ত্র মতেই গৃহীত হত। কাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়-

রক্তের পরশে বিষ জীব জন্ম কায়।

তন্ত্রে মন্ত্রে মর বিষ ধর্মের আজ্ঞায়।।[২৭]

কাব্যে তন্ত্রের উপাদানের পাশাপাশি সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে সমাজে নারীদের খুব সহজেই চরিত্রহীনতার অপবাদ দেওয়া হত। সেজন্য সনকা তাঁর স্বামী চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে বাণিজ্য যাত্রাকালে পত্র লিখিয়ে নিয়েছে-

হেনকালে সনকা বলয়ে বিদ্যমানে।

পঞ্চমাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে।।

লোকধর্মাচারে পাছে হয় অপমান।

তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।।[২৮]

সমাজে অস্পৃশ্যতার প্রভাব প্রবল ভাবে ছিল। ডোম, গোপ প্রভৃতি জাতিদের সমাজে উচ্চস্থান দেওয়া হত না। ডোমবেশী পার্বতীকে যখন শিব দেখে তাঁর সঙ্গ কামনা করে, পার্বতী জানায়-

আমি মল মূত্র ধারী অতিহীন জাতি।

আমা পরশিলে তোর রহিবে অখ্যাতি।।[২৯]

গোপ জাতির প্রতিনিধি নিজেদের অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে বলেছে-

ত্রৈলোক্য-দেবতা তুমি আমি গোপজাতি।

কেমনে উচ্ছিষ্ট দিব আমার শকতি।।[৩০]

কিছু কিছু বিষয়ে লৌকিক সংস্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাত্রাকালে ‘হাঁচি’ পড়া অমঙ্গলজনক। কাব্যে উল্লেখিত-

হাঁচি জেটী পড়ে যবে যাত্রা করে রায়।

সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়।।[৩১]

এছাড়াও কাব্যে দ্রব্যগুণের উল্লেখ অনেক জায়গায় আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাপের বিষ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় তেঁতুলের স্পর্শে । কাব্যে উল্লেখিত-

তেতুলি-অগ্নিস্পর্শে সর্বাঙ্গ জ্বলিল বিষে

ছয় ভাই হরিল চেতন।[৩২]

এই রকম নানা সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় দিকগুলি কাব্যে পরিস্ফূট যা বিপ্রদাস পিপিলাই-এর কাব্যকে অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে।

দ্রষ্টব্য

১. সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম* গ্রন্থে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের গ্রন্থ রচনার কাল হিসেবে 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।'-পংক্তিটি ব্যবহার করেছেন, সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাস সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মতকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কাব্যে লিখিত 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শাক পরিমাণ।' এখানে 'শক' এর জায়গায় 'শাক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঠান্তরজনিত কারণে এই রকম হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

তথ্যসূত্র

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পা., *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* রত্নাবলী, কলিকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৫৫।

২. তদেব, পৃ. ২৫৫।

৩. তদেব, পৃ. ২৫৫।

৪. তদেব, পৃ. ২৫৫।

৫. তদেব, পৃ. ২৫৭।

৬. তদেব, পৃ. ২৬৫।

৭. তদেব, পৃ. ২৬৭।

৮. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৩৪।

৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পা., *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* ঐ, পৃ. ২৭০।

১০. তদেব, পৃ. ২৮৩।

১১. তদেব, পৃ. ১১৪।

১২. তদেব, পৃ. ১১৫।

১৩. তদেব, পৃ. ৩০৯।

১৪. তদেব, পৃ. ৩৪০।

১৫. তদেব, পৃ. ৩৫১।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৪৩।

১৭. তদেব, পৃ. ১১৫।

১৮. তদেব, পৃ. ৩৫৫।

১৯. তদেব, পৃ. ৩৫৭।

২০. তদেব, পৃ. ৩৫৭।

২১. তদেব, পৃ. ৩৪৫।

২২. তদেব, পৃ. ৩৬৭।

২৩. তদেব, পৃ. ৩৬৫-৬৬।

২৪. তদেব, পৃ. ৩৫৯।

২৫. তদেব, পৃ. ৪৬৪।

২৬. তদেব, পৃ. ৪৬৫।

২৭. তদেব, পৃ. ৪৬৫।

২৮. তদেব, পৃ. ৩৮৮।

২৯. তদেব, পৃ. ২৬২।

৩০. তদেব, পৃ. ৩১২।

৩১. তদেব, পৃ. ৩৩১।

৩২. তদেব, পৃ. ৩৭৯।

রাধানাথ রায় চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লেখক রাধানাথ রায় চৌধুরীর নাম খুব স্বল্প পরিসরে শোনা যায়। *মনসামঙ্গল* কাব্যধারার ইনিই শেষ কবি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সমালোচক প্রভাত মুখোপাধ্যায় *মনসামঙ্গল* কাব্যধারার যে তালিকা দিয়েছেন তাতে রাধানাথ রায় চৌধুরীর নাম শেষে দিয়েছেন। কবির পরিচয় হিসাবে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-' শ্রীহট্টের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এই রাধানাথ রায়কেই বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি বলে ধরা হয়।'[১] কাব্য সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা হল-' শ্রীহট্টের স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণ-রাজা সুবিদ্ নারায়ণের পবিত্র বংশে, দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত ব্রহ্মচাল পরগণার নন্দনগর গ্রামে স্বর্গীয় কবি রাধানাথ রায় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।'[২]

কাব্যের রচনাকাল হিসাবে কোনো নির্দিষ্ট সময়কালের উল্লেখ না থাকলেও কবির পুত্র দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী **১৩১৯** সালে এই কাব্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। কবি তাঁর কাব্য সম্পূর্ণ শেষ করতে পারেননি। রোগ শয্যায় থাকাকালীন তিনি এই কাব্য লেখা শুরু করেন। কাব্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি, চন্দ্রধর কর্তৃক পদ্মাবতীর পূজার অধিবাস পর্যন্ত লিখে তিনি পরলোক গমন করেন। $_{দ্র.১}$ গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার কথা কাব্য থেকেই জানা যায়। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মনসামঙ্গল কাব্যের বাকি অংশ কবির মধ্যম পুত্র অমরনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় শেষ করেন।

কবি রাধানাথ রায় চৌধুরী কাব্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। *মনসামঙ্গল* কাব্যধারায় চিরপ্রচলিত নায়ক-নায়িকা লখিন্দর ও বেহুলা এই কাব্যে কবির হাতে নাম বদলে হয়েছে লক্ষ্মীধর ও বিপুলা হয়েছে। কাহিনীর দিক থেকে খুব বেশী রূপান্তর চোখে পড়ে না কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষত বর্ণনার দিক থেকে উনিশ শতকের যুগ বৈশিষ্ট্যর ছায়া ধরা পড়ে। কাব্যের শুরুতে কবি 'দশাবতার বন্দনা' দিয়ে শুরু করেছেন। তার পরে 'বাগীশ্বরী বন্দনা' শুরু করেছেন এভাবে-

প্রণনামি সরস্বতী অনাদ্যা প্রকৃতি।

বাক্যরূপা ত্রিজগতে যাঁহার বসতি।।[৩]

দেবী সরস্বতীকে কবি 'অনাদ্যা' $_{দ্র.২}$ বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া দেবী সরস্বতীর সাথে দেবীর মনসার সূক্ষ্ম যোগ আছে। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস বলেছেন-' শতপথ-ব্রাহ্মণে বাগ্দেবীকে বলা হয় সর্পরাজ্ঞী। সর্প উর্বরতা ও প্রজননের প্রতীক। কাজেই বাক্ বা সরস্বতী যে মাতৃদেবতা এ-ক্ষেত্রেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।'[৪] *ঋগ্বেদ*-এ দেবী সরস্বতী শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ দেবী হিসাবেই স্বীকৃত।

দেবী মনসার বন্দনা কবি এভাবে করেছেন-

তুমি জগতের মাতা,　　　　তুমি ত্রিলোচনসুতা,

তুমি দেবী মুক্তিবিধায়িনী।।

কে জানে তোমার তত্ত্ব,　　　　মাহাত্ম্যতত্ত্ব নিত্য,

তুমি মাতা সত্যসনাতনী।।[৫]

দেবী যেমন একদিকে ‘জগতের মাতা’ অপরদিকে কবি মনসার বন্দনা করেছেন এভাবে-

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,　　　　যত ইতি চরাচর,

তোমা ভয়ে সদা কম্পমান।[৬]

দেবী একাধারে জগতের কল্যাণকারী শক্তি অপরদিকে দেব-দেবীদের ভয়ের কারণ। দেবী মনসার রূপ বর্ণনা করেছেন এভাবে-

চতুর্ভুজা ত্রিনয়না,　　　　সুচারু গৌরবরণা

পদ্মাসনা পতিতপাবনী।

কনকমুকুট শিরে,　　　　কিবা শোভা নাগহারে,

সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ ভুজঙ্গিনী।।[৭]

বা

চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী,　　　　সুচারু গৌর-বরণী

মুক্তিদাত্রী তুমি অনায়াসে।।[৮]

সাধনমালা-য় উল্লেখিত কবির এই বিবরণের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। সমালোচক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য দেবী জাঙ্গুলী-র বেশভূষার বিবরণ দিয়েছেন- ‘... জাঙ্গুলীর মূর্তিকল্পনা নানারূপে করা হইয়াছিল। তাঁহার রং কখনও সাদা, কখনও হরিত, আবার কখনও পীত হয়। শুক্লমূর্তিতে জাঙ্গুলী একমুখী ও চতুর্ভুজা, সৌম্যমূর্তি ও শ্বেতসর্পের অলংকারে বিভূষিতা।’[৯] দেবী জাঙ্গুলীর সাথে মিল রেখে কবি এই বর্ণনা কাব্যে রেখেছেন। এর পাশাপাশি কবি জগৎ-সংসারের মূল দেবী মহামায়ার গুণ কীর্তন করেছেন। দেবীর মহিমা ছাড়া এই সংসার অচল।

মায়াময় এ সংসার জানে সর্ব্বজনে।

অতএব গতি নাই মহামায়া বিনে।।[১০]

দেবীর ইচ্ছার ব্যতিরেকে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। দেবী মহামায়াই সৃষ্টির মূল-

ব্রহ্ম- আদি তৃণাবধি যত চরাচর।

তোমার বিভূতি সব তুমি পরাৎপর।।

ইচ্ছামতে সৃষ্টিস্থিতি, ইচ্ছাতে প্রলয়।

ইচ্ছা কর ইচ্ছাময়ী যাতে সৃষ্টি হয়।।

তব ইচ্ছা-বিনে সৃষ্টি করিতে না পারি।[১১]

দেবী মহামায়া বা শক্তি থেকেই সমস্ত দেব-দেবীরও জন্ম। কবির এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় তন্ত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রে। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন- 'শাক্তরা মনে করেন, সব দেবতা শক্তিরই রূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি তাঁরই পুংরূপ। বামাকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে, ত্রিপুরাদেবী ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপিণী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উপলক্ষণ। মোট কথা স্ত্রীদেবতাই হোন আর পুরুষদেবতাই হোন, সবাই শক্তিরই রূপ।'[১২] এই মহামায়া শক্তিই নানা রূপে পরিদৃশ্যমান হয়। কাব্যে মহামায়া শক্তি রূপে দেবী পার্ব্বতীকে উল্লেখ করা হয়েছে। নানান রূপের সমাহারে দেবীর লীলা বর্তমান-

তুমি জগতের ধাত্রী, তুমি জগতের কর্ত্রী,

তুমি মাগো শ্যামা রমা উমা।

ভবানী ভৈরবী ভীমা, ভবজায়া অনুপমা,

কেবা জানে তোমার মহিমা।।

তুমি জগতের সিদ্ধি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধি শুদ্ধি,

শান্তি কান্তি সর্ব্ব-স্বরূপিণী।[১৩]

এই দেবীকেই কবি তন্ত্রোক্ত পরিভাষায় 'মূলাধার' বলে উল্লেখ করেছেন। এই দেবীর অংশ দেবী মনসা। রূপের ভিন্নতা নাম আলাদা, স্বরূপগত দিক থেকে সবাই এক শ্রেণির। কবির ভাষায়-

সংসারে পুরুষ যত সব মম কায়া।

নারীরূপা যত আছে সব মহামায়া।।[১৪]

সাপের বিষ ঝাড়নের ক্ষেত্রে দেবী মনসা অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। পিতা শিবের প্রাণদান করার ক্ষেত্রে দেবীর করণীয়-

চতুর্দ্দিক সামালিল জল ছিটা দিয়া।

ঝাড়িতে লাগিলা আদ্যমন্ত্র উচ্চারিয়া।।

মন্ত্র পড়ি মনসা করিলা আবাহন।

প্রবেশিল অঙ্গে ঊনপঞ্চাশ পবন।।

প্রাণাপান সমান উদান আর ব্যান।

ক্রমে ক্রমে পঞ্চবায়ু প্রবেশিল স্থান।।[১৫]

দেবী মনসা জীবদেহে প্রাণদানের জন্য ঐ একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। লক্ষীধরের পুনর্জীবন প্রাপ্তি অংশে দেবী একই মন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। জল সহযোগে 'আদ্য মন্ত্র'$_{দ্র.২}$-এর উচ্চারণ তিনি করেছেন। তার পাশাপাশি তিনি যে প্রক্রিয়া করেছেন তা তন্ত্র প্রসূত-

মূলমন্ত্রে জীবন্যাস করিলা যতনে।

শরীরের বিভূতি প্রবেশে স্থানে স্থানে।।

প্রাণাপান সমান উদান আর ব্যান।

একে একে পঞ্চবায়ু হয় অধিষ্ঠান।।[১৬]

বিষ ঝাড়নের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, দেবী প্রথমে জীবন্যাস প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছেন। এই প্রক্রিয়া পুরোপুরি তন্ত্রানুসারী। তার সাথে উঠে এসেছে 'পঞ্চবায়ু'-র প্রসঙ্গ। তন্ত্রোক্ত মতে স্থূল শরীরকে শোধনের ক্ষেত্রে এই পঞ্চ বায়ুর প্রয়োজন। সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য-র মতে-'... লিঙ্গ-শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট। চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন ও বুদ্ধি- ইহাদিগকে লিঙ্গ-শরীরের অবয়ব বলা হয়।'[১৭] দেবী প্রথমে দেহকে শোধন করেছেন তারপর বিষ ঝাড়নের কাজে অগ্রসর হয়েছেন। চন্দ্রধরের ছয় পুত্রের জীবনদানের বিষয়ে দেবী মনসা জীবন্যাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষের প্রভাব দূর করেছেন-

জীবন্যাস মন্ত্রেতে করিলা আবাহন।।

ছ'জনের মহাপ্রাণ শূন্যাকারে ছিল।

আবাহন পেয়ে অঙ্গে প্রবেশ করিল।

তাহা দেখি পদ্মাবতী ছাড়িল হুঙ্কার।

দুরন্ত সাপের বিষ হইল সংহার।।[১৮]

কবি কাব্যের আরেক জায়গায় লক্ষীধরের মৃত্যুর প্রমাণ অংশে সুতীক্ষ্মভাবে তন্ত্রের ব্যবহার করেছেন। সাপেদের নামের ক্ষেত্রে কবি তন্ত্রোক্ত পরিভাষা গ্রহণ করেছেন-

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা সর্প, আসিলা করিয়া দর্প

শঙ্খিনী চাপিনী আদি করি।[১৯]

'ইঙ্গিলা', 'পিঙ্গিলা' এই শব্দ দ্বয় ইড়া-পিঙ্গলার পরিবর্তিত রূপ। তন্ত্রে ইড়া-পিঙ্গলা তথা ষটচক্রের ভূমিকা অপরিসীম। কবি এখানে সুচারুভাবে তা ব্যক্ত করেছেন।

এই কাব্যে কবি শক্তি ও শিবের দ্বন্দ্বকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। চন্দ্রধরকে দেবী পদ্মাবতী বিপদে ফেললে চন্দ্রধর দেবী ভগবতীর স্মরণ নেন। চন্দ্রধরকে দেবী চণ্ডী সাহায্য করলে অভিমানী পদ্মা বাধ্য হয়ে পিতা মহাদেবের স্মরণাপন্ন হন। তখন মহাদেব তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে দেবী চণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে দেবী চণ্ডীর যে রূপ দেখা যায় তা অনেকখানি শক্তিতত্ত্বকে সমর্থন করে-

অনাদ্যা প্রকৃতি শক্তি অসাধ্য কি তাঁর।

অঙ্গের বিভূতি যত করিবেক বার।।

চতুঃষষ্টি যোগিনী নায়িকা শক্তি যত।

ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি সব হৈল অপ্রমিত।।[২০]

'চতুঃষষ্টি যোগিনী'$_{দ্র.৩}$ দেবীরই অংশবিশেষ। দেবীর কার্যে সহায়তার জন্যই তাদের সৃষ্টি। এই যুদ্ধে শিব পরাস্ত হয় এবং দেবীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তন্ত্র অনুযায়ী শক্তি বিনা শিবের অস্তিত্ব নেই। *গন্ধর্বতন্ত্র* অনুসারে 'যিনি শক্তি তিনিই শিব। এঁদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। শিব ছাড়া শক্তি নাই, শক্তি ছাড়া শিব নাই।'[২১]

তন্ত্রের পাশাপাশি কবি সামাজিক দিকগুলি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কাব্য লিখেছেন কবি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ছায়া তখনও বর্তমান। বুড়ো বয়েসে পুরুষের বিবাহ করতে তার বিবেকেও বাদে না-

বয়সে বাপের বড় দেখি লজ্জা হয়।

হেন-বরে কন্যা দিতে কোন্ ছারে কয়।।

বিবাহ হইলে পাছে হবে বড় তাপ।

বালিকার বুড়া-পতি কিবা ডাকে বাপ।।[২২]

দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও পরনারীতে আসক্ত পুরুষ সমাজ। কামে মত্ততা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিব পার্বতী থাকা সত্ত্বেও গঙ্গাকে নিয়ে মত্ত। পার্বতীর গলায় তাই অভিযোগ ঝলসে উঠেছে-

পরনারী লয়ে সদা থাকে পর ঘরে।

আমার ঘরেতে নাই এক-মুষ্টি দানা।।

দেখিয়া শরীর পুড়ে তব কারখানা।

ক্ষুধাতে না মিলে অন্ন, সহিতে না পারি।

তোমার পাপেতে আমি জনম-ভিখারী।।[২৩]

অপরদিকে হীরা কুচুনীকে নিয়ে দেবাদিদেব শিব কামে উন্মত্ত। স্ত্রী পার্বতীর কথা তার মনেই থাকে না। আনন্দ রসেই জীবন কাটুক এই হল মূল বক্তব্য-

বিহার করয়ে শিব কুচুনী লইয়া।

গলাগলি কোলাকুলি আনন্দে মাতিয়া।।[২৪]

কামোন্মত্তা শুধু শিবের মধ্যেই নেই, চন্দ্রধরের মধ্যেও আছে। পদ্মারূপী কনকাকে দেখে কামানলে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে চন্দ্রধর। সুনুকা তার স্ত্রী জানায় এই নারী তার বোন, তা সত্ত্বেও চন্দ্রধর ক্ষান্ত হয় না। সুনুকা বাধ্য হয়ে পতির মান রাখার উদ্দেশে তাকে রাজি করায়-

সম্মতি না দেও যদি, না কর স্বীকার।

পুরুষ বধের পাপ হইবে তোমার।।

পতির দুর্গতি মোর না সহে পরাণে।

সেকারণে লজ্জা ছাড়ি বলি তোমা স্থানে।।[২৫]

এটা সুনুকার জীবনের ট্রাজেডি। পতির অন্যায়কে সমাজের খাতিরে তাকে মেনে নিতে হচ্ছে। সেইজন্য নারীগণের পতিনিন্দা অংশে ফুটে উঠেছে নারীদের হাহাকার, দুর্দশার চিত্র।

আমাদের কর্ম্মদোষে নাহি সুখলেশ।

এই মনে হয় ছাড়ি যাই কোন দেশ।।

পতির যাতনা আর কত বা সহিব।

গরল খাইয়া আজি নিশ্চয় মরিব।।[২৬]

সমাজের দেগে দেওয়া আদর্শ 'পরম দেবতা পতি, পতি মূলাধার।/ পতির যে গতি হয় সে গতি ভার্য্যার।।'[২৭] এর থেকে বেরোতে কখনই নারীদের দেওয়া হয়নি। আর যখনই বেরোতে গেছে তখনই তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কলঙ্কের ডালি। মধ্যযুগীয় সংস্কারের ধারা উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে বর্তমান ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কবির কাব্যে নানা বিবরণের সঙ্গে উঠে এসেছে অশ্লীলতার প্রসঙ্গ। শিবের বিবাহ অংশে নারদ নিজে কৌতুক করার জন্য পুরনারীদের মধ্যে ভূতের অনুপ্রবেশ ঘটান, এর ফলে বিপত্তির সূত্রপাত-

নারীগণ মধ্যে যত ভূতে করে ভর।

জ্ঞান বুদ্ধি যত কিছু হইল অন্তর।।

কেহ হাসে, কেহ নাচে, কেহ করে কেলি।

উলঙ্গ হইয়া কেহ দেয় করতালি।।[২৮]

বা কাব্যে কবি 'হারামজাদা'-র মত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া কাব্যে অনেক নতুনত্বের দিক লক্ষ করা যায়। *মনসামঙ্গল*-এর কাহিনীর মধ্যে রামায়ণ-এর চরিত্র এসে উপস্থিত হয়েছে। লঙ্কায় চন্দ্রধর বাণিজ্য সূত্রে উপস্থিত হয়েছে। পদ্মাবতীর দৌরাত্ম্যে বিভীষণ চন্দ্রধরকে ভুল বুঝলেও পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কাব্যের পরবর্তী অংশে *চণ্ডীমঙ্গল*-এর চরিত্রেরও সামনা সামনি আমরা হই। চম্পক নগরে অবস্থিত শঙ্খপতি

সদাগরের পুত্র ধনপতি সদাগর চরিত্র কাব্যে উঠে এসেছে। *মনসামঙ্গল*-এর কাহিনীর সঙ্গে *চণ্ডীমঙ্গল*-এর কাহিনীর উপাদান কবি নিপুণতার সাথে একাত্ম করেছেন। *মনসামঙ্গল* ধারার শেষ কবি রাধানাথ রায় চৌধুরী কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন, যেমন- নায়কের নাম লখিন্দর-এর পরিবর্তে হয়েছে লক্ষ্মীধর, বেহুলার পরিবর্তে হয়েছে বিপুলা। এছাড়াও স্থান-কাল-পাত্র কিছু কিছু নিজের চিন্তা অনুযায়ী তিনি পরিবর্তন করেছেন। কাব্যের আখ্যান তিনি পরিবর্তন করেননি।

দ্রষ্টব্য

১. কবির কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে কবির কাব্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য গ্রন্থে উল্লেখিত। কবি তাঁর নামের পদবি 'রায় চৌধুরী' এভাবেই কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

২. *স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর* খণ্ডের *কুমারিকা* খণ্ড, অধ্যায় ৬৫, শ্লোক ১২৭-এ উল্লেখিত- 'দেব্যঃ সর্বাশ্চ মদ্রূপং নৈতজজ্ঞেয়মতোহন্যথা।' অর্থাৎ এই পুরাণ অনুসারে দেবী বলেছেন-' সমস্ত দেবীই আমার রূপ বলে জানবে, এর কোনও অন্যথা নেই।' দেবী তার ব্যতিক্রম নন।

৩. চিন্ময়ী দুর্গার নানা মূর্তির ভিতরে এই যোগিনীদের আত্মপ্রকাশ। দুর্গাঘটের নিম্নে যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত হয় তার প্রতি দলে আটটি করে মোট চৌষট্টি যোগিনী পূজার বিধান আছে। *কালিকাপুরাণ*-এ দেখতে পাই চৌষট্টি যোগিনীর বিভিন্ন নাম, যথা- ১. ব্রহ্মাণী ২. চণ্ডিকা ৩. রৌদ্রী ৪. গৌরী ৫. ইন্দ্রাণী ৬. কৌমারী ৭. ভৈরবী ৮. দুর্গা ৯. নারসিংহী ১০. কালিকা ১১. চামুণ্ডা ১২. শিবদূতী ১৩. বারাহী ১৪. কৌশিকী ১৫. মাহেশ্বরী ১৬. শঙ্করী ১৭. জয়ন্তী ১৮. সর্বমঙ্গলা ১৯. কালী ২০. করালিনী ২১. মেধা ২২. শিবা ২৩. শাকম্ভরী ২৪. ভীমা ২৫. শান্তা ২৬. ভ্রামরী ২৭. রুদ্রাণী ২৮. অম্বিকা ২৯. ক্ষমা ৩০. ধাত্রী ৩১. স্বাহা ৩২. স্বধা ৩৩. অপর্ণা ৩৪. মহোদরী ৩৫. ঘোররূপা ৩৬. মহাকালী ৩৭. ভদ্রকালী ৩৮. কপালিনী ৩৯. ক্ষেমঙ্করী ৪০. উগ্রচণ্ডা ৪১. চণ্ডা ৪২. চণ্ডনায়িকা ৪৩. চামুণ্ডা ৪৪. চণ্ডবতী ৪৫. চণ্ডী ৪৬. মহামোহা ৪৭. প্রিয়ঙ্করী ৪৮. বলবিকরিণী ৪৯. বলপ্রমথিনী ৫০. মদনোন্মথিনী ৫১. সর্বভূতদমনী ৫২. উমা ৫৩. তারা ৫৪. মহানিদ্রা ৫৫. বিজয়া ৫৬. জয়া ৫৭. শৈলপুত্রী ৫৮. চণ্ডিকা ৫৯. চন্দ্রঘণ্টা ৬০. কুষ্মাণ্ডা ৬১. স্কন্দমাতা ৬২. কাত্যায়নী ৬৩. কালরাত্রী ৬৪. মহাগৌরী

তথ্যসূত্র

১. প্রভাত মুখোপাধ্যায়, *মনসামঙ্গলের ইতিবৃত্ত* , সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ২০১২, পৃ. ২৮।

২. রাধানাথ রায় চৌধুরী, *পদ্মাপুরাণ* , দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ২০১৭ জুন, পৃ. ৪।

৩. তদেব, পৃ. ৩৪।

৪. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৭৩।

৫. রাধানাথ রায় চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৫।

৬. তদেব, পৃ. ৩৫।

৭. তদেব, পৃ. ৩৫।

৮. তদেব, পৃ. ৭৫।

৯. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী সম্পা., বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-র *বৌদ্ধদের দেবদেবী,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫ জুলাই, পৃ. ৭৫।

১০. রাধানাথ রায় চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৮।

১১. তদেব, পৃ. ৪০।

১২. উপেন্দ্রকুমার দাস, ঐ, পৃ. ৩৩৮।

১৩. রাধানাথ রায় চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৫২।

১৪. তদেব, পৃ. ৭২।

১৫. তদেব, পৃ. ৭৮।

১৬. তদেব, পৃ. ২৪৮।

১৭. সুখময় ভট্টাচার্য, *তন্ত্রপরিচয়,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৫২।

১৮. রাধানাথ রায় চৌধুরী, ঐ, পৃ. ২৫১।

১৯. তদেব, পৃ. ২৩৯।

২০. তদেব, পৃ. ১৫৩।

২১. উপেন্দ্রকুমার দাস, ঐ, পৃ. ৩৩৯।

২২. রাধানাথ রায় চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৫৭।

২৩. তদেব, পৃ. ৬৯।

২৪. তদেব, পৃ. ৭০।

২৫.তদেব, পৃ. ১০৯।

২৬. তদেব, পৃ. ১৮৬।

২৭. তদেব, পৃ. ২১২।

২৮. তদেব, পৃ. ৫৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা পৃ. ৬৯-১৫৬

- দ্বিজমাধব ৭২-৮৩
- দ্বিজ রামদেব ৮৪-৯১
- ভবানীশঙ্কর দাস ৯২-১০২
- মুকুন্দ চক্রবর্তী ১০৩-১২৫
- মুক্তারাম সেন ১২৬-১৩১
- রামানন্দ যতি ১৩২-১৫৬

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা

মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে প্রধান শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারা। এই কাব্যধারায় কবিরা নানান শতাব্দীতে নানা রূপে দেবী চণ্ডীকে তাঁদের কাব্যে তুলে ধরেছেন। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার দুটি উপাখ্যান যথাক্রমে কালকেতু উপাখ্যান ও ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। কাহিনীবৃত্তের এই দুটি ধারাকেই অবলম্বন করে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজমাধব, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন, ভবানীশঙ্কর দাস তাঁদের কাব্যের আখ্যানভাগ সাজিয়েছেন। দেবী চণ্ডীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর দুটি রূপ। একটি হল তাঁর পৌরাণিক রূপ, আরেকটি তাঁর লৌকিক রূপ।

'চড়ি' ধাতুর অর্থ হল কোপ প্রদর্শন করা। সেই অর্থে দেবী চণ্ডী কোপন স্বভাবা। শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করার জন্য তিনি নানা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন। তখন তিনি চণ্ডিকা রূপেই সকলের সামনে প্রতিভাত হন। আবার তিনি ভক্তের কল্যাণার্থে সর্বসমক্ষে 'মঙ্গলচণ্ডী' নামে খ্যাত হন। কবি দ্বিজ মাধব থেকে শুরু করে মুক্তারাম সেন, ভবানীশঙ্কর দাস দেবী মঙ্গলচণ্ডীর রূপকেই কাব্যে তুলে ধরেছেন। পৌরাণিক রূপ অপেক্ষা দেবীর লৌকিক রূপ সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য এবং গ্রহণীয়, তাই বর্তমান সময়ে এই মঙ্গলচণ্ডীর রূপকেই গৃহস্থের ঘরে অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সমালোচক মহানামব্রত ব্রহ্মচারী-র মতে-'ব্রহ্মের শক্তি তিনটি। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, "স্বাভাবিকী-জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ", জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি- এই প্রকাশ একই অখণ্ড শক্তির। সেই অখণ্ড শক্তির নাম চণ্ডী।'[১] তন্ত্রশাস্ত্র মতে, মহাসরস্বতী চিদ্রূপা, মহালক্ষ্মী সদ্ রূপা ও মহাকালী আনন্দরূপা-র সমন্বিত একত্রীভূত শক্তিস্বরূপা দেবী চণ্ডী। চণ্ডীর *গুপ্তবতী টীকা*-য় উল্লেখিত-'চণ্ডী নাম পরব্রহ্মণঃ পট্টমহিষী দেবতা।'[২] দেবী চণ্ডী পরব্রহ্মের পট্টমহিষী দেবী। তন্ত্রমতে ইনিই সৃষ্টির আদি মূলীভূতা কারণ স্বরূপ।

দেবীর অনুষঙ্গে নানা নামে কবিরা তাঁকে সম্বোধন করেছেন। কখনো দেবী চণ্ডী কাব্যে হয়ে উঠেছেন- 'দুর্গা', 'ত্রিজগতমাতা', 'মূলাধারস্বরূপা', 'আদ্যাশক্তি' ইত্যাদি। প্রয়োজনের নিরিখে কবিরা দেবী চণ্ডীর নানা রূপ প্রকাশ করেছেন। কাহিনীর ধারা যেদিকে প্রবাহিত হয়েছে সেইরূপ গুণগত বৈশিষ্ট্য কবিদের লেখনিতে ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী-র কাব্যে সমাজদর্শন ও পুরাণের সমর্থনে দেবীর চণ্ডীর আখ্যানভাগ পরিপুষ্ট হয়েছে৷ অন্যদিকে দ্বিজ মাধব-এর কাব্যে দেবী চণ্ডী তন্ত্রমতের ভাবধারায় গড়ে উঠেছেন। এক্ষেত্রে কবির তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ততার প্রমাণ মেলে। দ্বিজ রামদেব কবি দ্বিজ মাধবের অক্ষম অনুকরণে কাব্যসৃষ্টি করেছেন। মুক্তারাম সেন ও ভবানীশঙ্কর দাস লৌকিক ভাবধারাকেই কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাব্যে দেবী চণ্ডীর অনুষঙ্গে যেখানে যেখানে শক্তিপ্রসঙ্গ ও তন্ত্রানুষঙ্গ এসেছে সেটিই বিশ্লেষণ করে আলোচনা করাই এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

তথ্যসূত্র

১. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *সপ্তসতী-সমন্বিত চণ্ডীচিন্তা,* শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪২৫, পৃ. ৩৩।

২. তদেব, পৃ. ৩৩।

দ্বিজমাধব

বাংলা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারায় দ্বিজমাধব রচিত *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* অন্যতম আকর্ষণ। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারায় মুকুন্দ চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি হলেও কবি দ্বিজমাধব-এর অবদান অস্বীকার করা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে কবি দ্বিজমাধব তাঁর কাব্য লিখে গেছেন। কাব্যে কবি পুরাণের পাশাপাশি তন্ত্রের বহু তথ্য আখ্যানের সাথে মিশিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কবির সময়কাল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।

দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা চরিত।।[১]

কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী সময়কাল ধরলে ১৫০১ শকাব্দ হয় অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দ হয়। সমালোচকদের মধ্যে এই নিয়ে মতান্তর থাকলেও সমালোচক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় দ্র.১ উভয়েই কবির কালজ্ঞাপক শ্লোককেই মান্যতা দিয়ে তাঁদের যুক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাব্যে অন্যান্য কবিদের মতো দ্বিজমাধব রচিত কাব্যে স্বপ্নাদেশের উল্লেখ নেই, যা পরবর্তী কালে কবি দ্বিজ রামদেব, রামানন্দ-এর কাব্যেও একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাবে। কাব্যের প্রথমে বন্দনা অংশে প্রথমে ঠাঁই পেয়েছে সূর্য বন্দনা। সাধারণত কাব্যের শুরু গণেশ বন্দনা দিয়ে শুরু হয়, কিন্তু কবি চিরাচরিত প্রথা থেকে সরে এসে সূর্য বন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু করেছেন। সমালোচক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য এই সূর্য বন্দনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- '...তন্ত্রে শ্রীবিদ্যা-প্রকরণে প্রথম সূর্য্য-পূজা করিবার বিধি আছে। তন্ত্রসার এই প্রসঙ্গে রুদ্র-যামল হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন:

আদিত্যং পূজ্যেদাদৌ প্রত্যক্ষং লোক-সাক্ষিণম্।

অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ কল্পকোটিশতৈরপি ।।

বৃহৎ স্তবরাজ নামক পুস্তকেও আছে :

স্নানন্তু বিধিবৎ সন্ধ্যাং তর্পণং সূর্য্যপূজনম্ ।

কৃত্বা পূজালয়ে চাত্র পঞ্চমীং পূজয়াম্যহম্ ।।'[২]

এছাড়াও কবি 'সর্ব্ব দেব-দেবী-বন্দনা' অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বিষ্ণুর অবতার, গুরু বন্দনা করেছেন। তন্ত্র মতে 'সর্ব্ব দেব-দেবীর বন্দনা করা তান্ত্রিক পূজা-বিধির একটি অঙ্গ।'[৩] কবি কাব্যে সেটিই করেছেন। আবার কাব্যে কবি গুরু বন্দনাও করেছেন-

প্রণতি করিয়া বন্দোঁ যত দেবগণ ।।

গুরুর চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ।[৪]

তন্ত্র মতে অদীক্ষিতরা কখনোই সিদ্ধিলাভ করতে পারে না; দীক্ষার কাজ সম্পন্ন করবেন গুরু। তাই গুরুর গুরুত্ব এখানে অপরিসীম। দ্র.২ *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ* গ্রন্থে প্রথমেই গুরুমাহাত্ম্য উল্লেখিত-

জ্ঞানার্ণবে- গুরৌ মানুষবুদ্ধিন্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্ ।

প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ।।

জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ ।

গুরুর্বিশেষত পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রদর্শকঃ ।।

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ ।

শিবে রুষ্ট গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ।।

-অর্থাৎ 'জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে, গুরুর প্রতি মানুষবুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষরবুদ্ধি এবং প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয়। পিতা-মাতা জন্মের হেতু বলিয়া সযত্নে পূজনীয় সত্য, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রদর্শক গুরুদেব তদাপেক্ষাও পূজ্য। গুরুই পিতা, মাতা, দেবতা ও একমাত্র গতি। শিব (পরমশিব বা শ্রেষ্ঠদেব) রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ ত্রাতা নাই।'[৫]

তন্ত্রে যেহেতু গুরু বন্দনা অবশ্য করণীয় সেইজন্য কবি তা কাব্যে স্থান দিয়েছেন। বন্দনা অংশে কবি দেবী সরস্বতীকে 'বিষ্ণুর বনিতা'[৬] বলে উল্লেখ করেছেন-

বন্দম সরস্বতী করিয়া প্রণতি স্তুতি

যুগপাণি প্রণতি বচন।

হও মোরে কৃপা-যুতা বিষ্ণুর বনিতা নিত্যা

ঘটে আসি কর অধিষ্ঠান।।[৭]

সমালোচক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য *বিশ্বসারতন্ত্র*-র মত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন সরস্বতী 'বিষ্ণুর বনিতা' এটি আসলে তান্ত্রিক মত এবং নানা জায়গায় কবি দেবী সরস্বতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

দেবী সরস্বতী বন্দোঁ হৃদয়ে সতত।

দেবতা বলিতে নারে যাহার মাহাত্ম্য।।

ধবলবসন দেবী ধীর গম্ভীর।

পঞ্চাশ অক্ষরে যার নির্ম্মাণ শরীর।।[৮]

'পঞ্চাশ অক্ষর' শব্দবন্ধ কবি ব্যবহার করেছেন কাব্য বহুবার। তন্ত্রে এর স্বীকৃতি লক্ষ করা যায়-

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তি-মুখ-দোঃ-পন্-মধ্য-বক্ষঃস্থলাং

ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধ-চন্দ্র-শকলামাপীন-তুঙ্গ-স্তনীম্ ।

মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-

র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ।।[৯]

অর্থাৎ বাগ্দেবীর ধ্যান প্রসঙ্গে 'পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তি' শব্দবন্ধ তন্ত্রে ব্যবহৃত। বাগ্দেবীর বর্ণনা পঞ্চাশটি বর্ণের দ্বারা করা হয়েছে। কবি দ্বিজমাধব সেই সূত্র ধরে কাব্যে তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও সব দেব-দেবীর বর্ণনাও কবি করেছেন। সমালোচক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য-র মতে-'সর্ব্ব দেব-দেবীর বন্দনা করা তান্ত্রিক পূজা-বিধির একটি অঙ্গ।'[১০] কাব্যে কবি সেই তন্ত্রমতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিবরণ অপ্রতুল। পৌরাণিক মতকে স্থাপন করার পাশাপাশি তন্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে কবি কাব্যের মধ্যে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন।

কাব্যে দেবী চণ্ডীকে নানা রূপে কবি বর্ণনা করেছেন যেমন-

চণ্ডিকা চামুণ্ডা ভীমা প্রচণ্ড মহিমা

চণ্ডমুণ্ড কালী কাত্যায়নী।

উগ্রচণ্ডা রূপ ধরি ঘাতিলা দেবের অরি

অমরাএ স্থাপিলা বজ্রপাণি।।[১১]

বা *কারাগারে কালকেতু কর্ত্তৃক দেবীর স্তব* অংশে দেবীর নানা রূপের সঙ্গে আমাদের সাথে পরিচয় ঘটে-

সাবিত্রী গায়ত্রী মেধা তুষ্টি রূপা স্বাহা স্বধা

ত্রিনয়না ত্রিশূল-ধারিণী।

হৈমবতী উমা নাম ত্রিভুবনে অনুপাম
নিদ্রারূপী তুহ্মি নারায়ণী।।
তুহ্মি দেবী শাকম্ভরী ভ্রামরী রূপ ধরি
অসুরেরে করিলা নিধন।
দুর্গা নামে দুর্গাসুর সমরে করিলা চূর
তবে সে তারিলা দেবগণ।।[১২]

কালকেতুর কাছে দেবীর এই রূপই গ্রহণীয়-

শুনিয়া সেবক-বাণী না লঙ্ঘিলা নারায়ণী
দশভুজা হইলা তখন।[১৩]

দেবী চণ্ডী স্বয়ং মহাবিদ্যার অংশ; সময়ে সময়ে নানা প্রয়োজনে তিনি বহু রূপ ধারণ করেন। দেবী চণ্ডীর নানা রূপ নানাভাবে কাব্যে কবি তুলে ধরেছেন। মূল শক্তি এক, কিন্তু প্রকাশ বহু। জগৎ সংসারের সৃষ্টির মূলে এই আদ্যাশক্তি; সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের ইচ্ছাশক্তি তাঁর উপর ক্রিয়াশীল। তাঁর ইচ্ছাতেই সারা বিশ্ব গতিশীল এবং ক্রমবর্ধমান ধারাতে এগিয়ে যেতে সক্ষম। তিনি পথ প্রদর্শন না করলে সারা বিশ্ব অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকবে। সমালোচক আশুতোষ দাসের মতে- 'বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছেন নারী, জগজ্জনয়িত্রী মহামায়া- এ তন্ত্রপ্রতিপাদ্য। তিনি স্বয়ংভবা, আদ্যাশক্তি। এক থেকে বহু হলেন আপন সৃজনেচ্ছায়। সৃষ্টিপ্রকরণে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের জননী। তন্ত্রানুসারে তিনি যখন বিশ্বরূপা তখন ব্রহ্মসনাতনী, যখন প্রলয়রূপা তখন মহাকালী, যখন স্বরূপা তখন পরা (পরাৎপরা), পরমা, পরমেশ্বরী।'[১৪]

কাব্যে আরো তন্ত্রের অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। *কলিঙ্গরাজ-কর্তৃক মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা* অংশে কলিঙ্গরাজের পূজা পদ্ধতিতে তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এছাড়াও ষোড়শোপচার সহযোগে বলিদান পূজায় উপাচার রূপে দেখা গেছে। কাব্যে উল্লেখিত-

নাসিকা ধরিয়া হাতে সুষুম্না নাড়ীর পথে
ভূতশুদ্ধি করে দণ্ডধর।
অঞ্জলি রাখিয়া অঙ্কে সলিল পুরিয়া শঙ্খে

সংক্ষেপে স্মরে বীজাক্ষর।।

তাহা স্থাপি পঙ্করাজে পাপ পুরুষ দেহী মাঝে

পূরক কুম্ভকে কৈল ক্ষয়ে।

বামপুটে নিঃশ্বাসে রেচক করয়ে শেষে

কালিকা ভাবিয়া হৃদয়ে।।[১৫]

তন্ত্রে এর স্বীকৃতি লক্ষণীয়। তন্ত্রে উল্লেখিত-

সুষুম্না-বর্ত্মনাত্মাং পরমাত্মনি যোজয়েৎ।

যোগেযুক্তেন বিধিনা চিন্মন্ত্রেণ সমাহিতঃ।।

কারণে সর্বভূতানাং তত্ত্বান্যপি চ চিন্তয়েৎ।

বীজভাবেন লীনানি ব্যুৎক্রমাৎ পরমাত্মনি।।

ততঃ সংশোষয়েদ্ দেহং বায়ুবীজেন বায়ুনা।

বহ্নিবীজেন তেনৈব সংহরেৎ সকলাং তনুম্।।

বিশ্লেষয়েৎ তদা দোষানমৃতেনাহমৃতাম্ভসা।

আপ্লাব্যাপ্লাবয়েদ্ দেহমাপাদতল-মস্তকম্।।

-অর্থাৎ 'দেশিক সমাহিত হইয়া সুষুম্না নাড়ী মার্গে কুণ্ডলিনীর সহিত আত্মাকে যোগযুক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ গুরুর উপদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বক্ষ্যমাণ আত্মমন্ত্রের দ্বারা সহস্রার কর্ণিকাগত পরমাত্মাতে যুক্ত করিবেন। সমস্ত ভূতের কারণ পরমাত্মাতে পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমূহকে ও বর্ণসমূহকে বীজরূপে ব্যুৎক্রমে লীন চিন্তা করিবেন।

তাহার পর বায়ুবীজ যকার ও বায়ুবীজোত্থ বায়ু দ্বারা দেহকে সম্যক্ রূপে শোষণ (নীরস) করিবেন। (ইহার দ্বারা পূরক উক্ত হইয়াছে)। তাহার পর পাপপুরুষকে ধ্যান করিয়া বহ্নিবীজ রেফ (রকার) ও বহ্নিবীজোৎপন্ন অগ্নিদ্বারা নিজ-পাপরূপ পাপ-পুরুষের সহিত সকল দেহকে দগ্ধ করিবেন। (ইহার দ্বারা কুম্ভক উক্ত হইয়াছে)।

তখন পাপ পুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ হইলে বায়ু-বীজের দ্বারা দোষগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন। (ইহার দ্বারা রেচক উক্ত হইয়াছে।) তাহার পর অমৃতবীজ বং মন্ত্রের দ্বারা ও অমৃত বীজোৎপন্ন অমৃত জলের দ্বারা দেহকে প্লাবিত করিয়া আপাদতল মস্তক দেহকে আপ্লাবিত করিবেন।'[১৬] কাব্যে এর প্রতিফলন দেখা যায় এবং ষোড়শোপচার-এর অনুষঙ্গ এসেছে। তন্ত্রে বর্ণিত- ' পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপনীরাজন ছত্র চামর দর্পণ রক্ষাচমনীয় নৈবেদ্য পানীয় ও তাম্বূল এই ষোড়শ পদার্থ উপাচার করতে হবে।'[১৭] কাব্যে এর কিছুটা প্রতিফলন দেখা যায়-

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপখানি

হেমের গঠিল কলানিধি।

দিয়া নৈবেদ্য মধুপর্ক হইয়া রাজা সতর্ক

বলিদান কৈল বহুবিধি।।[১৮]

পরবর্তী অংশে নীলাম্বরের মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গেও এসেছে তন্ত্রের অনুষঙ্গ। কাব্যে উল্লেখিত-

সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।

ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে।।

শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব।

অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত।।

সেই অমৃত রহে ভাল পুরুষের স্থান।

নহি টলিবেক পথ সুস্থির পরাণ।।[১৯]

ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ি সহযোগে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে উপনীত করতে পারলেই পরম শক্তি লাভ করে সাধক; কিন্তু গুরু এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন, সাধককে সঠিক দিশা দেখাবেন। কাব্যে সেই গুরুর ভূমিকা নিয়েছে দেবাদিদেব শিব। তন্ত্রোক্ত শিক্ষাপদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। আরো কিছু কিছু বিষয়ে তন্ত্রের অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়। খুলনার ঋতুসংস্কার অংশে ধনপতি তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে এই আচার অনুষ্ঠান সমাধা করেছে-

নাসিকা ধরিয়া হাতে সুষুম্না নাড়ীর পথে

জীবন্যাস করে সদাগর।

অঞ্জলি করিয়া সলিল পুরিয়া

সংক্ষেপে স্মরে বীজাক্ষর।।

করে হেমাঙ্গুরী লইয়া খুলনার নাভি ছুইয়া

বারে বারে দেহিত গর্ভেত ।।[২০]

কবি যে কাব্যের স্থানে স্থানে তন্ত্রের উপাদান সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন তা সহজেই বোঝা যায়।

তন্ত্রের উপাদান ব্যবহার করার পাশাপাশি কবি তৎকালীন সমাজের নানা দৃষ্টিভঙ্গি, লোকাচার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বহু কাল ধরেই চলে আসছে ; পশুদের ক্রন্দন অংশে সেই চিত্রই তুলে ধরে। সেই সময়ে সতীন সমস্যা বড় ছিল, এই নিয়ে ঘরে ঘরে অশান্তির অন্ত ছিল না। কালকেতুর ক্ষেত্রে এবং ধনপতি সদাগর উভয়ের বাড়িতে একই সমস্যা নিয়ে নারীরা সোচ্চার হয়েছে। দেবীর সুন্দরী রূপ দেখে ফুল্লরা কালকেতুকে ভুল বুঝেছে, দেবীকে সে বলতে বাধ্য হয়েছে-

কামিনী করয়ে কেলি সখা লইয়া পাশে।

হেন কালে যায়ে স্বামী বন-পরবাসে।।[২১]

আবার এই একই সতীনের কারণে লহনা বিলাপ করে বলেছে-

জন্মান্তরে পাপ কৈলু তে কারণে সতা পাইলু

শুনিয়া দগধে মোর গা।

সাউধ নিদয় বড় কুলিশ সমান দঢ়

স্ত্রীবধের নাহি লাগে ভয়।।[২২]

এর ফলে নানান বিপত্তির সূচনা। খুলনা দেবীকে সামগ্রিক পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে-

বিধির নির্ব্বন্ধ কেহো খণ্ডাইতে নারে।

অভাগী খুলনার বিহা সতিনীর ঘরে।।

বিবাহ করি গেল সাধু রাজার আরথি।

শূন্য ঘরে করে সতা নানান দুর্গতি।।[২৩]

সমাজ নির্ধারিত নিয়মের বাইরে কেউ নয়, সেটির পরিণতি খারাপ হলেও কিছু করার নেই কারণ সমাজ পুরুষতান্ত্রিক; সমাজই নারীর উপরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়-

পতি ছাড়ি গতি নাই স্ত্রীধর্ম্ম হৈয়া।[২৪]

আবার খুলনার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে এই পুরুষ সমাজ। খুলনা বারাবার তাদের নির্ধারিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং জয়ী হয়েছে; তা নাহলে সমাজ তাকে বিচ্যুত করত শুধুমাত্র কিছু নীতি ধর্মের প্রশ্নে কোনো যুক্তি ছাড়াই; ঠিক একই ভাবে পিতার পরিচয় না জানার দরুন পাঠশালায় অপমানিত হয় শ্রীমন্ত। নারীর পরিচয় এখানে বড় নয়, যতই আমরা দেবী চণ্ডীর পূজা করি না কেন কোথাও যেন পুরুষতন্ত্রের ছায়া এখানে প্রধান হয়ে ওঠে। নারীদের জন্য শুধুমাত্র বরাদ্দ থাকে 'নারীগণের পতিনিন্দা'। দাম্পত্য জীবনে অসহায় তা সত্ত্বেও স্বামী নিন্দা পাপ এটাও সমাজের শেখানো বুলি-

ইহলোকে পরলোকে পতি ত্রাণ-গতি।

তারে অবোধিয়া বলা তোরে না যুয়ারে।

নিন্দিলে পতিরে পত্নী অধোগতি পায়ে।।[২৫]

কবি সেই সব নারীর মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন তাদের বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা; উন্মুক্ত করেছেন তাদের মনোবেদনা-

স্বামী বৃদ্ধ হইল মোর যৌবনের কালে।।

পৃষ্ঠে কুজ পক্ক কেশ লড়য়ে দশন।

অবিরত হস্তপদ কম্পিত সঘন।।[২৬]

সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে কবি সেই সময়ের লোকাচারকেও তুলে ধরেছেন যা সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যাত্রা প্রসঙ্গে বর্ণিত-

মধ্য নগরে বাদিয়া নাচায়ে বানর।

তাহারে দেখিয়া সাধু চলয়ে তৎকাল।

যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা করে লইয়া থাল।।

তাহাকে দেখিয়া যাত্রা না করিল ভঙ্গ।

পন্থে যাইতে দেখে বামে কাল-ভুজঙ্গ।।

বাম দিক হোতে শিবা দক্ষিণে সে যায়ে।

তৈল লৈবা লৈবা তেলীয়ে বোলায়ে।।[২৭]

এগুলি সবই অশুভ ইঙ্গিত বোঝাচ্ছে যাত্রার ক্ষেত্রে তা সহজেই বোঝা যায়। অনেক ক্ষেত্রে জ্যোতিষীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে যাত্রার জন্য; সেই সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই তা জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল।

কবি দ্বিজমাধব কাব্যে যেমন তন্ত্রের বিষয় এনেছেন তেমনি সমসাময়িক সমাজকে তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তন্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি *শারদাতিলক* গ্রন্থের দ্র.৩ দ্বারা প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ কাব্যে পাওয়া যায়। কাব্যের নামের দিকেও তার উল্লেখ দেখা যায়।

কাহিনীগত মৌলিকতা এবং অভিনবত্বের দিক থেকে কিছু কিছু বিষয় উল্লেখযোগ্য, যেমন- কাব্যের শুরু সূর্যবন্দনা দিয়ে, গণেশ বন্দনা দিয়ে নয়; অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে পৃথক রীতি অবলম্বন করেছেন কবি। কাব্যে মাত্র দুটি বন্দনা অংশ- সূর্য বন্দনা এবং তার পরে গণেশ বন্দনা। এছাড়াও মঙ্গলদৈত্য নিধন করে দেবীর মঙ্গলচণ্ডী নামধারণ, নীলাম্বরের দেবাদিদেব শিবের কাছে মহাজ্ঞান লাভ, সিংহের আক্রমণে কালকেতুর পিতার মৃত্যুবরণ, বিষ্ণুপদের সংযোজন এবং পৌরাণিক বিবরণে স্বকীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে কবির বর্ণনা অনন্যতার দাবি রাখে। সবদিক থেকে বিচার করলে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার এটি একটি অদ্বিতীয় সংযোজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্রষ্টব্য

১. সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম* গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্তি দিয়ে কবির সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন। সমালোচক সুকুমার সেন বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও তিনি সেটি সুনিশ্চিতভাবে খণ্ডন করে নিজের মতামতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেজন্য সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মতামতকে প্রামাণ্য হিসাবে এখানে আমি ব্যবহার করেছি।

২. তন্ত্রে 'গুরু' শব্দের আলাদা অর্থ আছে। *কঙ্কালমালিনীতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রু-শব্দস্তন্নিরোধকৃৎ।
অন্ধকারবিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীরতে।।
গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রকারঃ পাপহারকঃ।
উকারস্তু ভবেদ্বিষ্ণু-স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্বয়ম্।।

-অর্থাৎ 'গুরু শব্দের অর্থ 'গু' শব্দের দ্বারা অন্ধকারকে বুঝায়। এবং উহার নিরোধকারী অর্থ 'রু' শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায়। যিনি (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারকে নিরোধ করেন, তিনিই গুরু।
গকারের অর্থ সিদ্ধিদাতা এবং রকারকে পাপহারক বলা হয়, আর উকারের দ্বারা বিষ্ণুকে বুঝায়, সুতরাং গুরু স্বয়ং তিন রূপ-বিশিষ্ট।'

৩. *শারদাতিলক* গ্রন্থটি সম্ভবত ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে গুর্জরনিবাসী লক্ষ্মণ দেশিক-এর দ্বারা সংকলিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পা., *দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩২৪।

২. তদেব, *ভূমিকা* , পৃ. ৫২।

৩. তদেব, *ভূমিকা* , পৃ. ৫২।

৪. তদেব, পৃ. ৭।

৫. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা. কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সংকলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ১।

৬. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পা. ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

৭. তদেব, পৃ. ৪।

৮. তদেব, পৃ. ৬।

৯. পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পা. ও অনূ. *শারদাতিলকতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৮, পৃ. ১৫৬।

১০. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পা. , *ভূমিকা* , পৃ. ৫২।

১১. তদেব, পৃ. ৩।

১২. তদেব, পৃ. ১০৪।

১৩. তদেব, পৃ. ৬৫।

১৪. আশুতোষ দাস, *মঙ্গলকাব্যে মাতৃকাতন্ত্র* ; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯-৮১, পৃ. ১০১।

১৫. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পা. ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

১৬. পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পা. ও অনূ. ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৭. উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পা. ,*পরশুরামকল্পসূত্রম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১২, পৃ. ৪১৮ ।

১৮. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পা. ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

১৯. তদেব, পৃ. ১২১-১২২।

২০. তদেব, পৃ. ২০৯।

২১. তদেব, পৃ. ৬১।

২২. তদেব, পৃ. ১৩৩।

২৩. তদেব, পৃ. ১৬৫।

২৪. তদেব, পৃ. ২৪৪।

২৫. তদেব, পৃ. ১৪০।

২৬. তদেব, পৃ. ১৪০।

২৭. তদেব, পৃ. ২১৯।

দ্বিজ রামদেব

বাংলা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের ইতিহাসে দ্বিজ রামদেব-এর *অভয়ামঙ্গল* এক অন্যতম সংযোজন। দ্বিজ রামদেব-এর কাব্য অন্যান্য কবিদের মতো বহুল প্রচলিত নয় কিন্তু সময়ের দাবিকে অস্বীকার করা যায় না; কবির কাব্য শুধু দেবী চণ্ডীর প্রশস্তি রূপে বিচার করলে তার যাথার্থ্য থাকে না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতির পরিচয় কতটা ফুটে উঠেছে তাও দেখার বিষয়। কবি যে সময় কাব্য লিখছেন তা হল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। কবির কালজ্ঞাপক শ্লোকটি হল-

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সন জিত।

রচিলেক রামদেবে সারদা চরিত।।[১]

সময়ের দিক থেকে দেখলে ১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দ। এক্ষেত্রে আমরা সমালোচক আশুতোষ দাস[২]-এর মতকেই নির্ভরযোগ্য মনে করে সময়কাল উল্লেখ করেছি।[দ্র.১] কবির কাব্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কাব্যে কোনো আত্মবিবরণী নেই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নাদেশের কোনো উল্লেখ নেই। মঙ্গলকাব্যের এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই দিক দিয়ে কবি বিষয়টিকে লঙ্ঘন করেছেন।

কবি রামদেব তাঁর কাব্যের শুরুতে দেবী চণ্ডীর অষ্টাহব্যাপী পূজার এবং চণ্ডীর অষ্টমঙ্গলা নামের কারণ সংক্ষেপে জানিয়েছেন- ১. মঙ্গলাসুর নিধনে দেবগণের পূজা ২. ইন্দ্রকর্তৃক পূজা ৩. কলিঙ্গরাজের পূজা ৪. গুজরাটে কালকেতুর পূজা ৫. কাননে খুলনার পূজা ৬. মশানে শ্রীমন্তের পূজা ৭. সিংহলরাজের পূজা ৮. ধনপতিকর্তৃক পূজা। এছাড়া কবি আরো কিছু আখ্যান কাব্যে সংযুক্তিকরণ করেছেন- ১. মঙ্গলদৈত্য বধ ২. চণ্ডীর মর্ত্যে পূজা প্রচারাভিলাষ ও কালকেতু উপাখ্যান ৩. ধনপতি ৪. শ্রীপতি উপাখ্যান

দ্বিজ রামদেব-এর কাব্যের একটি দিক হল কবি দ্বিজমাধব-কে তিনি অনুসরণ করেছেন। স্থানের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে উভয় কবিই চট্টগ্রামের বাসিন্দা এবং কাব্য মাহাত্ম্যের দিক থেকে দ্বিজমাধব-এর কাব্য বহুল প্রচলিত। কবি দ্বিজ রামদেব সেই প্রভাব থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে পারেননি যেটি পরবর্তীকালে কবি মুক্তারাম সেন নিজেকে স্বতন্ত্র করে কাব্য প্রতিভা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে দ্বিজমাধব-এর ছায়া কবি রামদেবের কাব্যে প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তা সত্ত্বেও কবির কাব্যের কিছু বিষয়ে স্বকীয়তা আছে; কিন্তু বেশিরভাগ অংশই প্রায় দ্বিজমাধব কৃত কাব্যের হুবহু প্রতিলিপি।

তন্ত্রের বিষয় এবং সমাজের নানাবিধ ঘটনার দিক থেকে কবির কাব্যের সঙ্গে দ্বিজমাধব-এর কাব্যের মিল আমরা দেখব। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে কবি কাব্য লিখলেও কবি তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী কাব্যকে সাজাতে পারেননি, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কবি দ্বিজমাধব-এর পক্ষপুটে। তাই অনেক বিষয়ে মিল থাকা অস্বাভাবিক নয়।

কবি দ্বিজ রামদেব কবি দ্বিজমাধব-এর মতো প্রথমে সূর্যবন্দনা দিয়েই কাব্য শুরু করেছেন, তারপর গণেশ বন্দনা করেছেন। তন্ত্রোক্ত মতে, সূর্যবন্দনা প্রথমে করে তারপর অন্যান্য দেব-দেবীর বন্দনা করা প্রশস্ত। কবির কাব্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। দেবী চণ্ডীকে কবি নানা রূপের সাথে অভিন্ন করে কবি কাব্য উপস্থাপন করেছেন। কাব্যে বর্ণিত-

নম নম নম বন্দম শঙ্করের জায়া।

সঙ্কটনাশিনী দেবী তুমি মহামায়া।

তুহ্মি জল তুহ্মি স্থল পবন আকাশ।

স্থাবর জঙ্গম তুহ্মি তুহ্মি সে হুতাশ।।[২]

কখনো দেবীকে 'মহামায়া' আবার কখনো দেবীর 'চামুণ্ডা', 'নারসিংহী', 'কালিকা', 'কাত্যায়নী', 'নারায়ণী' ইত্যাদি নানা নামে কবি অভিহিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কবি দেবীকে কবি কালিকার সাথে অভিন্ন করে তুলেছেন-

কালকেতুর এই স্বরচতুর্দ্দশ স্তুতি।

স্মরণে বিপদ খণ্ডে গৌরীপুরে গতি।।

দ্বিজ রামদেবে ভণে স্বপ্ন অনুমতি।

কালিকাসঙ্গীতা মতে রচাএ ভারতী।।[৩]

দেবী চণ্ডীর নানা রূপের প্রকাশে কবি দেবী চণ্ডীর স্তুতি করেছেন। *বারাহীতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানাং চ যথা হরিঃ।

স্তবনামপি স র্বেসষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ।।

-অর্থাৎ 'যেমন অশ্বমেধ সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেমন হরি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তবসমূহের মধ্যে সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) শ্রেষ্ঠ।'[৪] কবি সেই কাজই কাব্যের মাধ্যমে করেছেন; দেবীর এই নানা রূপ এটি শক্তিতত্ত্বের ইঙ্গিতকে মূলত প্রকাশ করে। শক্তির মূলে দেবীর একটিই সত্তা, কিন্তু প্রয়োজনের সাপেক্ষে প্রকাশ বহু। সমালোচক মহেন্দ্রনাথ সরকার-এর মতে-'...শক্তির সবিশেষ ও নির্বিশেষ প্রকাশ আছে। শুধু মূর্ত-বিশ্বে নয়, অমূর্ত-বিশ্বেও শক্তির বিকাশ আছে-মা উদার প্রশান্ত ও রূপহীন। শক্তির এখানে পরিণাম নেই, আছে প্রকাশ।'[৫] শক্তিতত্ত্বের এই ইঙ্গিতই কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কাব্যের অন্যান্য অংশে তন্ত্রের অনুষঙ্গ বর্তমান। কলিঙ্গরাজের দেবীর পুজা পদ্ধতিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

দেবীমুর্ত্তি অনুসারি   চক্ষুরুন্মীলন করি

প্রতি অঙ্গে করে জীবদান।

পুষ্প নির্ম্মঞ্ছিয়া ক্ষেপি   স্বতিক আসনে ধরি

পূজাতে বসিল সাবধান।।

অঙ্গে রাখি দুই কর   সমাধিতে দিয়া ভর

ভূতশুদ্ধি করিল রাজন।

পূজিয়া আধারস্থল   ত্রিভাগে পূজিয়া জল

অর্ঘ্যপাত্র স্থাপএ তখন।।[৬]

এখানে যে পদ্ধতিতে পূজার কথা বলা হয়েছে তা সবই তন্ত্রানুসারী। 'ভূতশুদ্ধি', 'জীবদান' সবই তন্ত্রের এক একটি পূজার উপাচার। এখানে তন্ত্রোক্ত বিষয় ফুটে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নীলাম্বরের মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রসঙ্গেও উঠে এসেছে তন্ত্রের প্রসঙ্গ ; মহাদেব যখন নীলাম্বরকে এই জ্ঞান প্রদান করছে তাতে উঠে এসেছে ইড়া-পিঙ্গলার ('ইঙ্গলা-পিঙ্গলা') প্রসঙ্গ। কাব্যে বর্ণিত-

নাসাপুটে বহে নিত্য ঝাঝাদি সমীর।

বায়ু বন্দী করিলে হএ জীব সুস্থির।।

ইঙ্গলা পিঙ্গলা মধ্যে সুষম্না বলবান।

ভাটি বন্দী করিলে হএ জীব বলবান।।[৭]

এ সব বিষয় কবি দ্বিজমাধব-এর কাব্যেও উপস্থিত; কবি সেই বিষয়গুলিকে সেই অনুযায়ী তুলে ধরেছেন, কোনো নতুন বিষয়ের অবতারণা তিনি করেননি। তন্ত্রের অনুষঙ্গ সেই ভাবেই উপস্থিত হয়েছে।

খুলনার দেবী পূজার ক্ষেত্রেও তন্ত্রের কিছু বিষয় উঠে এসেছে। কাব্যে বর্ণিত-

প্রথমে ভানুর পদে দিল অর্ঘ্যদান।

গণেশাদি পূজে ঘটে করি নানা ধ্যান।।

ভূতশুদ্ধি করে ধনি ভূতে দিয়া বলি।

আসন পূজিআ রামা পূজে অর্ঘ্যস্থলী।।

রক্ত পুষ্প লইআ করে যোনিমুদ্রা ভিড়ি।

ষৈসা ললিত ধ্যান পড়এ সুন্দরী।।[৮]

এখানে কিছু কিছু বিষয় তন্ত্রের দিক ফুটে উঠেছে, যেমন-যোনিমুদ্রা, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি। সবার আগে সূর্য পূজা তন্ত্র অনুযায়ী কাম্য; খুলনা সেই পদ্ধতিতে পূজার উপাচার শুরু করেছে। তারপর গণেশ ও অন্যান্য দেবতাদের পূজা ঘটে স্থাপন করেছেন। তারপর 'ভূতশুদ্ধি' করেছে। এটি সম্পূর্ণ তন্ত্রের বিষয়ীভূত।

উপাসনায় পাঁচ রকম শুদ্ধির কথা বলা হয়, যথা-আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি আত্মশুদ্ধির পক্ষে যথাযথ। ভূতশুদ্ধির বিষয়ে নানা তন্ত্র ও আগম গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য সহজভাবে বলেছেন-'... লিঙ্গ-শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরকে নির্মল করাই ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য। কিন্তু স্থূল শরীরের নির্মলতার দ্বারাই লিঙ্গ-শরীরকে শোধন করিতে হয়।'[৯] শরীরকে শোধন করে খুলনা রক্ত পুষ্পের মাধ্যমে যোনিমুদ্রা করেছে। এটিও তন্ত্রের বিষয়। কাব্যে কবি খুলনার দেবীপূজার বিষয়টি তন্ত্রের উপাদানে ভরিয়ে তুলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কবির কাব্যে পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয় এক অনন্য মাত্রার ইঙ্গিত দেয়। সমালোচক আশুতোষ দাস কবির এই কাব্যরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁকে 'কবিকঙ্কণের সুযোগ্য অধিকারী।'[১০] বলে চিহ্নিত করেছেন। কবির কাব্যে তন্ত্রের অনুষঙ্গ ছাড়াও বহু বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায় যাতে তাঁর বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এক ধরনের ভাব তন্ময়তার রূপ ফুটে ওঠে। সময়ের দিক থেকে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশের পরিপূর্ণতা এই সময়ে দেখা যায়, কবির কাব্যেও তার চিহ্ন বিদ্যমান-

তোহ্মার সখা সৈ আহ্মি গুণ জানম কিসের লাগি

তোর দুঃখে মোর তনু দহে।।

আহ্মা হোতে গুণ জান ঝাটে আন জোট পান

সৈয়ার নামে পানে দেম খিলি।[১১]

সমালোচক আশুতোষ দাস কাব্যে ব্যবহৃত এই পদগুলিকে 'বৈষ্ণবসাহিত্যের অমূল্য হারামণি'[১২] বলে উল্লেখ করেছেন।

কাব্যে তন্ত্রের উপাদানের পাশাপাশি সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ও কবি দ্বিজ রামদেবের কাব্যে ফুটে উঠেছে। সমাজে সতীন সমস্যা বড় সমস্যা ছিল মধ্যযুগে ; ধনপতির দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা শুনে লহনার অবস্থা-

লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগন।।

করের চামর ধরি মারিল পাছাড়।

কান্দিতে কান্দিতে গেল ভুবনমাঝার।।[১৩]

সমাজের এই নির্মম ব্যবস্থার প্রতি কোনো নারীর কিছু করার নেই, শুধু আফশোস করা ছাড়া-

প্রাণনাথ হইল বৈরী ছিড়িল প্রেমের দড়ি

কি বুঝি রহিতে বোল আর।

পুরুষ ভ্রমরাজাতি পাইল যুবতী অতি

কি আর যাইমু তার ঘর।।[১৪]

কবি নিজে এই ব্যবস্থা চোখের সামনে দেখেছেন, কিন্তু সমাজের এই কঠোর কুপ্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলার থেকে সামগ্রিক ভাবে তিনি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন-

পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাটারি।

একেতে মজিলে মন অন্য যায় ফিরি।।

অবলা অধম জাতি পদে পদে অপরাধ।

একেতে শরণ লইলে অন্যতে বিবাদ।।[১৫]

সমাজ নির্ধারিত নিয়মের বাইরে কেউ নয়, সেটির পরিণতি মন্দ হলেও কিছু করার নেই কারণ সমাজ পুরুষ শাসিত ; সমাজই নারীর উপরে দায় চাপিয়ে দেয়। তাই সে কারণে খুলনাকে বারবার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়,

ধনপতিও সমাজে বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হয়েও শুধুমাত্র নিজের আভিজাত্য বজায় রাখতে মুখ বুজে সহ্য করে, কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না-

দত্ত বোলে ধনপতি জ্বল অকারণ।

তোহ্মার যুবতীএ ছেলি রাখিছে কানন।।

রাঘবের বচনে সাধু মনে হইল দুঃখী।

হইল বানিআ সভা লাজ অধমুখী।।[১৬]

কিংবা শ্রীপতির মায়ের পরিচয় গৌণ হয়ে যায় যখন জনার্দ্দন পণ্ডিতের পিতার পরিচয়ের প্রশ্নের উত্তর শ্রীপতি দিতে পারে না। তাকে সেখান থেকে তাকে লজ্জাবশত পালাতে হয়।

লোকাচার, জ্যোতিষচর্চা এই সব বিষয়গুলি অন্যান্য কবিদের মতো কবি দ্বিজ রামদেব-এর কাব্যেও প্রকাশ পেয়েছে-

জ্যোতিষাএ বোলে সাধু কাল আছে ভাল।

সিংহলে যাইতে আজু হএ শুভ কাল।।

শুনিছি দক্ষিণ দিগে দুরন্ত সিংহল।

সোমবার হএ দিন দিগবল।।

মিলিছে সোভাগ্য যোগে ত্রয়োদশী তিথি।

অমৃতযোগ যাত্রা হইল উপনিতি।।

হইল মাহেন্দ্র খেন কাল অতি জিত।[১৭]

মঙ্গলকাব্যের এই বিষয়গুলি সব কবির লেখনিতে কম-বেশি উঠে এসেছে, এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব কবি দেখাননি।

কাব্যের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে কবি দ্বিজ রামদেব-এর কাব্য বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। বেশিরভাগ বিষয়ে কবি দ্বিজ মাধব-এর কাব্য আখ্যানকে সঙ্গী করে তিনি এগিয়েছেন; ফলে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে। দ্বিজমাধব-এর কাব্য তিনি অনুকরণ করলেও সবটা তিনি কবির কাব্য থেকে ধার করেননি, সমালোচক আশুতোষ দাস কবির গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে কবি দ্বিজ রামদেব-এর কাব্যের স্বকীয়তার বিষয়গুলিও তুলে ধরেছেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির কাব্যকে সম্পাদক আশুতোষ দাস ‘অক্ষম অনুকারী’[১৮] বলে অভিহিত করেছেন।

দ্রষ্টব্য

১. ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সন জিত।

রচিলেক রামদেবে সারদা চরিত।।

কাব্যে কবি দ্বিজ রামদেব-এর এই কালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায়, সেই ভিত্তিতে সময়কাল নির্ণয় করেছেন সমালোচক ও সম্পাদক আশুতোষ দাস। সেই ভিত্তিতে তাঁর নির্ণীত সময়কালকে এখানে আমি মান্যতা দিয়েছি। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* গ্রন্থে অন্য মত পোষণ করেছেন। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্ভবত আশুতোষ দাস সংগৃহীত পুঁথি নিয়ে কাজ করেননি সেই জন্য তাঁর নির্ণীত সময়কাল ভিন্ন এবং কালজ্ঞাপক শ্লোকও ভিন্ন-

ইন্দু বাণ ঋষি বেদ মণজিত(?)।

রচিলেক রামদেবে সারদা-চরিত।। (পৃ. ৪৩৯)

তিনি এও উল্লেখ করেছেন দ্বিজ রামদেব দ্বিজমাধব-কে অনুসরণ করে কাব্য রচনাকাল নির্দেশ করেছেন, সেটি হল-

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ শক নিয়োজিত।

রচিলেক রামদেব সারদা-চরিত।। (পৃ. ৪৩৯)

সেই ভিত্তিতে কবির কাব্যের রচনাকাল তিনি নির্দেশ করেছেন ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দ। সময়কাল কাছাকাছি থাকলেও কিছুটা পার্থক্য আছে।

তথ্যসূত্র

১. আশুতোষ দাস সম্পা. , *দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৪০৯।

২. তদেব, পৃ. ১৭।

৩. তদেব, পৃ. ১০৬।

৪. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ৪৩।

৫. মহেন্দ্রনাথ সরকার, *তন্ত্রের আলো* , নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৬-৭।

৬. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭।

৭. তদেব, পৃ. ১১৬।

৮. তদেব, পৃ. ১৮২।

৯. সুখময় ভট্টাচার্য, *তন্ত্রপরিচয়*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫২।

১০. আশুতোষ দাস সম্পা. , *দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল, ভূমিকা* , ঐ।

১১. আশুতোষ দাস সম্পা. , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

১২. আশুতোষ দাস সম্পা. , *দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল* , *ভূমিকা* , ঐ।

১৩. আশুতোষ দাস সম্পা. , পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৪. তদেব, পৃ. ১২৪।

১৫. তদেব, পৃ. ১২৫।

১৬. তদেব, পৃ. ২৩৬।

১৭. তদেব, পৃ. ৩১৯।

১৮. আশুতোষ দাস সম্পা. , *দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল* , *ভূমিকা* , ঐ।

ভবানীশঙ্কর দাস

কবি ভবানীশঙ্কর দাস *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কাব্যের নাম *মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা*। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত তিনিও তাঁর কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী এবং কালকেতু-ফুল্লরার ঘটনা ও ধনপতি-লহনার ঘটনা সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কবির কাব্যের পরিধি বড়, পাঁচালীর সহজ সুর কাব্যে ধ্বনিত হয়। অন্যান্য কবিদের মত তিনি তাঁর কাব্যের রচনাকাল উল্লেখ করেছেন-

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।

ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে।।[১]

কালের হিসাব অনুযায়ী কাব্যের রচনাকাল হয় ১৭০১ শক বা ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ। সময়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে বর্গী আক্রমণের মত ঘটনা, পলাশীর যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ, কোম্পানির দেওয়ানি লাভ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে; কবি ভারতচন্দ্র-র *অন্নদামঙ্গল* কাব্য লেখা হয়ে গেছে বহুদিন হয়েছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে কবি তাঁর রচনা সমাপ্ত করছেন কবির এই রচনার সূত্র ধরে জানা যায়। কবি তাঁর নিজের পরিচয় সবিস্তারে দিয়েছেন। কাব্যে লিখিত-

মোর আদি পুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম।

আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম।।

মহাভাগ্যবন্ত কা[য়]স্থ ছিলেন নরদাস।

রাঢ়া ভৌমে বাদখি প্রদেশেতে নিবাস।।

তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীয়মন্ত।

মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত।।

শ্রীযুত নয়ন রায় তাহান তনএ।

আহ্মার জনক জান সেই মহাশএ।।

কুলধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ।

শঙ্কর আত্মার নাম তাহান নন্দন।।[২]

কবির আত্মপরিচয় যা দিয়েছেন তার থেকে বোঝা যায় তাঁর পূর্বপুরুষ আত্রেয় গোত্রীয় এবং কুলীন কায়স্থ। কবির পিতার নাম শ্রীমন্ত। কাব্যে কবির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।দ্র.১ কবির কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কবি কাব্যের বিভিন্ন অংশে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের উপাদানকে কাজে লাগিয়েছেন। কাব্যের শুরুতেই কবি দেবী চণ্ডীকে বলেছেন-

প্রণমহো ত্রাহি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।

নরাধম দাস জ্ঞানে ত্রাহি মা তারিণি।।

পুনঃ পুনঃ প্রণমহো ত্রিজগতমাতা।[৩]

দেবী চণ্ডীকে এখানে কাব্যের শুরুতে 'দুর্গা' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি সারা বিশ্বকে ধারণ করে আছেন বলেই তিনি 'ত্রিজগতমাতা'। *দেবীমাহাত্ম্য* -এ উল্লেখিত-

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।

তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।।

দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং আবির্ভবতি সা যদা।

উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।।[৪]

বিশ্বমাতা চণ্ডী একাধারে পালনকর্তা অপরদিকে এই বিশ্বসংসারের যাবতীয় কার্যাবলির মূলীভূতা কারণ। সমালোচক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-র মতে-' বিশ্বমাতা চণ্ডিকা বা অম্বিকা ত্রিগুণময়ী মহাপ্রকৃতি,-সৃষ্টিরূপা-স্থিতিরূপা-ধ্বংসরূপা।'[৫] সেইজন্য কবি দেবী দুর্গাকে 'ত্রিজগতমাতা' সম্বোধনে সম্বোধিত করেছেন। আবার কবি কাব্যের পরবর্তী অংশে বলেছেন-

বন্দম নারায়ণী দেবী আদ্যাশক্তি।

জন্মে জন্মে তুয়া পদে রৌক মোর ভক্তি।।

করযোড়ে প্রণমহো দেবী দশভূজা।

ত্রিজগত-জীব সর্ব্বে জাহা করে পূজা।।[৬]

দেবী চণ্ডীকে কবি এখানে ‘নারায়ণী’দ্র.২ বলে উল্লেখ করেছেন। *শ্রীশ্রীচণ্ডী* গ্রন্থে উল্লেখিত-

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে।।

-অর্থাৎ ‘হে দেবি, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিণী (অর্থাৎ শৈবী, বৈষ্ণবী ও ব্রাহ্মী)। আপনি সনাতনী ও ত্রিগুণের আধারভূতা (নির্গুণা), অথচ ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।’[৭] কবি এই কথাই কাব্যের আকারে প্রকাশ করেছেন।

কাব্যে কবি শক্তিতত্ত্বের উপাদান নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। কাব্যে উল্লেখিত-

সত্ত্ব রজ তমে চিন্তা পাইল প্রচুর।।

তিন দেব চলি গেলা জথা আদ্যাশক্তি।

দেবীরে করএ স্তুতি মনে করি ভক্তি।।[৮]

বা

নমো নমো নারায়ণি নমো আদ্যা শক্তি।

জা হোন্তে জগতের জীব হইল উৎপত্তি।।

সত্ত্ব রজঃ তম ইন্দ্রে জাহা অৰ্চ্চা করে।

কার শক্তি আছে হেন পদ অর্চ্চি বারে।।[৯]

চণ্ডীতত্ত্বে উল্লেখিত-

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।

নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহস্তু।।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।

-অর্থাৎ 'দেবি, আপনি মেধারূপা, বাগ্দেবী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, দৈবশক্তি এবং ঈশ্বরী। আপনি প্রসন্না হউন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। দেবি, আপনি সর্বাত্মা [সর্ব-কার্য ও কারণরূপিণী], সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী ও দুর্জ্ঞেয়া।'[১০] কবি ভবানীশঙ্কর দাস এই বিষয়কেই সামনে আনতে চেয়েছেন। আবার কাব্যে উল্লেখিত-

রুদ্রাণী বামার্দ্ধ অঙ্গে শিরে তরঙ্গিণী গঙ্গে

আরোহণ বৃষের উপরে।[১১]

দেবীকে দেবাদিদেব শিব অর্দ্ধ অঙ্গে ধারণ করে আছেন। দেবী বা শক্তি ছাড়া সৃষ্টি অচল। সমালোচক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-র মতে-'...মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, পুরাণসাহিত্যে বিশ্বমাতা-দেবীকে তিনটি প্রধান স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে : (১) শিবযুক্তা ও শিবসোহাগিনী, (২) বেদের অর্ধনারীশ্বরের মতো অর্ধ-শিব ও অর্ধ-শক্তি-হরগৌরী, এবং (৩) ব্রহ্মরূপিণী,-সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা। এখানে দেবী মহাতত্ত্বময়ী-সর্বতত্ত্বের প্রত্যক্ষ-প্রতিমূর্তি।'[১২] কবি দেবীর নানা রূপের মধ্যে এই রূপকেই কাব্যে দেখাতে চেয়েছেন।

কোথাও কোথাও কবি সরাসরি কবি দেবীকে মূলাধার স্বরূপা বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যে বর্ণিত-

ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে ত্রাহি মাং তারিণি।

দুষ্কৃতির মূলাধার তুহ্মি সনাতনী।।[১৩]

পণ্ডিত ভাস্কর রায় *শ্রীশ্রীচণ্ডী*-র *গুপ্তবতী* টীকায় এবং *ললিতসহস্রনাম*-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন মূলাধারশায়িনী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই পরমস্বরূপিণী বিশ্বধাত্রী; তাঁর থেকেই জগৎ সংসারের শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। সেই অর্থে দেবী প্রকৃত অর্থেই মূলাধারবাসিনী। আবার কোথাও দেবী চণ্ডী কালিকার রূপ গ্রহণ করেছেন-

কুরুণাং কুরু কালি কমলিনী।

কালী কলাবতী কপালিনী সতী

কৈলাসবাসিনী কাত্যায়নী।।

কৃষ্ণা কালরাত্রি কালী জগদ্ধাত্রী

কাল ভৈরবের সীমন্তিনী।[১৪]

দেবী কালিকা আবার স্থানভেদে এখানে ভয়াল রূপ গ্রহণ করেছেন। কাব্যে বর্ণিত-

মহাভয়ঙ্করী বামা কজ্জলবরণী।

লোলজিহবা ত্রিনয়নী বিকটদশনী।।

চতুর্ভুজা গুরুতেজা হএ দিগম্বরী।

সাতে আসিয়াছে জথ বিবসনা নারী।।

বাম করে শোভে অসি মহাতীক্ষ্ণধার।[১৫]

বা

নম কালি চতুর্ভুজা কজ্জলবরণি।

নমো নম ত্রিনয়নি বিকটদশনি।।

নমো হরবক্ষ-আরোহিণি ত্রাহি কালি।

নমো তীক্ষ্ণাসিধারিণি নম মুণ্ডমালি।।

নমো নম ত্রাহি উমা দেবি আদ্যা শক্তি।[১৬]

দেবী চণ্ডীর সঙ্গে দেবী কালীর নৈতিক পার্থক্য থাকলেও স্বরূপগত দিক থেকে তাঁরা অভিন্না। চণ্ডীতত্ত্বে 'মহাকালীর ধ্যান' অংশে বিবৃত-

ওঁ খড়্গাং চক্রগদেষুচাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ

শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।

নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং

-অর্থাৎ 'যিনি দশ হস্তে খড়্গা, চক্র, গদা, তির, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শূল, ভুশুণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন; যিনি ত্রিনয়না, সর্ব প্রকার অঙ্গভূষণে সুশোভিতা এবং নীলকান্তমণিতুল্য প্রভাবিশিষ্টা; যাঁহার দশটি মুখ ও দশটি পদ;'[১৭] দেবীর চণ্ডীর সঙ্গে রূপগত পার্থক্য থাকলেও এঁরা শক্তিতত্ত্বের এক একটি অংশ। মূলগত শক্তিতে এক এবং অভিন্না।

কবি কাব্যে একটি নতুন বিষয় প্রতিপাদন করেছেন। কবি কাব্যে বলেছেন-

"রা" শব্দশ্চ উমাকার "ম" কারস্ত মহেশ্বর

শিবদুর্গাত্মক নাম জ্ঞান।

তারক ব্রহ্ম রাম নাম ধ্রুব বলিয়াছে বম

দুষ্কৃতি নিস্তারের কারণ।।[১৮]

কবি এখানে ‘উমা’ অর্থাৎ শক্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন অপরদিকে ‘মহেশ্বর’-এর নাম উল্লেখ করেছেন। উভয়ের সান্নিধ্যে জগতের মূল ক্রিয়া শক্তির বিষয় এখানে কবি দেখাতে চেয়েছেন। এখানে কবি ‘রাম’ নামকে ‘মহামন্ত্র’ নামে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন এটি ব্রহ্ম তুল্য। সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ব্রহ্ম ও শক্তিতত্ত্বের বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন- ‘ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ; এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না;’[১৯]

কবির কাব্যে কিছু কিছু অংশে তন্ত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন কিন্তু বিস্তারিতভাবে তার ব্যাখ্যা করেননি। তিনি যেমন উল্লেখ করেছেন-

বেদ-উক্ত বাক্য দ্বিজে কহিল সকল।

ভবানী অর্চ্চিল রাজা হৈয়া কুতূহল।।

তন্ত্র উক্তে গুরুবক্ত মন্ত্র জাপ করি।

চক্ষু মুদি রৈল রাজা আবিয়া ঈশ্বরী।।[২০]

বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গেলেও কবি কাব্যের সমগ্র অংশে পরোক্ষে বা কিছু অংশে প্রত্যক্ষত তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বর অবতারণা করেছেন। কাব্যের পরিধি অন্যান্য কবিদের থেকে বড় হলেও কবি কাহিনীর মধ্যে কোনো নতুনত্ব দেখাতে পারেননি। প্রচলিত ছকেই কাহিনীর বিবরণ দিয়ে গেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নামের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু কাহিনীর মূল কাঠামো একই আছে। প্রথমে কবি পুরাণের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছেন তারপরে কালকেতুর আখ্যান বিবৃত করেছেন।

দ্বিতীয় অংশে সওদাগর ধনপতির আখ্যান ব্যক্ত করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। কাব্যে কাহিনীর নিরিখে তন্ত্রের উপাদান যেমন আছে তেমনি সামাজিক কিছু আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়। সেকালের সমাজের দিকে নজর রাখলে যে যে

দিকগুলি উঠে এসেছে সেইগুলি সব কাব্যেই সাধারণ ঘটনা রূপে বিবেচিত। কবির কাব্যে কবি তার থেকে আলাদা করে কিছু অভিনবত্ব দেখাতে পারেননি। তাই কবির কাব্য কিছুটা সেকেলে হয়ে পড়েছে।

প্রচলিত কাহিনীর মতোই এখানে খুল্লনাকে ছাগ চড়ানোর কাজ করতে হয়েছে। সংসারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাড়ির কর্তা নিতেন; সেটা যদি অন্যথা হত তাহলে সমাজে তার ঠাঁই হওয়া দুষ্কর হত। কাব্যে উল্লেখিত-

এক পত্র লেখি সদাগরের লিখন।

জেই মতে খুল্লনা ছাগল রাখে বন।।

এই মতে খুল্লনারে দেয় তুক্ষি কষ্ট।

ত্যগিবেক সদাগরে হৈলে জাতিভ্রষ্ট।।[২১]

এই একই জিনিস কাব্যের অন্যত্র ঘটেছে। শ্রীমন্তর বিদ্যাশিক্ষা লাভের সময় গুরু জনার্দ্দনের থেকে অপমান বাক্য শুনতে হয়েছিল পিতৃপরিচয় বলতে না পারার জন্য-

শ্রীয়মন্ত বোলে অম্বে ব্যর্থ কর মায়া।

অপমান পাইছি গুরু ত্যগিবাম কায়া।।

জারজ বলিছে মোরে গুরু জনার্দ্দন।[২২]

মেয়েদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হত পতি পরমেশ্বরের তত্ত্ব। পতি বিনা তারা সমাজে অচল। তাই কবি কাব্যে বলেছেন-

যদি স্বামী জাএ ছারি

রহিবারে নহি পারি

স্বামী জান নারীর দেবতা।

জেই নারী হএ সতী

প্রাণী তুল্য জানে পতি

স্বামী সম না হএ বিধাতা।।[২৩]

তার উপর ছিল স্বামীর একাধিক বিবাহ; সংসারে কলহের মূল কারণ। পুরুষের একাধিক বিবাহ নিয়ে কাব্যে নারীর খেদ প্রকাশিত হয়েছে-

বলি মোরে প্রিয়বাণী

উজানী রাজ্যেতে আনি

বধ করিবারে চাহ কেনে।।

জয়া বর রূপবতী

নিজ রাজ্যে আছে স্থিতি

তবে কেহ্নে বিবাহ কৈলা মোরে

প্রাণী স্থির নহে অঙ্গে

দারুণী সপত্নী সঙ্গে

কি রূপে বঞ্চিব আহ্মি ঘরে।।[২৪]

কিন্তু পুরুষের যুক্তির থেকে অনেক বেশি ছুতো ছিল নারীদের প্রতি। যত নারীদের উপর পুরুষ অধিকার স্থাপন করবে তত তার কৃতিত্ব বাড়বে সমাজে। সমাজের মানদণ্ড হল পুরুষের কাছে নারীর বশ্যতা স্বীকার-

স্বামীকে করিয় ভক্তি হৈয়া একচিত্ত।

স্বামিবাক্য-বশেতে থাকিয় নিত্য নিত্য।।[২৫]

পত্নী পতির কাছে ধর্মপত্নী হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কামনা-বাসনার সঙ্গী হিসাবেই বিবেচিত হত। পুরুষের বহুবিবাহ এজন্য সেকালে সমাজের চোখে অভিশাপ রূপেই গণ্য হত। শ্রীমন্তর মুখে কবি ‘ধর্ম্মপত্নী কামপত্নী না হয়ে সমান ’[২৬] বললেও একথা কতটা সমাজের পুরুষেরা পালন করত তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ *আছে।*

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কবি ভবানীশঙ্কর দাস তাঁর কাব্য লিখলেও কাব্যের মধ্যে কোনো বিষয়বস্তু বা নব্য রীতির চিন্তা চেতনা তিনি তুলে আনতে পারেননি, অন্যান্য কবিদের কাব্যের মত সাধারণ মানের কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য-র মতে-‘... সম্ভবত দ্বিজ মাধবের কাব্য হইতে তিনি কাহিনীর মূল অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।’[২৭] সেক্ষেত্রে কবির কাব্য কিছুটা গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। সমসাময়িক বা তার পূর্ববর্তী অনেক

কবি থাকলেও তাদের প্রভাব থেকে কবি অনেকাংশে মুক্ত ছিলেন তাই সেক্ষেত্রে কবি নিজের সৃজনশীলতা কাব্যে দেখাতে চাইলেও কাব্যের মান অনুযায়ী কবির কবিত্ব ততটা প্রকাশ পায়নি।

দ্রষ্টব্য

১. কবি ভবানীশঙ্কর দাস কাব্যে বিস্তারিত ভাবে তাঁর আবির্ভাবকাল, পরিবার পরিজনের নাম ব্যক্ত করেছেন। এখানে প্রয়োজনের নিরিখে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল। কাব্যে পৃষ্ঠা ১১-১২ তে কবির আত্মপরিচয় লক্ষণীয়।

২. *শ্রীশ্রীচণ্ডী* গ্রন্থে 'নারায়ণী' সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।।

-অর্থাৎ 'হে দেবি, আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তি (বিষ্ণুর জগৎপালিনী শক্তি)। আপনি সমগ্র জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন। আবার আপনিই প্রসন্না হইলে ইহলোকে [শরণাগত ভক্তের] মুক্তির কারণ হইয়া থাকেন। (পৃ. ২৪৭)

কবি দেবী চণ্ডীর সঙ্গে স্বরূপগত দিক থেকে অভিন্ন বোঝাতে দেবী 'নারায়ণী' বলে সম্বোধন করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. রাজচন্দ্র দত্ত সম্পা. , *ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩, পৃ. ৩।

২. তদেব, পৃ. ১১।

৩. তদেব, পৃ. ১।

৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, জুলাই ২০১৮, পৃ. ৮৯।

৫. তদেব, পৃ. ৮৯।

৬. রাজচন্দ্র দত্ত সম্পা. , ঐ, পৃ. ১০।

৭. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী* , উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ২৫০।

৮. রাজচন্দ্র দত্ত সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৩।

৯. তদেব, পৃ. ৩১।

১০. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী*, ঐ, পৃ. ২৫৪।

১১. রাজচন্দ্র দত্ত সম্পা. , ঐ, পৃ. ৯।

১২. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, জুলাই ২০১৮, পৃ. ১০৩।

১৩. রাজচন্দ্র দত্ত সম্পা. , ঐ, পৃ. ৮৯।

১৪. তদেব, পৃ. ১১৪।

১৫. তদেব, পৃ. ১৫৫।

১৬. তদেব, পৃ. ৪৯।

১৭. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী*, ঐ, পৃ. ৪৬।

১৮. রাজচন্দ্র দত্ত সম্পা. , ঐ, পৃ. ৩৫।

১৯. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা*, ডি.এম, লাইব্রেরি, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪২০, পৃ. ৯১।

২০. রাজচন্দ্র দত্ত সম্পা. , ঐ, পৃ. ৩১।

২১. তদেব, পৃ. ৭৬।

২২. তদেব, পৃ. ১২১।

২৩. তদেব, পৃ. ১৬৩।

২৪. তদেব, পৃ. ১৭০।

২৫. তদেব, পৃ. ১৭৪।

২৬. তদেব, পৃ. ১৭৪।

২৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগ, কলিকাতা, মে ২০১৫, পৃ. ৪৬৪।

মুকুন্দ চক্রবর্তী

বাংলা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারায় কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী অতি পরিচিত নাম। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার মধ্যে যতজন কবির নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে সমালোচকরা কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীকে শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা দিয়ে থাকেন। কবির কাব্যের রচনাকাল নিয়ে সমালোচক মহলে যথেষ্ট দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে, অনেকে মনে করেন কবির কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী কবির যে রচনাকাল পাওয়া যায় সেটি সঠিক নয়, অনেকে কবির কাব্যের সম্ভাব্য রচনাকাল নির্ণয় করেছেন সপ্তদশ শতাব্দী।$_{দ্র.১}$ কবির কালজ্ঞাপক শ্লোকটি হল-

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা : কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ।

অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ । আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ।।[১]

কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী কবির কাব্যের রচনাকাল দাঁড়ায় ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। সমালোচক সুকুমার সেন কবির কাব্য রচনাকাল ব্যাপারটি খুব সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন- '...অষ্টমঙ্গলা পদটির ভণিতার শেষ ছত্রের শেষে এই তারিখটি আছে-'অমর সাগর মুনিবরে।' এই কবি শকাব্দটি ভাঙলে হয় চৌদ্দশ সাতাত্তর শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

কোন সালে মুকুন্দ দেশত্যাগ করেছিলেন তার উল্লেখ পেয়েছি মুকুন্দের কাব্যের প্রথম ছাপা বইটিতে। সেটি এই- 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা, কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা ।' মুকুন্দ আরড়ায় পৌঁছবার কিছু আগে পথিমধ্যে দিবাস্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়েছিলেন কাব্য রচনার। এই দুই ছত্রে সেই দিনেরই উল্লেখ। এখানে শকাব্দ ভাঙলে হয় ১৪৬৬ অর্থাৎ ১৫৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দ।'[২]

কবির কালজ্ঞাপক শ্লোকের উপর নির্ভর করেই সমালোচক সুকুমার সেন কবির সময়কাল গণনা করেছেন। অপরদিকে সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় কবির কালজ্ঞাপক শ্লোক এবং সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদানকে ভিত্তি করে কবির কাব্যের সম্ভাব্য রচনাকাল জানিয়েছেন ১৫৯৪ থেকে ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে।$_{দ্র.২}$ আমরা সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মতামতকেই নির্ভরযোগ্য মনে করছি।

এবার কবির কাব্যের দিকে লক্ষ করা যাক। কবি কাব্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন- আখেটী খণ্ড বা কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী এবং বণিক খণ্ড ধনপতি সওদাগরের কাহিনী। দুটি কাহিনীকেই আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে আনব। প্রথমে আমরা আখেটী খণ্ডের কাহিনীর আখ্যানে দৃষ্টিপাত করব।

আখেটী খণ্ড

এই খণ্ডে কবি কাহিনীর আখ্যানে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে কালকেতু-ফুল্লরার লৌকিক কাহিনীর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। কাহিনীর আখ্যানে কবি 'প্রার্থনা' অংশে দেবীর বন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন-

তুমি রমা তুমি বাণী: যোগনিদ্রা নারায়ণী : গিরি-কন্যা ঈশান-গৃহিণী।

আগম-নিগম-তন্ত্র : বীজরূপা নানা-মন্ত্র : বেদমাতা বিশ্বের জননী ।।

যোগময়ী জোগত্রাণী : শক্তিভূতা সনাতনী : ত্রৈবিদ্যা অনাদি বাসনা।

মহাযোগে কালরাত্রি : গায়ত্রী ভুবনধাত্রী : শক্তিরূপা সংসার-বাসনা ।।[৩]

দেবীকে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী অন্যান্য দেবীর সঙ্গে অভিন্না করে তুলেছেন এবং দেবী চণ্ডীকে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জননী অর্থাৎ জগজ্জননী রূপে এখানে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে শক্তিতত্ত্বের মূল বিষয়কেও কবি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন।

দেবী চণ্ডীর নামের একটি তাৎপর্য ভাস্কর রায় দীক্ষিত তাঁর *গুপ্তবতী* টীকাতে উল্লেখ করেছেন। সমালোচক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সেই বিষয়টি প্রতিপাদন করেছেন-'চণ্ড=চণ্ড+(স্ত্রীলিঙ্গে) ঈপ্= পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছন্ন পরব্রহ্ম। 'চণ্ডভানু', 'চণ্ডবাদ' ইত্যাদি পদে 'চণ্ড' শব্দটি ইয়ত্তা বা সীমা দ্বারা অপরিচ্ছন্ন অসাধারণ গুণশালিত্ব-অর্থে সূচিত হইয়াছে। ধর্ম, ধর্মী, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন হইলেও ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী।'[৪] দেবীর এই বিষয়ই এখানে প্রতিভাত হয়েছে। দেবীই সমস্ত সংসারের মূল নিয়ন্তা। দেবী হতেই সব কিছুর উৎপত্তি। ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন জগৎ অন্ধকার, দেবীই সেই অন্ধকার দূর করে বিশ্বকে আলোর দিশা দেখান। দেবী হতেই এই পৃথিবীর সূচনা এবং দেবীর লীলার বিকাশে মায়াময় জগতের বিকাশ।দ্র.৩

কবি 'প্রার্থনা' অংশে আবার বলেছেন-

যে জানে তোমার তত্ত্ব : তুমি রজ-তম-সত্ত্ব : বেদমাতা সাবিত্রী রূপিণী।

তুমি আদ্যা মহামায়া : শঙ্করী শঙ্করকায়া : আমি নর কি বলিতে জানি ।।[৫]

দেবীভাগবত-এ উল্লেখিত-

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাহবিকৃতা শিবা।

যোগগম্যাহখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা।।

তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা।

মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।।

-অর্থাৎ 'যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও শিবা (মঙ্গলরূপিণী) এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বধারা ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা, তাঁহার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।'[৬] জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া-ই তিন শক্তির সমন্বিত রূপ দেবী চণ্ডী। দেবী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিধাত্রী।দ্র.৪ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী দেবীর এই রূপকেই কাব্যে তুলে ধরেছেন 'কালকেতুর প্রার্থনা' অংশে –

তুমি সত্ত্ব তুমি রজ তুমি তমোগুণ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি তিন জন।।

তুমি সিদ্ধি ধৃতি লক্ষ্মী বিদ্যা লজ্জাবতী।

সন্ধ্যা রাত্রি প্রভা নিদ্রা আদ্যা বসুমতী।।[৭]

কবি দেবী চণ্ডীকে 'মহামায়া'র সঙ্গে তুলনা করে বারংবার একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে অভিন্না করে তুলেছেন-

দেবী চণ্ডী মহামায়া : দিলেন চরণ-ছায়া : আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত ।[৮]

বা

আদ্যাশক্তি মহামায়া : পরম বিষ্ণুর ছায়া : দক্ষের দুহিতা আমি সতী ।[৯]

দেবী চণ্ডীই যে মহামায়ার সঙ্গে অভিন্ন এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে এর সাদৃশ্য মেলে। এই মহামায়া 'নিত্যচৈতন্যরূপিণী'[১০]। সমালোচক স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন-'... শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা হয়েছে-

"দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।

উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।" (১|৬৫-৬৬)

দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য দেবী নিজেকে প্রকাশ করেন এবং সেই প্রকাশকেই লোকে নতুন রূপে উৎপন্ন বা সৃষ্টি ব'লে মনে করে। এ'জন্য দেবী একদিকে যেমন মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি ও 'মহামোহ' নামে পরিচিতা, অপরদিকে তেমনি কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি নামে সুবিদিতা।'[১১]

কবি দেবী চণ্ডীকে নানা রূপে উপস্থাপন করেছেন। 'কলিঙ্গরাজের প্রতি স্বপ্নাদেশ' অংশে দেবীর অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন কবি ; দেবীর নানা রূপের সঙ্গে এখানে কোনো তফাৎ নেই। শক্তিতত্ত্ব অনুযায়ী দেবীর প্রকাশ এক, রূপ অনেক। সেই বিষয়কেই কবি কাব্যে তুলে ধরেছেন। 'কালকেতু কর্ত্তৃক ভগবতী স্তব' অংশে ফুটে উঠেছে সেই একই বিষয়-

আদ্যা সনাতনী : শম্ভুর ঘরণী : শক্তিরূপা তিন দেবে।

শঙ্খিনী শূলিনী : কপালমালিনী : তিন লোকে তোমা সেবে।।[১২]

'দেবীর শতনাম কথন' অংশে দেবীর নানা রূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সমালোচক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর গ্রন্থে দেবীর নানা নামের তালিকা দিয়েছেন।দ্র.৫ সেখানে দেখলে দেখা যাবে রূপের প্রকাশ অনেক হলেও মূলে শক্তিতত্ত্বের প্রধান সূত্র নিহিত। জগতের চালিকা শক্তি সেই পরমা প্রকৃতি।

কবি দেবীকে 'দেবীর শতনাম কথন' অংশের শুরুতেই 'আদ্যাশক্তি মহামায়া'[১৩] নামে অভিহিত করেছেন। তন্ত্রে আদ্যাশক্তি জগতের সর্বত্র সমাহিত। প্রতি বস্তু থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যে তিনি বিরাজ করেন। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে 'আদ্যাশক্তি' সম্বন্ধে *মহাকালসংহিতা*-র মতকে উদ্ধৃত করে বলেছেন- '...দেবি ! তুমি অচিন্ত্যা, অমিতাকারা অর্থাৎ তোমার পরিমাপ করা যায় না, তুমি শক্তিস্বরূপিণী, প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তুর তুমি অধিষ্ঠান সত্তা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তু তোমাতেই অধিষ্ঠিত। তুমি গুণাতীতা, দ্বন্দ্বাতীতা, অদ্বিতীয়া, পরমব্রহ্মস্বরূপিণী।'[১৪] দেবীর এই রূপকেই কাব্যে অধিষ্ঠিত করেছেন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। 'কালকেতুর প্রার্থনা' অংশে কবি উল্লেখ করেছেন এভাবে-

তুমি ক্ষুধা ক্ষেমা সর্ব্বরূপা সর্ব্বভূতে।[১৫]

'কালকেতু কর্ত্তৃক চৌতিশা স্তুতি' অংশে তন্ত্রোক্ত একটি বিষয় উঠে এসেছে-

ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রৈলোক্য-তারিণী।

ত্রিশক্তিরূপিণী তুমি কুরঙ্গ-নয়নী।।[১৬]

দেবী যে সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্ত্রী শক্তি তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে।।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।

-অর্থাৎ 'হে দেবি, আপনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, আপনিই ইহা পালন করেন এবং সর্বদা প্রলয়কালে আপনিই ইহা সংহার করেন।

হে জগৎস্বরূপা, আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, পালনকালে স্থিতিশক্তিরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপা।'[১৭] কবি এইজন্য দেবীকে 'ত্রিশক্তিরূপিণী', 'ত্রৈলোক্য-তারিণী' বলে উল্লেখ করেছেন। তাই কিছুক্ষেত্রে দেবী চণ্ডী দেবী দুর্গার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কারণ দেবী দুর্গাও ত্রিশক্তির অধিকারিণী-

মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা।

অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট যে নায়িকা।।

সিংহ-পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ।

মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ।।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে চৌতিশার বিষয়টি পুরোপুরি তন্ত্রানুসারী। *কামধেনুতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

অকারাদি ক্ষ-কারান্তং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।।

সর্ব চরাচরাং বিশ্বং বর্ণাত্তু জায়তে ধ্রুবম্।[১৯]

তন্ত্রানুযায়ী অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত সব বর্ণই পরমাকুণ্ডলী আদ্যাশক্তির বহিঃপ্রকাশ, এই বর্ণগুলি থেকে সমস্ত জগৎ সংসারের উৎপত্তি; অনেক ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ উভয়ই এই বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

তন্ত্রের পাশাপাশি কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি, সংস্কারকে কাব্যে তুলে ধরেছেন। তখনকার দিনে মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল না, কম বয়সে বিবাহ দিতে হত। সবসময় মনোমত পাত্র পাওয়া যেত না, সমাজের চাপে অধিক বয়স্ক পাত্রের সাথে ইচ্ছা না থাকলেও মেয়ের পরিবারকে বিবাহে রাজি হতে হত-

হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ্।

বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্যা করে বধ।।

বর দেখি এয়ো সব করে কানাকানি।

চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি।।

পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর।

দেখিয়া মেনকা দেবীর জ্বলিছে অন্তর।।[২০]

এর পাশাপাশি আছে সতীন যন্ত্রণা। সেই সময় বেশিরভাগ পরিবারে এটি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ছবি। কিছু করার ছিল না মেয়েদের; বাড়ির ছোট নববধূকে বড় বউ এর অত্যাচার সহ্য করতে হত। এছাড়া কোন্দল, ঝগড়া এ তো লেগেই থাকত-

একে সতীনের জ্বালা : কত সহে অবলা : পরিতাপে হয়্যা গেনু কালী।।

সতীনের সম্মান : দেখি বাড়ে অভিমান : লোক-লাজে নাহি মেলি আঁখি।

দেখিয়া দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা পিতৃকুলে হইলাম বিমুখী।।[২১]

অনেক সময় বাধ্য হয়ে বাড়ির জামাইকে মেয়ের পরিবার কিছুটা মেয়ের মুখ চেয়ে শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় দিত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুলীন পাত্রের জন্য অকর্ম্মণ্য পাত্রের সাথে মেয়েদের বিবাহ হত; শিবের ভিক্ষাবৃত্তি দেখানো কবির মূল উদ্দেশ্য না, কবির লক্ষ্য ছিল দাম্পত্য জীবনের অসামঞ্জস্য রূপকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা। কবি এই বিষয়কে দেবতাদের কাহিনীর আড়ালে ব্যক্ত করেছেন-

রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।

ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।।[২২]

তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল পুরুষদের পরনারী আসক্তি। ঘরের গৃহিণী কি অবস্থায় থাকলো সেটা দেখার থেকে ব্যক্তিগত আনন্দ পুরুষ সমাজের কাছে অধিক আগ্রহের বিষয় ছিল। স্বয়ং দেবতারা এই পরিধির বাইরে ছিলেন না। মহাদেব ভিক্ষা সংগ্রহে কুচনীর বাড়ি গেলে ভুলে যান তিনি বিবাহিত-

একেত কোঁচের মেয়্যা : হরের বারতা পেয়্যা : ভিক্ষা দিতে আইল তখন।

পুরাতন দেখি হরে : কাঁচলী অসম্বরে : কুচযুগে না দেই বসন।

দশ পাঁচ সখী মেলি : শিবের বসন ধরি : কেহ বা টানয়ে পরিহাসে।

বসি কুঁচনীর পাশে : শিব নিরানন্দ ভাসে : যুবতী বুঢ়ারে নাঞি বাসে।।[২৩]

স্বামীর এই বঞ্চনা থেকেই তৈরি হয় নারীমনে আক্ষেপ। কাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে নারীদের সেই হতাশাকেই তুলে ধরেছেন কবি। এই হতাশা কোনোদিন মিটবে না, বরঞ্চ সময়ের সঙ্গে তা বেড়েই চলবে। কাব্যে বর্ণিত-

অন্ধমুনির মত মোর গেল সর্ব্বকাল।

জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাছে বিড়াল।।

আর যুবতী বলে সখি মোর পতি কালা।

আনের হইল্য ঘরকন্না মোরে হইল্য জ্বালা।।

দিনে ঠারে ঠোরে কহি কথা পতির সনে।

রাত্রি হইলে নিদ্রা যাই গরুড় শয়নে।।[২৪]

সারা অংশ জুড়ে আছে নারীদের প্রতি অবহেলা, তাদের জীবনের প্রতি সমাজের ক্রূর দৃষ্টি। সমালোচক স্মৃতিকণা চক্রবর্তী-র মতে-'...মেয়েরা স্বপ্ন দেখে আগামীর, সেই স্বপ্নে বাসা বাঁধে তার প্রার্থিত পুরুষ। মধ্যযুগে সেই স্বপ্নের মাথায় বাড়ি মেরে তাদের যুতে দেওয়া হত যেমন তেমন পাত্রের সঙ্গে। পাত্র আধার, সে ধারণ করবে। তার আবার ভালোমন্দ কী ! সুতরাং সুন্দরী যুবতীর কপালে কখনও লেখা থাকত গোদাপতি, কখনও অন্ধ, কখনও খোঁড়া, কখনও কালা, কখনও বা বর্জিত দশন বৃদ্ধ, কখনও বা কুব্জ। 'গৌরীর বর দেখে তাদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ভিতরে ভিতরে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অস্থির করে তুলেছে, বাস্তবে যা কোনোওদিন চরিতার্থ হবার নয়।'[২৫]

এ সত্ত্বেও নারীরা তাদের দায়িত্ব পালনে কখনোই পিছপা হয়নি। কালকতু যখন শিকার পায় না তখন সংসার চালানোর জন্য আসরে নামতে হয় ফুল্লরাকে। এমনকি যখন দেবী চণ্ডী বলেন-

আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজগুণে।।[২৬]

তখন ফুল্লরা নিজ অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। স্বামী যতই খারাপ হোক তার ভালো-মন্দের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর; সমাজের এই বাধ্য-বাধকতা অনুযায়ী মেয়েরা জীবন-যাপন করত। দেবী চণ্ডী স্বামীর প্রতি বিদ্রূপ মন্তব্য করলে ফুল্লরা নানা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন স্বামীর উপর একটি মেয়ের দায়িত্ব কতখানি। 'চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ' অংশে ফুল্লরার বক্তব্য দেবীর প্রতি-

স্বামী বনিতার পতি : স্বামী বনিতার গতি : স্বামী বনিতার সে বিধাতা।

স্বামী যে পরমধন : স্বামী বিনে অন্য জন : কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা।।[২৭]

মেয়েদের এই ভূমিকা সারাজীবন ধরে গভীর সহানুভূতির সুরে কাব্যে বর্ণনা করেছেন। সমাজের না পাওয়া গুলোকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা এইভাবে তাঁরা তাদের কাব্যে বুনন করে রেখেছেন। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী যে অস্থির সময়ে কাব্য রচনা করেছেন তার বিবরণ তিনি 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশে বিবৃত করেছেন তার পাশাপাশি নিজেও শাসকের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কীভাবে জীবনধারণ করেছেন তার উল্লেখও তিনি করেছেন। সাধারণ মানুষ কীভাবে দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয়েছে তার পরোক্ষ রূপ 'পশুগণের ক্রন্দন' অংশে তুলে ধরেছেন। তার পাশাপাশি এটিও দেখিয়েছেন পশুদের অভাব, অভিযোগ শোনার জন্য দেবী চণ্ডী আছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের অভাব, অভিযোগ শোনার জন্য কেউ নেই।

এছাড়াও কাব্যে কবি ভাঁড়ু দত্ত এবং মুরারি শীল-এর মত টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যা এই কাব্যে চিরকালীন সম্পদ রূপে বিবেচিত। গুজরাট নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সব ধরনের মানুষ সেখানে স্থান পেয়েছে। ধর্ম বা ধনী-দরিদ্র বৈষম্য সেখানে বিবেচিত হয়নি। কবি নিজে ডিহিদার, পোদ্দারের অন্যায়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে তাঁর কাব্যে গুজরাট নগরের প্রজাদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন-

আমার নগরে বৈস : যত ইচ্ছা চাষ চষ : তিন সন বহি দিহ কর।

হাল প্রতি দিবে তঙ্কা : কারে না করিহ শঙ্কা : পাট্টায় নিশান মোর ধর।।

নাহিক বাউড়ি দেড়ি : রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি : ডিহিদার নাহি দিব দেশে।[২৮]

তাছাড়া কবি নিজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, সমাজের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সব তাদের হাতে; তাই সেক্ষেত্রে তিনি তাদের আলাদাভাবে নগরে স্থান দিয়েছেন-

যত বৈস দ্বিজবর তার নাহি নিব কর

চাষ ভূমি বাড়ি দিব দান।

হইয়া ব্রাহ্মণের দাস পূর্বের সভার দাস

জনে জনে সাধিব সম্মান।।[২৯]

সমালোচক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য এই বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন-'...কেননা, অন্যান্য জাতির তুলনায় রাজ্যে ব্রাহ্মণ প্রজার অবস্থিতি তার মর্যাদা বাড়াবে। তাই সে শুধু ব্রাহ্মণদের বিনা খাজনায় বাসের জমি দিতেই আগ্রহী নয়, তাদের

নিষ্কর চাষের জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়, কেননা ব্রাহ্মণ প্রজা না বসালে রাজা বা তার রাজত্ব কোনোটাই সমাজে মূল্য পাবে না'[৩০] ; কালকেতু যে রাজ্য নির্মাণ করছে সেখানে সমাজের উচ্চবর্গ যদি অনুমোদন না দেয় তাহলে কোনো স্বীকৃতির মূল্য নেই, তাই এটি এক ধরণের আপোষ। সমাজের নীচু তলার মানুষের সঙ্গে উচ্চবর্গের এক ধরনের বোঝাপড়া। এই মীমাংসা বা সমঝোতা শুধু মানুষের মধ্যেই নয় দেবতাদের মধ্যেও ছিল। তারই কাহিনী কবি শুনিয়েছেন বণিক খণ্ডে।

বণিক খণ্ড

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী বণিক খণ্ডে শুনিয়েছেন ধনপতি সদাগরের কাহিনী। প্রথম খণ্ডে মূলত কবি পৌরাণিক আখ্যানের আশ্রয়ে লৌকিক কাহিনীকে উপজীব্য করেছিলেন। কালকেতুর পূজা দেবী লাভ করলেও সমাজে স্বীকৃতি লাভ তাঁর এখনো বাকি। সমাজের রাশ ধনী শ্রেণির হাতে, যতক্ষণ না তাদের পূজা দেবী পাচ্ছেন ততক্ষণ দেবীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। দেবীর স্বীকৃতি সব স্তরেই প্রয়োজন। কালকেতু দেবীর অর্চনা করেছে, দেবীও তাঁর প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিয়ে তাকে রাজা পদে অধিষ্ঠিত করেছে; তাতে দেবীর একটি শ্রেণির উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। সেই সময়ে সমাজের অর্থ কৌলিন্যের দাবি ছিল বণিক শ্রেণির হাতে, তাই দেবীর প্রয়োজন তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি। কবি মুকুন্দ সেই কারণে এই কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডে কবি দেবী চণ্ডীর নানা রূপ তুলে ধরেছেন। 'খুল্লনার চণ্ডী-ধ্যান' অংশে বর্ণিত-

বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী : সমরবিজয়ী লক্ষ্মী : অনন্তরূপিণী রাজরিশী।

ভাবে তুয়া শুদ্ধমতি : সেই জন মহাসতি : রাখ সতিজন অবতংসি।।[৩১]

আবার 'খুল্লনার চণ্ডিকা-স্তুতি' অংশে বলেছেন-

আদ্যা সনাতনী : শাম্ভবী ব্রাহ্মণী : শক্তিরূপা তিন দেবে।

শঙ্খিনী শূলিনী : কপালমালিনী : তিন লোকে তোমা সেবে।।

ধাত্রি শাকম্ভরী : গৌরী দিগম্বরী : জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।

তুমি ভদ্রকালী : সেবে পুণ্যশালী : হরতনু-হেমমালা।।[৩২]

এখানে দেবী চণ্ডীকে কালীর সঙ্গে অভিন্না করে দেখা হয়েছে। অপরদিকে 'শ্রীমন্তের চণ্ডিকাস্তব', 'সিংহল-রাজের চণ্ডীস্তব' অংশেও দেবীকে কালীর সঙ্গে অভিন্না করে দেখানো হয়েছে-

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।

দুর্জয় দক্ষিণাকালী নন্দের নন্দিনী।।

নানা অবতারে তুমি বিষ্ণুসহায়িনী।

দুরিতনাশিনী জয়া দুর্গতিনাশিনী।।[৩৩]

দেবী চণ্ডীকে যে কালিকার সঙ্গে অভিন্না করে তোলা হয়েছে তার পিছনে গূঢ় কারণ বিদ্যমান। সমালোচক উপেন্দ্রনাথ দাস 'কালিকা' শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-'...কালিকা শব্দের বর্ণবিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় ক্+আ+ল্+ই+ক্+আ। ক ব্রহ্ম, আ অনন্ত, ল বিশ্বাত্মা, ই সূক্ষ্মা। কাজেই দাঁড়াল কালিকা ব্রহ্ম, অনন্ত, বিশ্বাত্মা, সূক্ষ্মা।'[৩৪] দেবী চণ্ডীর ক্ষেত্রে এই সব কটি গুণই প্রযোজ্য। চণ্ডীতত্ত্বে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়-

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।

-অর্থাৎ 'তিনি [সংসার] মুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং [ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি] সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।'[৩৫] এছাড়া দেবীকে 'বিষ্ণুসহায়িনী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী চণ্ডী জগৎকে চালনা করেন, তাই সমগ্র বিশ্বকে সেই শক্তি দিয়ে তিনি একসূত্রে আবদ্ধ রেখেছেন-

মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।।

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।

মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

-অর্থাৎ 'তথাপি সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়।

এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা (তমঃপ্রধানা শক্তি)। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।'[৩৬] শক্তিতত্ত্বের এই বিষয়টি কবি খুব সুন্দরভাবে এখানে এইভাবে তুলে ধরেছেন।

কাব্যে আরো কিছু ক্ষেত্রে তন্ত্রের বিষয় উঠে এসেছে। 'শ্রীমন্ত কর্তৃক চণ্ডীস্মরণ' অংশে উল্লেখিত-

পুনু স্নানে সদাগর-অঙ্গে হইল জ্যোতি।

বিষ্ণু স্মঙরণে শুচি হইল শ্রীপতি।।

ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীরশোধন।

দুর্ব্বাক্ষত শিরে মুখে মন্ত্র স্মঙরণ।।[৩৭]

কাব্যের এই অংশে 'ভূতশুদ্ধি', 'অঙ্গন্যাস' এই বিষয়গুলি উঠে এসেছে। পূজার আগে দেহকে পরিপূর্ণভাবে দেহ শোধন তন্ত্রোক্ত মতে সিদ্ধ। ভূতশুদ্ধি তান্ত্রিক উপাসনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য 'ভূতশুদ্ধি' বিষয়ে তন্ত্রোক্ত নানা প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। *কুলার্ণবতন্ত্র*-থেকে মত উল্লেখ করেছেন-

আত্মা তু ভূতসংশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে।

ষড়াঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈর্দেহশুদ্ধিরিহোদিতা।

দেহশুদ্ধিং বিধায়েত্থং ততো বৈ স্থাপয়েদসূন্।।

-'ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আবরক মলের অপসৃতি ঘটে। করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রভৃতি দেহশুদ্ধির হেতু। দেহশুদ্ধির পরে সাধক নিজের অভিনব বিশুদ্ধ প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।'[৩৮] আলোচ্য অংশে সেই ধারাই দেখা যায়, শ্রীপতি স্নান সেরে দেহশুদ্ধির জন্যই এই প্রক্রিয়াগুলি করেছে তারপর পুজোয় নিয়োজিত হয়েছে।

কাব্যের অন্যান্য অংশের মধ্যে এসেছে আরো তন্ত্রের অনুষঙ্গ। তার মধ্যে একটি বিষয় হল 'কমলে-কামিনী' প্রসঙ্গ। বিষয়টি হল এইরকম-

পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিআ অভয়া।

শ্রীপতিরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া।।

আপনি করিল মায়া হরের বনিতা।

চৌষট্টী যোগিনী হৈল কমলের পাতা।।

অমল কমল হইলা পদ্মা করিবর।

হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর।।[৩৯]

যোগিনী-দের বর্ণনা প্রসঙ্গে সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 'এঁরা দুর্গার সহায় সখী বা অনুচরী। দেবীকে নানা ভাবে এঁরা সাহায্য করেন। দুর্গা পূজার সময় এঁদেরও পূজা করা হয়।'[৪০] কবি এঁদের বিবরণ কিছুটা দিয়েছেন-

কনককমল-রুচী : স্বাহা স্বধা কিবা শচী : মদনমঞ্জরী কলাবতী।

সরস্বতী কিবা রমা : চিত্রলেখা তিলোত্তমা : সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী।।[৪১]

'স্বাহা', 'স্বধা'-র নাম *কালিকাপুরাণ* [৪২]-এ পাওয়া যায়। এছাড়াও 'মাতৃকাগণের যুদ্ধ(১)', 'মাতৃকাগণের যুদ্ধ(২)' অংশে যোগিনীদের নাম পাওয়া যায়-

বরাহী খেটকধরা ঘর্ঘরনাদিনী।

অশ্বিনী তর্জন করি ধাইল ইন্দ্রাণী।।

চারি মুখে ব্রহ্মাণী করেন শঙ্খধ্বনি।

সিংহল নগরে বড় পরমাদ শুনি।।

রণে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজান বৈষ্ণবী।

বিজআ রণেতে সিঙ্গা বাজান শাম্ভবী।।[৪৩]

বা

কৌমারী রঙ্গে : জুগিনী সঙ্গে : করী ধরি দেই পাক।

বারাহী রণে ধান: নৃপতি তেজে রণ : ধায় জেন কান্দিশিক।[৪৪]

'মাতৃকাগণের যুদ্ধ' অংশে যেসব দেবীর নাম পাওয়া যায় তাঁরা দেবী কৌশিকী-র অংশ। এছাড়া আরো দেবী রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। 'চৌষট্টী যোগিনী'-র বিবরণ নানা জায়গায় নানা রকম পাওয়া যায়, কোনো নির্দিষ্ট করে কারোর নাম বলা যায় না।*কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ*-এর বিবরণ বিস্তৃত।দ্র.৬

এবারে 'কমলে-কামিনী' প্রসঙ্গে আসা যাক। এই বিষয়টি তন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। কমলে-কামিনী বিষয়টি কাব্যে তিনবার এসেছে। এই বিষয়টিকে এইভাবে ব্যক্ত করা যায়-'কমলের মৃণালে দৃঢ়তা, বীজগঠনে অপর্যাপ্তি, প্রজননে অজস্রতা এবং একই সঙ্গে বীজ পুষ্প ও কলিকার তিনটি অবস্থায় লালিত বলে, কমল কুঞ্জর কামিনী বলে, তা

কমলে কামিনী বলে, তা কমলে কামিনীর যোগ্য আধার। অন্ধকার হতে আলোয় বিকশিত হতে থাকা কমলের মধ্যেই আছে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার আস্বাদন। পদ্ম ফোটে এবং হৃদয়কমলদলসমূহও খুলতে থেকে, সহস্রদল পদ্ম ফুটে ওঠে শরীরে সুষুম্নায়। কমল হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের এক সুন্দর ও সহজগ্রাহ্য প্রতীক, কমলেকামিনীতে পুষ্পের গৌণ প্রতীকটিও সক্রিয়। পুষ্প খ বা আকাশের, কিন্তু এ কমল জলেই বিকশিত। কমল যেন নিষ্ক্রিয়, সে সূর্যালোকের জন্যে প্রতীক্ষায় নিরত। পুষ্পবতী শব্দের অর্থ রজস্বলা নারী, কমলে আসীন ষোড়শীও পুষ্পবতী হওয়ার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। প্রস্ফুটিত কমল নিমীলিত হয়, তেমনই কমলে কামিনীও ক্ষণস্থায়ী নান্দনিক সৌন্দর্যে মনোরম, তারপরেই সে মিলিয়ে যায়।'[৪৫]

'শ্রীমন্ত কর্তৃক চণ্ডীর চৌতিশা স্তব' অংশেও উঠে এসেছে সেই শক্তিতত্ত্বের বিষয়। দেবীর নানা রূপ এখানে বন্দিত হয়েছে। সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী-র মতে-'...বাংলা দেবীমঙ্গল কাব্যের 'চৌতিশা স্তব' (চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের এক একটিকে আদ্যক্ষর করিয়া যে স্তব) শক্তিসাধনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা প্রকৃতপক্ষে স্থূল বর্ণাত্মক ধ্বনি অবলম্বনে সূক্ষ্ম নাদ ধারণা করিবার ইঙ্গিত। 'দেবী বর্ণময়ী প্রোক্তা'-কারণ, নাদশক্তির প্রকাশ অক্ষরবর্ণে; এইজন্য শক্তিপূজায় অঙ্গে অঙ্গে বর্ণন্যাস। ইহাদ্বারা সাধক নিজদেহকে শক্তিময় বা বর্ণময় করিয়া তুলেন। চৌতিশা স্তবে একসঙ্গে ন্যাস, ধ্যান ও প্রার্থনার কাজ হয়।'[৪৬] এর যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায় কাব্যের এই অংশে।

তন্ত্রের পাশাপাশি উঠে এসেছে সামাজিক রীতি-নীতি, লোকাচার এবং পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের প্রতি। আখটী খণ্ডে যে যে বিষয় উঠে এসেছে তার পুনরাবৃত্তি এখানেও ঘটেছে। সতীন সমস্যার বিষময় চিত্র এখানেও ফুটে উঠেছে। ধনপতি-র দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করার কথা শুনে লহনার মাথায় বাজ পড়ার সমান-

বিধাতা আমারে বাম : পরে নিব ধন-ধাম : মন পোড়ে শোকের আগুনি।।

শোকানলে পোড়ে মন : দাবানলে জেন বন : আঁখিজল নিবারিতে নারি।[৪৭]

সমাজে সপত্নী সমস্যা একটা বড় রূপ নিয়েছিল। এর প্রতিকার করার সুযোগও ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেই সুযোগ মেয়েদের কোনোদিন দেয়নি যে তারা তাদের পছন্দ সবার সামনে তুলে ধরবে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ধনপতি-লহনার কথোপকথনের মধ্য দিয়েই। ধনপতি নিজের বিবাহের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করেছে লহনার কাছে-

মাসি পিসি মাতুলী বহিনি সতিনী।

নাহি কেহ রহে ঘরে হইআ রান্ধনি।।

যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি।

রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।।[৪৮]

নিজের কামকে চরিতার্থ করার জন্য সে এই কপটতার আশ্রয় নিয়েছে। শুধুমাত্র পাটের শাড়ি, সোনা গহনার বিনিময়ে লহনা এই বিবাহে সম্মত হয়নি, এর পিছনেও আছে একটি নারীর বেদনার গভীর হাহাকার। সন্তানের অপূর্ণতা তার জীবনকে ভরিয়ে তুলেছিল বিষাদে। তাই সে আক্ষেপের সুরে বলেছে-

না করিল বিধি : জনম অবধি : নারীর যৌবনকাল।

শশীর উদয় : মৃণাল না রয় : মোর মনে রৈল সাল।।

থাকে পুণ্য অংশ : কোলে হয় বংশ : সুকৃতি সেই দম্পতি।

জদি নহে তোক : শূন্য দুই লোক : দুহাঁর কর্ম্মের গতি।।[৪৯]

তাই ইচ্ছা না থাকলেও সে বাধ্য হচ্ছে তার স্বামীর দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহণে। তার কোনো প্রতিবাদ করার জায়গা নেই। কিন্তু অপরদিকে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছে সুশীলা। সিংহল রাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে বিবাহের পরেই শ্রীমন্ত স্বদেশে ফিরতে চেয়েছিল কিন্তু সুশীলা চায়নি। সে চেয়েছিল তার স্বামীকে তার কাছে আগলে রাখতে। কিন্তু পারেনি। যখন সুশীলা দেখল তার স্বামী নতুন বিবাহ করেছে তখন তার বক্তব্য-

চিরকাল থাক জিআ : আর কর সাত বিভা : সিলা মাগে সিংহলে বিদায়।

বলি প্রভু শুন কাম : অন্তরে নহীবে বাম : সাজন করিআ দেহ নায়।।[৫০]

সেই সময়ে মেয়েদের এই ধরনের বঞ্চনা এবং অপ্রাপ্তি থেকেই জন্ম নিত ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার দাবানল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে দুর্বলা দাসী। দু'জনের মধ্যে এই বিভেদ দেখিয়েই দুর্বলা দাসী লহনাকে দিয়ে খুল্লনার উপর পীড়ন করিয়েছে। চরিতার্থ করেছে নিজের গোপন আকাঙ্ক্ষা। সমালোচক স্মৃতিকণা চক্রবর্তী এই বিষয়টিকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন- 'সমাজে সপত্নী সমস্যা যে কত গভীর ছিল, মহামারীর মতো ব্যাপক ছিল, একবার দুবার নয় চার চার বার কাহিনীকে সপত্নী ঘেরা সংসারের মাঝে নিক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্যাধ-কাহিনীতে দু'বার, বণিকখণ্ডে দু'বার। এমন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাহিনী সাজিয়েছেন তিনি যে কোথাও পুনরুক্তিদোষে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক তো করেই না, বরং মনোযোগী পাঠে সমস্যার এক ধারাবাহিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।'[৫১]

সমাজে পুরুষদের জন্য সব ছাড়। অর্থবান লক্ষপতি ধনপতির সংসারে নিজের মেয়েকে বিবাহ যদি না দেন সেই কথা ভেবে আগে ভাগেই জনাই পণ্ডিত শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে তাকে এই বিবাহ দিতে সম্মত করিয়েছে-

বার বৎসরের সুতা : তোর ঘরে অস্থিতা : কেমনে আছহ শুদ্ধমতি।।

সাধু বলে মোর বোলে : হৃদি কর এই কালে : অবধানে কর অবগতি।

আমার বচন শুন : যদি নাহী নেহ পণ : তবে কন্যা করাব মুকতি।।[৫২]

বাধ্য হয়েছে লক্ষপতি মেয়েকে দোজবরে বিয়ে দিতে। সে বুঝেছে বিবাহ না দিলে বয়েসের দোহাই দিয়ে তাকে পরবর্তী সময়ে বিপদে পড়তে হবে। তৎকালীন এই বিষয়গুলি ছিল সমাজের চোখে সাধারণ বিষয়। মেয়েদের জীবন কারোর কাছেই প্রাধান্য পেত না; তাই হতাশাবোধ থেকে জন্ম নিত তাদের জীবনের প্রতি আক্ষেপ। 'নারীগণের পতিনিন্দা' সেই বিষয়গুলিই সহজভাবে ফুটে উঠেছে-

কোন দেশে দুঃখিনী নাহিক মোর পারা।

কোলে কাছে থাকি তবু সদাই করে হারা।।

আর জুবতি বলে পতির বর্জিত দশন।

সাক সুপ ঘণ্টা বিনা না করে ভোজন।।

দ্রঢ় বেঞ্জন কীবা জেই দিন রান্ধি।

মারয়ে পিঁড়ার বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।।[৫৩]

আমি সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করলাম, নারীদের এই অপ্রাপ্তির তালিকা দীর্ঘ। মধ্যযুগে নারীদের চিন্তাভাবনার পরিসর শুধুমাত্র ঘর সামলানো, রান্না-বান্নার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তাদের আর কোনো স্বাধীনতা নেই। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় লহনার সংসারে। লহনার যৌবন অস্তাচলগামী স্বামীর তার প্রতি মন প্রায় নেই বললেই চলে। এখন তার স্থান রন্ধনশালায় নির্দিষ্ট হয়েছে।

সমাজে নারীদের বার বার পরীক্ষা দিতে হয়েছে প্রমাণ করার জন্য। সেই মহাকাব্যের সময় থেকে একই রীতি। যদি তুমি উত্তীর্ণ হও তাহলেই তুমি সমাজে স্থান পাবে নচেৎ নয়। খুল্লনার চরিত্র নিয়ে বণিক সমাজ প্রশ্ন তোলে-

রাম রাজা হইতে কিবা সাধু ধনপতি।

বনে ছাগল লৈয়া জার ভ্রমিল যুবতি।।

কোক ভল্লুক সনে শতেক মাতাল।

সেই বনে তার জায়া ছাগলরাখাল।।

দোষগুণ নাহি সাধু করিআ বিচার।

খুল্লনার ঠাঞি করে ভোজন ব্যেভার।।

উচিত বলিতে মোর কিবা আছে শঙ্কা।

পরীক্ষা নহীলে দিবে [এক] লক্ষ তঙ্কা।।[৫৪]

চরিত্র পরীক্ষা না করালে মূল্য যদি ধরে দাউ তাহলে সমস্ত সন্দেহ চলে যাবে, এ যেন 'টাকাতে বাঘের দুগ্ধও মেলে'-এর মতো অবস্থা। টাকায় সব কিছু সম্ভব। আর সামান্য চরিত্রের দোষ স্খালন করা আবে না এও কী আবার হতে পারে ! নারীদের যে কোনো পরিচয় সত্তা গড়ে ওঠেনি তা সহজেই অনুমেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই প্রধান; তার পরিচয় না থাকলে তুমি অবৈধ রূপে স্বীকৃত হবে। 'গুরু ও শ্রীমন্তর বাদ-বিতণ্ডা' অংশে বর্ণিত-

পিতা দীর্ঘপরবাসে তোমার জনম।

নাহি জান আপনার জাতের মরম।।

মর্‍্যা গেল ধনপতি হইল বহু দিস।

মায়ের আইয় ত হাথে ভোজন আমিস।।

জারুয়া ঢেমনে নাহী শুনাঞি পুরাণ।

এই হেতু আমার এতেক অপমান।।[৫৫]

এই অপমানের অংশ দীর্ঘ, শ্রীমন্ত এরপর পিতার অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে। বাধ্য হয়ে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বাঁচাতে হন্যে হয়ে পিতাকে অন্বেষণ করেছে। নাহলে সে 'জারজ' বলে বিবেচিত হবে।

ষোড়শ শতব্দীর প্রেক্ষাপটে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী এই কাব্য লিখছেন যখন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সবদিক থেকেই বিপর্যয়ের কাল। বিশেষত ধর্মের দিক দিয়ে কোনো কিছু মানুষকে সুস্থির রেখেছিল এমন কথা বলা যাবে না। 'দেবী-মুখে কলির দোষ কথন' অংশে বর্ণিত-

ধর্ম নাহী পাব স্থান : অপাত্রে সভার মান : ষোড়শ বৎসরে হব জরা।

বিদ্যায় না দিআ মতি : সভে জাব অধোগতি : কুলবধূ হব সতন্তরা।।

উগ্রবাহু হব দ্বিজ : পরিহরি ধর্ম নিজ : সভে হব শূদ্রের সমান।

বাড়িবেক কাম কোপ : অনুদিন ধর্মলোপ : টুটিবেক জপ তপ দান।।

বৃথা মাংসে অভিরুচি : না হব ব্রাহ্মণ শুচি : করিব ধর্মের উপহাস।।[৫৬]

এই বিবরণ অনেকটাই আছে, এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা দেওয়া হল। এছাড়াও কাব্যের কিছু কিছু অংশে লৌকিক সংস্কার ফুটে উঠেছে। যাত্রাকালে যেসব ইঙ্গিতকে অশুভ বলে গণ্য করা হত এখানে তা ব্যক্ত করা হয়েছে-

বাহির হইতে সাধু বাজিল উছটা।

নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল-কাঁটা।।

যাত্রার সমএ ডোমচিল উড়ে মাথে।

কাঠুরিআ কাটভার লৈআ আইসে পথে।।

সুখাণা চালেতে বস্যা কলবলায়ে কাউ।

যোগিনী মাগএ ভিক্ষা আদখানি লাউ।।[৫৭]

এই লোকসংস্কারের মধ্য দিয়েও তৎকালীন সমাজের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। রওনা হবার পূর্বে জ্যোতিষ গণনা সেই সময়ের একটি রীতির মধ্যে পড়ে।

কবির কাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে নানা ঘটনার বিবরণ থাকলেও তার আবেদন সর্বজনীন। কবির কাব্যে সব ধরনের ধর্মের কথা বলা হয়েছে। অনেক সমালোচক তাঁর ধর্মমত বৈষ্ণব বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর কাব্যের বন্দনা অংশ দেখলে বোঝা যায় তিনি সব ধর্মকে সমান ভাবে উপাসনা করতেন। সমালোচক সনৎকুমার নস্কর-এর মতে-'...কবিকঙ্কণের লেখায় পৌরাণিক দেবদেবীদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাঠককে এই অনুমানের দিকে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে যে, তিনি দামিন্যায় চক্রাদিত্য শিবের পূজারী হলেও তাঁর পিতামহের গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হতে অসুবিধে হয়নি এবং তিনি নিজে চণ্ডীর মতো শক্তিদেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে কাব্য রচনা করলেও সংস্কারে, আচরণে ও ধর্মমতে পঞ্চোপাসক গৃহস্থ হিন্দুই ছিলেন।'[৫৮] বিশেষত সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যে দেওয়া হয়েছে তা শুধু সেই যুগকেই বিবৃত করেনি, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে মানব হৃদয়ের সুখ-দুঃখের অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব ; সেইজন্য সকল কবিকে ছাড়িয়ে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী-কে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পড়ানো হয় এবং তাঁর কাব্য হয়ে ওঠে যুগোত্তীর্ণ।

দ্রষ্টব্য

১. সমালোচক ক্ষুদিরাম দাস *কবিকঙ্কণচণ্ডী* গ্রন্থে নানাবিধ প্রমাণের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্য রচনা করেছেন ১৬০৩-০৪ সালে এবং এই কাব্যরচনা কবি শেষ করেছেন ১৬১২ খিষ্টাব্দ নাগাদ। সমালোচক আহমদ শরীফ এই মতকে সমর্থন করেছেন।

২. সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম* গ্রন্থে শুধুমাত্র কবির বর্ণনা বা তার সমসাময়িক লেখার উপর ভিত্তি করে কবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে মন্তব্য করেননি, তৎকালীন ইতিহাস এবং শিলালিপির সাহায্যে কবির সম্ভাব্য কাল নির্ণয় করেছেন। সেইজন্য কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী-র গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মত অধিক গ্রহণযোগ্য।

৩. 'চণ্ডী' নামের তাৎপর্য তন্ত্র গ্রন্থ *শ্রী শ্রী রুদ্র চণ্ডী*-তে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দেবী চণ্ডী সম্পর্কে বলা হয়েছে- '...চণ্ড শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে চণ্ডী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছন্ন পরবহ্ম। অর্থাৎ চণ্ডী অর্থে পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মধর্ম ও ধর্মিব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক। এই ধর্ম পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রোক্ত চোদনা-লক্ষণ জড়ধর্ম নয়। পরন্তু তা ব্রহ্মধর্ম বা চিৎশক্তি। এই শক্তি পারমার্থিকী ও ত্রিকালবাধিতা।'

৪. সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য *তন্ত্রপরিচয়* গ্রন্থে (পৃ.৭৬) এই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন- 'যদিও নিখিল বিশ্বই পরম শিবের শক্তি, তথাপি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন রূপেই শক্তির সমধিক প্রকাশ। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী পাঠ করিতে পাঠকগণ মহাসরস্বতী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই জ্ঞানশক্তি। মহাকালী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই ইচ্ছাশক্তি এবং মহালক্ষ্মী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই ক্রিয়াশক্তি। এই তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সকল বিশ্বই শক্তি-স্বরূপ।'

৫. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-র *শ্রীশ্রীচণ্ডী* গ্রন্থে দেবী চণ্ডীর নানা নামের তালিকা (পৃ. ৩৯) পাওয়া যায়। সেখানে নামের ভিন্নতা থাকলেও মূল শক্তির কেন্দ্রে সেই এক আদ্যা শক্তি। *দেবীভাগবত*-এ উল্লেখিত-

সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।

যোহসি সাহম্ অহং যাসৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ।।

-'অর্থাৎ আমি ও ব্রহ্ম এক। উভয়ের মধ্যে ভেদ নেই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি। আমি যাহা, তিনিও তাহা। এই ভেদ ভ্রমকল্পিত, বাস্তব নহে।'

৬. *কালিকাপুরাণ*-এ উল্লেখিত-

ব্রহ্মাণী প্রথমা প্রোক্তা ততো মাহেশ্বরী মতা।

কৌমারী চৈব বারাহী বৈষ্ণবী পঞ্চমী তথা।

নারসিংহী তথৈবৈন্দ্রী শিবদূতী তথাষ্টমী।

এতাঃ পূজ্যা মহাভাগা যোগিনীঃ কামদায়িনীঃ।।

দেবী কৌশিকীর অংশ এঁরা। দেবীর কাজে সহায়তার জন্য এঁদের প্রয়োজন হয়। *কালিকাপুরাণ*-এ এর বিস্তৃত বিবরণ (পৃ. ৫৯৮-৬০৬) পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

১. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৭৬।

২. সুকুমার সেন, *কবিকঙ্কণ প্রসঙ্গ* ; বিশ্বনাথ রায় সম্পা. , *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১৯১।

৩. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* রত্নাবলী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ১০০।

৪. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী* (ভূমিকা অংশ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ৩৪।

৫. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* ঐ, পৃ. ১০০।

৬. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী,* ঐ, পৃ. ৭০।

৭. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* ঐ, পৃ. ২৭৫।

৮. তদেব, পৃ. ১০২।

৯. তদেব, পৃ. ২৫৩।

১০. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী* (ভূমিকা অংশ), ঐ, পৃ. ৩৭।

১১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, জুলাই ২০১৮, পৃ. ৩১৯।

১২. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* ঐ, পৃ. ২৭০।

১৩. তদেব, পৃ. ২৫৩।

১৪. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৩৫।

১৫. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* ঐ, পৃ. ২৭৫।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৩৫।

১৭. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী*, ঐ, পৃ. ৭১।

১৮. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, ঐ, পৃ. ২৫৫।

১৯. জ্যোতিলাল দাস সম্পা. , *কামধেনুতন্ত্র*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২২ ।

২০. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, ঐ, পৃ. ১৩৮।

২১. তদেব, পৃ. ২৩১।

২২. তদেব, পৃ. ১৪৯।

২৩. তদেব, পৃ. ১৫১।

২৪. তদেব, পৃ. ১৪০।

২৫. স্মৃতিকণা চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : নারী মনস্তত্ত্বের অসামান্য রূপকৃতি (সতিন সমস্যা , বারোমাস্যা ও নারীদের পতিনিন্দা)* , বিশ্বনাথ রায় সম্পা. , *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৩২২।

২৬. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, ঐ, পৃ. ২৩৭।

২৭. তদেব, পৃ. ২৩৩।

২৮. তদেব, পৃ. ২৮৬।

২৯. তদেব, পৃ. ২৮৬।

৩০. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, *মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : সামাজিক সচলতারও জীবন্ত দলিল*, বিশ্বনাথ রায় সম্পা. , *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ২৮৬।

৩১. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান*, ঐ, পৃ. ৬৯।

৩২. তদেব, পৃ. ৮০।

৩৩. তদেব, পৃ. ১১৪।

৩৪. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*, প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪৬৬।

৩৫. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. ও সম্পা. , ঐ, পৃ. ৬৫।

৩৬. তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪।

৩৭. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* ঐ, পৃ. ১৩০।

৩৮. সুখময় ভট্টাচার্য, *তন্ত্রপরিচয়,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৫১।

৩৯. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* ঐ, পৃ. ১২১।

৪০. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা,* ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮, পৃ. ৪৮৯।

৪১. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* ঐ, পৃ. ১৬৮।

৪২. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা. , *মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিতম্ কালিকাপুরাণম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৫৯৯।

৪৩. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* ঐ, পৃ. ১৪৩।

৪৪. তদেব, পৃ. ১৪৪।

৪৫. বীতশোক ভট্টাচার্য, *কমলে কামিনীর উৎস সন্ধানে,* বিশ্বনাথ রায় সম্পা. , *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১০৪-১০৫।

৪৬. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার,* প্রথম খণ্ড, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮০।

৪৭. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* ঐ, পৃ. ১০।

৪৮. তদেব, পৃ. ১১।

৪৯. তদেব, পৃ. ১১।

৫০. তদেব, পৃ. ১৭০।

৫১. স্মৃতিকণা চক্রবর্তী, ঐ, পৃ. ৩২৩।

৫২. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* ঐ, পৃ. ৭।

৫৩. তদেব, পৃ. ৯।

৫৪. তদেব, পৃ. ৬৪।

৫৫. তদেব, পৃ. ১০০।

৫৬. তদেব, পৃ. ১৭৩।

৫৭. তদেব, পৃ. ৮০।

৫৮. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান*, ভূমিকা অংশ, ঐ, পৃ. ৩৫।

মুক্তারাম সেন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার যে কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে মুক্তারাম সেন অন্যতম। অন্যান্য *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের তুলনায় কবি মুক্তারাম সেনের কাব্য খুব বেশি জনপ্রিয় নয়; কিন্তু সময়ের দিক থেকে এই কাব্যের গুরুত্ব আছে। অষ্টাদশ শতাব্দী হল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব দিক দিয়েই বিপর্যয়ের কাল। সেই সময় দাঁড়িয়ে কবির কাব্য এক অসামান্য দলিল স্বরূপ। কবির কাব্য রচনাকাল তাঁর কালজ্ঞাপক শ্লোক থেকে পাওয়া যায়-

গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক শুভ জানি।

মুক্তারাম সেন ভণে ভাবিয়া ভবানী।।[১]

সমালোচক আবদুল করিম-এর মতে, ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি বা সেই সময়ের মধ্যে কবি এই কাব্য রচনা করেছেন।দ্র.১ সময়ের দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ; আর দশ বছর পরেই ইতিহাস সাক্ষী হতে চলেছে পলাশীর যুদ্ধের, এই সময়কালের সাথে কাব্যের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা আলোচনার সাপেক্ষে বিচার করা যায়।

যে সময়ধারার মধ্যে কবি কাব্য রচনা করেছেন সেই সময়কালে বাংলার মসনদে বসে আছেন নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬) এবং বাংলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে বর্গী আক্রমণের ঝড়; ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মেলে-'...মারাঠারা দশ বছর ধরে (১৭৪২-১৭৫১) পশ্চিমবাংলার বুকে তাণ্ডব চালিয়েছে ঠিকই, তবে এটা কোনো সীমাহীন, বিরামহীন ঘটনা নয়। বর্ষাশেষে লুটপাট করার জন্য মারাঠারা বাংলায় আসত। তাদের যাতায়াতের পথের দু'পাশের শহর ও গ্রাম লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হত।'[২] কবি ছিলেন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামের বাসিন্দা সেখানে এর প্রভাব খুব একটা দেখা যায়নি, তাই কাব্যেও এর প্রতিফলন খুব একটা নেই।

কাব্যের আখ্যানভাগের ক্ষেত্রে কবি নতুনত্ব কিছু প্রতিপাদন করেননি, প্রচলিত কাহিনীকেই গ্রহণ করেছেন। কাহিনীর আখ্যানভাগ খুবই সংক্ষিপ্ত; কবি কাব্যের নাম *সারদামঙ্গল* রাখলেও আরেকটি নাম পাওয়া যায় সেটি হল *অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী* । কবির পাঁচালীর ছন্দে কাব্য বিষয়কে বেঁধেছেন। কবির কাব্য লেখার উদ্দেশ্য পরিষ্কার-

জেই জনে শুনে অষ্টমঙ্গলার গীত।

ব্যাধি জনের ব্যাধি খণ্ডে পূরে মনোরিত।।[৩]

অর্থাৎ কবির উদ্দেশ্য স্পষ্ট; লোকশিক্ষা নয়, জনসাধারণের মনোরঞ্জন এবং হিতার্থে কবি এই পাঁচালী মূলক কাব্য লিখেছেন। কাহিনীর প্রথম অংশে কালকেতুর কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয়ভাগে ধনপতি সদাগরের কাহিনী লিখিত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রচলিত রীতিকেই তিনি অবলম্বন করেছেন। কাহিনীর যে যে বিষয় উঠে এসেছে তা খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত, বিস্তারিত ভাবে তিনি বর্ণনায় যাননি। কাব্যে তন্ত্রের অনুষঙ্গ খুব কম; দেবী চণ্ডীকে কবি অভিন্ন দেবী শক্তির সাথে তুলনা করেছেন যা শক্তিতত্ত্বেরই ইঙ্গিত দেয়-

তুমি আদ্যা নারায়ণী নারায়ণ পরায়ণী

তুয়া অংশে পঞ্চ অবতীর্ণ।

গৌরী জহ্নু সুতা সতী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী

সৃষ্টি কর্ম্ম দেখি মাত্র ভিন্ন।।[৪]

দেবীকে কবি আদ্যাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে কাব্যে দেখাতে চেয়েছেন। দেবী চণ্ডী আদ্যাশক্তিরই একটি প্রকাশ তা তন্ত্রসম্মত। কবি তার ইঙ্গিত কাব্যের শুরুতে দিয়েছেন-

তেহি ত্রাতা তা দেবি জয় দেবি দাতা।

সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা।।

আদি শকতি দুর্গা ভাবিএ বিষয়ে।

জার গুণ গাএ বেদ আগম নিগমে।।[৫]

দেবীর প্রকাশ ক্ষেত্রবিশেষে নানা রূপ; মূলে এক কিন্তু প্রকাশ অনেক। তন্ত্রে আদ্যাশক্তিকে বলা হয়-

সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনু

অর্থাৎ 'তোমার দেহ সর্ব্বদেবময় ও তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।'[৬] সেইজন্য কবি কাব্য বর্ণনা দিয়েছেন-

ব্রহ্মা হরিহরে তোহ্মা নহি জানে মায়া।

কিরূপে জানিব আহ্মি নরাধম কায়া।।

তুহ্মি আদ্যা তুহ্মি সাধ্যা ত্রিজগতভর্ত্তা।

তুহ্মি সুখ তুহ্মি দুঃখ ত্রিজগতহর্ত্তা।।[৭]

কবি কাব্যে তন্ত্রের এই সূত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত উপাসনা ছিল, কবি আদ্যাশক্তির উপাসনা ব্যক্তিগতভাবে করতেন,দ্র.২ তার ফলশ্রুতি রূপেও কবি কাব্যে এই বিষয় এনে থাকতে পারেন বলে আমাদের ধারণা।

তন্ত্রের আরেকটি বিষয় কাব্যে কবি তুলে ধরেছেন তা কিছুটা সাধনা সংক্রান্ত-

শুন জীব শিবচক্রে কেলি করে ষটচক্রে

আগম মথিলে পায়ে সার।[৮]

ষটচক্র বলতে তন্ত্রের ভাষায় মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এই ছয়টি চক্রকে বোঝায়; মূলাধারচক্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা; সেই শক্তি সহস্রারস্থিত পরম শিবের সাথে যদি মিলিত হয় তাহলে সাধক আনন্দময় স্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এই ভাবেই শক্তির প্রকাশ সাধক অনুভব করেন। আগমশাস্ত্রে এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।দ্র.৩

কাব্যে সমকালীন সমাজ ও ধর্মের পরিচয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাওয়া যায়। সেকালের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক ছিল, পশ্চিমবাংলার পাশাপাশি পূর্ববঙ্গেও একই চিত্র ছিল। অন্যান্য কবিদের মতো কবি মুক্তারাম সেনও পিতৃপরিচয় না দিতে পারার দরুন শ্রীমন্তকে জনার্দ্দন পণ্ডিতের কাছে পাঠশালায় অপমানিত হবার ঘটনার কথা, খুলনার সতীত্ব পরীক্ষার বিষয়গুলি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজের অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে সতীন সমস্যা ছিল নারীকুলের জীবনের একটি অঙ্গ। সংসারে এই অশান্তি লেগেই থাকত। সতীনের প্রতি প্রতিহিংসা এটা যেন ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার, কবির কাব্যে লহনার প্রতিহিংসা উল্লেখিত

লোকের সম্মুখে মাত্র কান্দএ লহনী।

মনে মনে মনকলা খাএ মরোক খুলনী।।[৯]

এর পাশাপাশি কবি লোকাচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন; যাত্রা বিষয়ে যে লোকাচার কবি বলেছেন সেটি হল-

দক্ষিণ থাকিআ সর্প বাম দিগে স্থিতি।

জোগিনী মাগএ ভিক্ষা দেখএ কুরীতি।।

তৈলের পসার দেখে দক্ষিণে(ত) শিবা।

এথ অমঙ্গলে কিবা না টলএ জীবা।।[১০]

বিষয়টিতে অমঙ্গলতার সূচক প্রকাশিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়াও কবি সর্বধর্ম সমন্বয়ের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন-

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অভেদ নিশ্চয়।।

আদি শকতি ইত্যাদি।[১১]

কবি মুক্তারাম সেন সহজ, সরল ভাবে তাঁর কাব্যকে পরিবেশন করেছেন; কাব্যের দিক থেকে তিনি পাঁচালী রীতিকে অবলম্বন করে নতুনভাবে বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য-র মতে-'... মুক্তারামের রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীরই উন্নত এবং আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে হইতে পারে।'[১২]

দ্রষ্টব্য

১. সম্পাদক ও সমালোচক আবদুল করিম কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে কবির কালজ্ঞাপক শ্লোকের অর্থ করেছেন। সমালোচক কবি মুক্তারাম সেন-কে তাঁর বংশের চতুর্থ পুরুষ (যাদব রায় থেকে) বলে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, 'প্রতি পুরুষে গড়ে ৩০ বৎসর ধরিলে কবির পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষে আনুমানিক ৯০ বৎসর হয়। এখন আমরা অনুমান করিতে পারি, ১৫৪০+৯০=১৬৩০ (১৭০৮ খৃষ্টাব্দ) বা তাহার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে বা পরে মুক্তারাম সেন জন্মগ্রহণ করেন।' সেই অনুযায়ী সমালোচক আবদুল করিম কালজ্ঞাপক শ্লোকের অর্থ করেছেন ভিন্ন ভাবে। কবির কালজ্ঞাপক শ্লোক হল-

গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক শুভ জানি।

মুক্তারাম সেন ভণে ভাবিয়া ভবানী।।

নির্দেশ অনুযায়ী 'কাল' শব্দের মান ৩ বা ৪ ধরলে ১৩৬৯ বা ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দ হয়, যা পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকেই ইঙ্গিত করে, তাতে কবির জন্মসাল থেকে অনেক পিছিয়ে যায়; তাই সমালোচক আবদুল করিম 'কাল' শব্দের মান নির্দেশ না করে তার মান ৬ ধরে গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৬৯ শকাব্দ বলে নির্দেশ করেছেন।

২. কবি মুক্তারাম সেন ব্যক্তিগতভাবে আদ্যাশক্তির উপাসনা করতেন, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় সম্পাদক ও সমালোচক আবদুল করিম রচিত ভূমিকা অংশে- ' কবি মুক্তারাম সেন আদ্যাশক্তির বরপুত্র ছিলেন বলিয়া লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে। লোকে বলে, আদ্যাশক্তিকে তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।'

৩. *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ* গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে ষটচক্রের বিবরণ আছে, পৃ. ১৪৯৪।

সূত্র: পঞ্চানন শাস্ত্রি অনূদিত ও সম্পা., *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫।

তথ্যসূত্র

১. আবদুল করিম সম্পা. , *মুক্তারাম সেন রচিত সারদা-মঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩২৪, পৃ. ৭৪ ।

২. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়,*প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭)*, কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫।

৩. আবদুল করিম সম্পা. , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

৪. তদেব, পৃ. ২।

৫. তদেব, পৃ. ৩।

৬. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূ. , *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪১।

৭. আবদুল করিম সম্পা. , পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

৮. তদেব, পৃ. ৫৭।

৯. তদেব, পৃ. ৪০।

১০. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৬।

১১. তদেব, পৃ. ৩৮।

১২. আশুতোষ ভট্টাচার্য,*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪৬০।

কবি রামানন্দ

প্রথম পর্ব

সমসাময়িক পরিবেশ এবং দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সবকিছুর উপরেই সাহিত্যের গুণমান নির্ভর করে। সময়ের দিক দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী সব থেকে বিতর্কিত সময়। এই সময়ে না ছিল মানুষের মনে শান্তি, না ছিল জীবনের নিরাপত্তা। বর্গী আক্রমণের মত ঘটনা এই সময়ে মানুষের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়ে গেছে। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় কদাচার; মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে স্বার্থপরতা তথা সুবিধাবাদ। সাধারণ মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে টিকে থাকার লড়াই, সর্বোপরি অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার প্রতিযোগিতা। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে দেখাতে পেরেছিলেন কিভাবে জীবনের সংকট মানুষকে রিক্ত করে দিয়েছে; কিন্তু তার মধ্যেও তিনি শোনাতে পেরেছিলেন সর্বসমন্বয়ের বাণী তথা নবজীবনের আশাবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেসব কবি *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই সময়ের দাবি পূরণ করে যুগবৈশিষ্ট্যকে কাব্যে তুলে ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে ভবানীশঙ্কর দাস, অকিঞ্চন দাস, জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম সেন প্রমুখ কবি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো অনেক কবি আছেন যাঁরা এই সময়পর্বে লিখেছেন। রামানন্দ যতি এই সময়পর্বে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার অন্যতম কবি। রামানন্দ যতি-কে অন্যতম বলার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলিই বিস্তারিত করে বলার চেষ্টা করব।

কবির কাব্য রচনাকাল:

কবি কাব্যে যে কালজ্ঞাপক শ্লোক লিখেছেন সেটি হল-

গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়।

চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয়।।[১]

অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী ১৬৮৮ শকাব্দ, ১৭৬৬ সাল নাগাদ কবি সম্ভবত এই কাব্য রচনা করেন। সময়ের দিক থেকে দেখতে গেলে এই কাব্যর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধ এই দুটি ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে গেছে; আর কিছুদিন পর শোনা যাবে মন্বন্তরের হাহাকার সেটি অন্য বিষয়। নবাবি আমল প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে, ব্রিটিশ রাজশক্তি ক্ষমতার প্রাধান্য বিস্তার করছে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে। কবির কাছে এই বিষয়গুলি সেই সময় অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কবির কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী-র কাব্যর তুল্যমূল্য বিচার এবং জনগণের উদ্দেশ্যে সঠিক নীতি ও রস পরিবেশন কবির মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। কাব্যে বর্ণিত-

আদি রস প্রকাশে মূঢ়ের মন মজে।

তেঞি কবি সকলেই সেই রস ভজে।।

শিল্পনো কহেন তাহে জগত মোহিত্।

কুকাব্যেতে মত্ত কর‍্যা দেয় আরোচিত্।।[২]

সমাজে কুকথা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাই উদাহরণস্বরূপ কবি এই কাব্য রচনা করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কবির আগে *অন্নদামঙ্গল*-এর রচয়িতা ভারতচন্দ্র *বিদ্যাসুন্দর*-এর কাহিনী শুনিয়েছেন, দেখিয়েছেন সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র। মানুষের কাছে কড়ি মাহাত্ম্যের মূল্য এই সময় অনেক বেশি, কাব্যে বর্ণিত-

কড়ি ফটকা চিঁড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই

কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।

কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি-লোভে মরে গিয়া

কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।।[৩]

যেখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছাড়া কোনো কিছুই লক্ষণীয় নয় সেখানে কবি রামানন্দ শোনাতে চেয়েছেন নৈতিক শুদ্ধতা ও পরিশীলতার বাণী-

জ্ঞান রস ভক্তি রস এই একাদশ।

রৌদ্রবীর করুণ অদ্ভুত শ্রেষ্ঠ রস।।

ভক্তি জ্ঞান করুণা সকল রসে শ্রেষ্ঠ।[৪]

যদিও কবি ভারতচন্দ্রের কিছু সময় পরেই কবি রামানন্দ তাঁর কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন কিন্ত তাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন খুব বেশি হয়নি এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের চেতনার জাগরণ ঘটাতে কবি এই কাব্য লিখছেন-

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে

চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।

অনেকের অনুরোধ কেহ না করিহ ক্রোধ

অনেক শিষ্টের অনুমতি।।[৫]

কবি রামানন্দ-এর জনশিক্ষা এবং সমসাময়িক পরিস্থিতি:

কবি ভারতচন্দ্রের কিছুকাল পরেই কবি রামানন্দ এই কাব্য লিখছেন, কাহিনীর দিক থেকে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী-র মতই আখ্যানভাগ সাজিয়েছেন। আখেটী খণ্ডের মত নীলাম্বর ও ছায়ার মর্ত্যে কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে জন্মগ্রহণ, বিবাহ, পশুশিকার, ফুল্লরার দেবীর কাছে দুঃখ বর্ণন, দেবীর পূজা প্রচার এবং অবশেষে স্বর্গযাত্রা সবই কাহিনীগত ভাবে একই রেখেছেন। অপরদিকে বণিক খণ্ডে ধনপতির সাথে খুল্লনা ও লহনার বিবাহ, ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা এবং সেখানে পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার এবং অবশেষে শ্রীমন্তের পিতার উদ্ধার, চণ্ডীর পূজা কোনোকিছুই বাদ যায়নি। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কবি নিজস্ব রীতিতে ব্যক্ত করেছেন; তিনি নিজের কোনো পরিচয় কাব্যে দেননি, মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি কাব্যকে সাজাননি। চিরাচরিত স্বপ্নাদেশ, কাব্যনাম কবি কাব্যে ব্যবহার করেননি। বর্ণনার ক্ষেত্রেও কবি অন্যান্য কবিদের মত বিস্তারে তাঁর কাহিনী শ্রোতা বা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেননি, সংক্ষিপ্তভাবেই সেই কাজ সমাপ্ত করেছেন।

কবি যে সময় এই কাব্য রচনা করছেন সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলি একটু লক্ষ করা যাক; পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক পালাবদল বাংলার মসনদে ঘটে গেছে, ব্রিটিশ শক্তি নামেমাত্র নবাবকে সিংহাসনে বসিয়ে ধনসম্পদ হস্তান্তর করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সমালোচক অতুল সুর-এর মতে-'বস্তুত বকসারের যুদ্ধের পর বাঙলার নবাব মাত্র সাক্ষীগোপালে পরিণত হয়। প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে চলে যায়। তাদের অত্যাচার, স্বার্থান্ধতা ও জুলুম দেশের মধ্যে এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।'[৬] এর ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাবার জোগার, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মানুষে মানুষে কাটাকাটি, হানাহানি নিরন্তর চলছে। সমালোচক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় এই সময়কার আর্থিক নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে বলেছেন-'সারা অষ্টাদশ শতক ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এই দেশে নানা উপায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিল। পলাশী থেকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার নবাবদের সঙ্গে নানারকম চুক্তির মাধ্যমে (business of making and unmaking nawabs) কোম্পানির কর্মচারীরা মোট পাঁচ কোটি চালানি টাকা পেয়েছিল।'[৭] এছাড়া আরো কতভাবে আর্থিক তছরূপ হয়েছিল তার হিসেব নেই। এর দায়ভার সম্পূর্ণভাবে বর্তেছিল সাধারণ মানুষ তথা দিন আনা দিন খাওয়া গরিব মানুষদের উপর। ফুল্লরা যখন নিজের সতীন ভেবে দেবীকে নিজের সমস্যাগুলি বলতে থাকে তাতে বোঝা যায় সাধারণ জনমানসের যন্ত্রণা কতখানি, ফুল্লরার জবানিতে-

কাঁদ্যা বলে তোমায় থাকিয়া নাই কাজ।।

কি সুখে থাকিবা রামা কুড়্যার ভিতরে।

চিরকাল দহিতেছি আস্যা এই ঘরে।।

আগুন সমান পড়ে বৈশাখের খরা।

খুদ সেরে বিকাইল মাটিয়া পাথরা।।

দুঃখের নাহিক সীমা কি কহিব আন।[৮]

এই রাজনৈতিক পালাবদলের আগে বাংলাদেশের মানুষের মনে আরেকটি ক্ষত বিদ্যমান ছিল, সেটি হল বর্গী আক্রমণের মত ঘটনা, ভাস্কর পণ্ডিতের মত দুর্ধর্ষ বর্গীকে নবাব আলিবর্দি খাঁ কীভাবে দমন করেছিল তা সেইসময় কারোর অজানা নয়। কবি রামানন্দ এই বিষয়টিকে অন্যভাবে নির্মাণ করেছেন। ভাঁড়ু দত্ত কাব্যে অন্য রূপে প্রতিভাত হয়েছে। কলিঙ্গরাজের কাছে কালকেতুর রাজা হবার সুবাদে সে তিনশো সৈন্য দাবি করে। তারপর এই সৈন্যদেরই বিভিন্ন ছদ্মবেশে পাঠিয়েছে কালকেতুর দরবারে। তারাই কালকেতুকে যাত্রাপথে বন্দী করে কলিঙ্গের রাজার সামনে তাকে হাজির করেছে। ১৭৪২ সালে বাংলায় এইভাবে আলিবর্দি খাঁ ভাস্কর পণ্ডিতকে ডেকে সুকৌশলে তাকে হত্যা করে। সমালোচক সত্যবতী গিরি-র ভাষায়-'...অষ্টাদশ শতাব্দীর পালাবদলের প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত ঘটনাকে নিয়েই লেখা হয়েছিল *মহারাষ্ট্রপুরাণ* । রামানন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ দেবকথার স্বচ্ছ আবরণে ইতিহাসেরই আভাস। যুগের বৈশিষ্ট্যই পাল্টে দিয়েছে মুকুন্দ আর মাধবের ঘটনা বুনে তোলা টেকনিককে।'[৯]

সামাজিক সমস্যার মত কিছু কিছু বিষয় কাব্যে উঠে এসেছে যেমন সতীন সমস্যা। ফুল্লরা যেমন সতীনের ভয়ে নিজের দুঃখের কথা দেবী চণ্ডীকে জানিয়েছে তেমনি দেবী চণ্ডী দ্ব্যর্থভাবে নিজের পারিবারিক বিষয় ব্যক্ত করেছে-

পাগল হইল পতি ছাই মাখে গায়।

সাপড়্যা হইয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়।।

অনেক সতীন আর গঙ্গা বেগবতী।

তে কারণ করিলাম বনেতে বসতি।।[১০]

সতীন সমস্যা ছাড়াও ছিল সমাজে পাত্র নির্বাচনের মতো বড় বিষয়; মেয়েকে কুলীন বয়স্ক পাত্রের হাতে দিতে পারলে মেয়ের পিতামাতার বড় স্বস্তি। পাত্রের চরিত্র যেমনই হোক না কেন সেটি বিবেচ্য নয়, মেয়ের কুলীন স্বামীর সাথে বিবাহ হচ্ছে এটিই বড় বিষয়-

শুনিলাম লোকমুখে স্বামি চাও হর।

কোন লাজে ভজিবা ভিখারী দিগম্বর।।

এ হেনো সুন্দরী তুমি রাজার কুমারী।

বুড়া বর সাধ কর সহিতে না পারি।।

ছাই লাগিবেক গায় দিতে আলিঙ্গন।

কুচনী লইয়া তার কৌতুক রঞ্জন।।[১১]

এটিই তৎকালীন সময়ের প্রকৃত ঘরোয়া চিত্র। কিন্তু পতি যতই খারাপ হোক না কেন, পতিই হল স্ত্রীর একমাত্র গতি; কবি রামানন্দ এখানেই শুনিয়েছেন শুদ্ধাচারের তত্ত্ব-

শুন ল দুর্মতি স্ত্রীর পতি গতি

পতি যে ধাতা বিধাতা।

কায়বাক্য মনে সেবিবে চরণ

পতি সুখ মুক্তি দাতা।।

তাজ্যা হেন পতি কিবা হবে গতি

কোন ঘাটে খাবে জল।[১২]

কিংবা-

গলৎ কুষ্ঠী হন পতি তবু সেবা করে সতী

পতি স্বর্গ নরকের ভাগী।

পতি সতী স্ত্রীর গতি পতি পদে সতী মতি

পুড়্যা মরে পতি পদ লাগি।।[১৩]

এই বাণীই কবি রামানন্দ সমাজের মানুষদের উদ্দেশে শুনিয়েছেন। সেই যুগে দাঁড়িয়ে হয়ত কবির অন্য কিছু বলারও জায়গা ছিল না, নারীদের উপর শত অত্যাচার হলেও তাদের চুপ করে পড়ে থাকতেই হত, অন্য কোনো বিকল্প চিন্তার জায়গা তাদের ভাবনার পরিসরে আসেনি। সমালোচক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থান কী ছিল তা স্পষ্ট করেছেন-'...বাংলার হিন্দু গৃহবধূদের তিনি উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। 'অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত' তিনি উত্তমা, 'হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত' তিনি মধ্যমা, আর 'হিত কৈলে অহিত করয়ে সেই জন' তিনি অধমা।'[১৪] কবি

রামানন্দ-এর সময়ে এর অন্যথা ছিল এমন কথা বলা যায় না। সেই আমলে নারীদের উপর অত্যাচার এবং সতীন সমস্যা ঘরে ঘরে ছিল, তার প্রমাণ আমরা কাব্যে পাই-

ভেদ হৈল ঘরে ঘরে সতীনে কন্দল করে

নীচ রসে কথা হয় কত।

চণ্ডীর মহিমা কব তা লিখিলে ভণ্ড হব

মৃণালে হইব নীচ মত।।[১৫]

সমাজ পুরুষ প্রধান ছিল, প্রয়োজন সাপেক্ষে তারা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করতে পারত, কাব্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সন্তান না থাকার জন্য ধনপতি সদাগর খুল্লনাকে বিবাহ করেছে এবং লহনা তা মেনেও নিয়েছে। আবার সময়ের মধ্যে মেয়েদের বাড়ি ফেরা বা অধিক রাত্রি অবধি ঘরের বাইরে থাকা সমাজের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হত-

খুলনা বলেন রাত্র হইল আসিয়া।

রাত্রে গেল্যে ধরিবে কতেক দোষ দিয়া।।[১৬]

কবি রামানন্দ কাব্যে সবথেকে যুগান্তকারী যে বিষয় প্রতিপাদন করেছেন তা হল কালকেতু নির্মিত গুজরাট নগরে শূদ্রদের অবস্থান। সাধারণত শূদ্ররা নগরের বাইরে অবস্থান করত, স্বাভাবিক জীবনযাপনে তাদের অগ্রাধিকার ছিল না। *মনুসংহিতা* দ্র.১-য় তাদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-আচার সংরক্ষিত হয়েছে। কাব্যে কবি কার্যত এই আচরণবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মনুর বিধানকে পরিহাস করেছেন-

গুজরাট দেশে জাত্যের বিশেষে

মনু দেখ্যা পাবে সুখ।।

গুজরাট দেশে জাত্যের বিশেষে

নাম আছে ভাগে ভাগে।[১৭]

সমালোচক সত্যবতী গিরি-র ভাষায়-'...রামানন্দ এই ঘৃণিত মানুষদেরও ঠাঁই দিয়েছেন তাঁর গুজরাটে। রামানন্দ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের দণ্ডী গোষ্ঠীর ছিলেন। যুগের প্রবণতার সঙ্গে হয়তো বা এখানে সন্ন্যাসীর ঔদার্যেরও পরিচয় আছে। কিন্তু এর ফলে চণ্ডীমঙ্গলের অন্য দুই কবি মুকুন্দ ও মাধবের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব যেন দুই

শতাব্দীর ব্যবধানকেও অতিক্রম করে গেছে।'[১৮] সেযুগে দাঁড়িয়ে কবির এই পদক্ষেপ এক অনন্য নৈতিক জনশিক্ষার সূচক যা এর আগে কোনো কবি দেখানোর সাহস করেনি। এর সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে সময়ের দিক থেকে দুই দশক এগিয়ে এসেছেন কবি রামানন্দ, যে কথা লিখতে গিয়ে কবি মুকুন্দ দোনামনা করছেন দুই দশক পেরিয়ে রামানন্দ-এর কাছে সেই কথা বলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না; কারণ যুগের পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে গেছে মানবিক মূল্যবোধের। সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব থাকলেও ধর্মীয় শিথিলতা পদে পদে লক্ষণীয়। কবি সোচ্চারে সেজন্য বলতে পারেন-

ধর্মপথ রুদ্ধ হৈল ব্রাহ্মণেও মিথ্যা কৈল

পৃথিবীতে হৈল পাপভার।[১৯]

ব্রাহ্মণ ছাড়াই কবি নিম্নশ্রেণি কালকেতুকে দিয়ে শুধুমাত্র জপতপের মাধ্যমেই দেবী চণ্ডীর পূজা সেরেছেন-

হরের পূজার খেদ না করিও আর।

এই লও মন্ত্র যন্ত্র সকলি তোমার।।

কর‍্যো তুমি আপনার জাত্যের আচার।

জপ পূজা কর‍্যো তুষ্টি হইবে আমার।।[২০]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাত-পাতের শিথিলতা কমে আসছিল সেজন্য কবির কাছে এই বাধা অতিক্রম করা অনেকটাই সহজসাধ্য। কবির কাব্যে উল্লেখিত-

জাতি কুল আমরা বিচার নাহি করি।

আচার না লই কিন্তু ভক্তিমাত্র ধরি।।[২১]

জাত-পাতের শিথিলতা যেমন কমে আসছিল তেমনি বাড়ছিল কড়ি মাহাত্ম্যের দর। কালকেতুর মোহর দেখে 'পোৎদার' সেটিকে হস্তগত করার জন্য পিতল বলে অভিহিত করে এবং এই রকম উপার্জন থাকলে রসিকতা বশত সে তার আত্মীয় হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে-

মোহর দেখিয়া বলে বেঙ্গা যে পিত্তল।

ঘষিয়া মাজিয়া বাপা কর‍্যাছ উজ্জ্বল।।

এই যে কারণে বেটা দেখা নাহি পাই।

সতত আসিত হেথা ধর্মকেতু ভাই।।

কোন দেশে ভাইপো করিয়াছ কামাই।

বেটি হৈলে বেটা মোরে করিস জামাই।।[২২]

অর্থাৎ জাত, ধর্ম পরিচয় এগুলোর থেকে বড় হল কড়ি; যার যত কড়ি তার সমাজের গৌরব তত বেশি। তার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে কারোর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কবি তুচ্ছ করলেও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিকভাবে সেইরূপে পাল্টায়নি, কল্যাণের দায়িত্বর ভার সেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উপরেই ন্যস্ত; কাব্যে উল্লেখিত-

কহেন রাজন শুন সর্ব্বজন

ব্রাহ্মণের আজ্ঞা সার।

মনু স্বায়ম্ভূব কৈয়াছেন ধ্রুব

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাজার।।

শূদ্র মন্ত্রী যার রাজ্য নাশ তার

ব্রাহ্মণে করেন হিত্।

রাজ পুরোহিত হবেন পণ্ডিত

ধর্মেতে থাকিবে চিৎ।।

তাঁর আজ্ঞা লবে রাজবৃদ্ধি তবে

কুশলেতে প্রজা রবে।

রাজা শিষ্ট হবে লক্ষ্মী তবে সবে

নৈলে কেনে সৃষ্টি রবে।।[২৩]

এক্ষেত্রে কবি মনুর উপদেশের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। মনুর মতকেই কবি ব্যক্তিগত নৈতিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করেছেন। আরেকটি বিষয় যেটি কবি ভারতচন্দ্রের মত তিনিও এই কাব্যে তুলে ধরেছেন সেটি হল ধর্মীয় সমন্বয়ের চিহ্ন; সমগ্র অষ্টাদশ শতক ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার কাল, সেই যুগে দাঁড়িয়ে *অন্নদামঙ্গল*-এর

কবি যেভাবে ধর্মীয় সংহতির পক্ষে সওয়াল করেছেন তেমনি কবি রামানন্দও শুনিয়েছেন ধর্ম নিরপেক্ষতার আখ্যান। কোনো ধর্মই ছোট নয়, সব ধর্মই শ্রেষ্ঠ। কাব্যে বর্ণিত-

শিব শক্তি এক আত্মা বলে চারিবেদ।

কলির গুরুতে তাও কর‍্যা দেয় ভেদ।।

শিবেতে বিষ্ণুতে ভেদ করে পাপমতি।

রামেতে কৃষ্ণেতে ভেদ কিবা হবে গতি।।[২৪]

সাধারণের জন্য তাই কবির বক্তব্য-

শুন সাধূ সংসারী হইবে যে যে জন।

অবশ্য করিবে পঞ্চ দেবতা পূজন।।

শিব সূর্য্য বিষ্ণু দুর্গা অগ্নি এই পঞ্চ।

গণেশের পূজা আগে কর‍্যা মুখে বঞ্চ।।

সাধু বলে দেশে গিয়া গুরু আজ্ঞা পাই।

তবে যা বলিলা আমি করিব তাহাই।।[২৫]

এইভাবে কবি রামানন্দ-এর কাব্য হয়ে উঠেছে সমসাময়িক যুগের ধারক যা অন্যান্য কবিদের থেকে কিছুটা তাঁকে আলাদা করে রাখে।

রামানন্দের কবি মুকুন্দ-র সমালোচনা এবং কুশীলক বৃত্তি গ্রহণ:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি রামানন্দ আরেকটি কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন, সেটি হল কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী-র কাব্যের সমালোচনা। কবি মুকুন্দ-র কাব্যের বিরুদ্ধে কবির কিছু অভিযোগ স্পষ্ট, যেমন-তাঁর কাব্যে গ্রাম্যতা বা আদি রসের আধিক্য ঘটেছে, যেমন-কবি মুকুন্দ কাব্যে দেবীর বক্ষের বসনের চিত্র বিশ্বকর্মাকে দিয়ে অঙ্কন করিয়েছেন যা কবির কাছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ-

অপমান করে কত আর।

দেবীর বক্ষের পরে বীরগণ চিত্র করে

কাঞ্চলীতে পশু পক্ষী যত।।[২৬]

তারপর কবি মুকুন্দ-র কাব্যে অলৌকিকতা, অবাস্তবে ঘেরা আখ্যান বলে চিহ্নিত করেছেন; ঘন ঘন স্বপাদেশ এসব বিষয় মূঢ়তার নামান্তর বলেই কবি রামানন্দর ধারণা। দেব-দেবী বিষয়ক কাহিনীর ক্ষেত্রেও কবি নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কবি মুকুন্দ-র হর-গৌরীর কলহ বর্ণনাকে কবি ভালো চোখে দেখেননি-

শিব নিন্দা শুন্যা সতী ত্যজ্যাছেন কায়।

গৌরী নিন্দিলেন শিব বল্যা কেহ গায়।।

কন্দল করিয়া গৌরী গেলা মহীপরে।

অন্নবিনা হৈয়া ক্ষীণা এ কথা কি ধরে।।

যতি বলে দুষ্টকথা আমি না লিখিব।

না বুঝিলে তাহারে কিরূপে বুঝাইব।।[২৭]

তাছাড়া কবির ধারণা স্বর্গে যেভাবে ফুলে কাঁটা থাকার দরুন নীলাম্বর শাপগ্রস্ত হয়েছে তা সততই হাস্যকর। স্বর্গে এইরকম পরিবেশ থাকতেই পারে না এবং দেবী চণ্ডীর কালকেতুকে দর্শন এটিও কবির কাছে অদ্ভুত লেগেছে-

মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্রপুরে কাণ্টাবন

ইন্দ্র সুত তাহে তোলে ফুল।

সর্পভূষা শোভে আঁকে পুষ্পের কণ্টকে তাঁকে

দংশিয়া করিল বেয়াকুল।।

আরো শুন অদভুত জন্মিবে ব্যাধের সুত

সেখানে গেলেন ভগবতী।[২৮]

এছাড়া ছন্দের অভাব কাব্যে প্রবল-

ছন্দ দোষ তার যত তাহা দেখাইব কত

মিত্র অক্ষরের আছে লেশ।

গ্রাম্য কথা রাশি রাশি		তাহে তরলেরা ভাসি

মোহিত হৈয়াছে সর্বদেশ।।[২৯]

এছাড়াও নানা দোষে জর্জরিত তাঁর কাব্য, কবি মুকুন্দ-র কাব্যের দোষ ধরতেই যেন তিনি মুখিয়ে আছেন-

বুঝ্যা দেখ মুকুন্দের মতে দোষ যত।

প্রত্যেকে লিখিয়া আমি বুঝাইব কত।।

যে যে ঠায় লিখিলাম তার বিপরীত।

যতি বলে বিবেচনা করিবা পণ্ডিত।।[৩০]

মূলত কবি মুকুন্দের কাব্যের বিরোধিতা করার জন্যেই কবির এই কাব্য লিখিত। এ প্রসঙ্গে বলা যায় কবি মুকুন্দ যে যে বিষয়গুলি সামনে রেখে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার মধ্যে বাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিহিত; এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে স্বর্গের দেব-দেবীরা শুধুমাত্র দেবলোকে শান্তিতে বসবাস করার জায়গায় ষোড়শ শতাব্দীতে ছিলেন না, তাদের দেবত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ভরা পেটে দেবতার গানে অনেক সুলালিত্য ঝংকার তোলা যায় কিন্তু যেখানে মানুষ নিরন্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে সেখানে দেবতা যে নিজের সিংহাসনে অটুট থাকবেন এমন সুনিশ্চিত নিরাপত্তা কেউ হয়তো দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীও মাৎস্যন্যায়ের কাল। কবি ভারতচন্দ্র এই সময় দাঁড়িয়ে যুগবৈশিষ্ট্যকে সম্বল করে লিখলেন *অন্নদামঙ্গল* । কবি রামানন্দ যুগবৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেননি কিন্তু তিনি সেই বিষয়গুলিকে শিল্পসম্মত রূপদান করতে ব্যর্থ; তাই কবির আক্ষেপ-

বর্ণাইতে চাই		শ্রোতা নাহি পাই

তেঞি তুচ্ছ কর্য্যা লেখি

রামানন্দ কয়		পুঁথি করা নয়

লোকের পরীক্ষা দেখি।[৩১]

কবির জীবৎকালেই কবির কাব্য সমাদর পায়নি, বরঞ্চ যাঁর বিরোধিতা করতে কবি সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন তাঁরই কাব্য থেকে কবি রামানন্দ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুম্ভীলক বৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন কয়েকটি উদাহরণ হল-

ক)　　আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে।।[৩২] (কবি মুকুন্দ-র বর্ণনা)

খ)　　আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।[৩৩]　　(কবি মুকুন্দ-র বর্ণনা)

ক)　　আন্যাছে তোমার স্বামী বান্ধ্যা নিজ গুণে।।[৩৪]　(কবি রামানন্দ-র বর্ণনা)

খ)　　আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।।[৩৫]　　(কবি রামানন্দ-র বর্ণনা)

রামানন্দ-র কাব্য বাংলা সাহিত্য জীবিত আছে শুধুমাত্র কবি মুকুন্দ-র বিরোধিতার কারণে, শিল্পগুণে তা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কবি মুকুন্দ-র কাব্য কবি রামানন্দকে নৈতিকভাবে তৃপ্তি দিতে পারেনি, তাই তাঁকে 'গাবর'[৩৬] বলে গাল দিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যে প্রতিবাদ জানালেও তাঁর প্রতিবাদ সর্বজনগ্রাহী হয়নি। অষ্টাদশ শতকে যাঁরাই *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য লিখেছেন তাঁরাই কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী-র ঋণ স্বীকার করে কাব্য লিখেছেন, একমাত্র কবি রামানন্দ বিপরীত পথে হাঁটলেও তিনি সঠিক দিশা দেখাতে পারেননি। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে-'... জীবন-রস অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জীবনের যে নীতি প্রকাশ পায়, তাহাই মঙ্গলকাব্যের নীতি। জীবনের মধ্য দিয়া সেই নীতিবোধের বিকাশ; যেখানে জীবনবোধের সার্থক অভিব্যক্তি নাই, সেখানে কেবল শুষ্ক নীতিকথায় মঙ্গলগানের আসরে শ্রোতা আকর্ষণ করিবার উপায় নাই। রামানন্দ যতি এই কথা বুঝিতে পারেন নাই।'[৩৭]

দ্রষ্টব্য

১. *মনুসংহিতা* -য় দশম অধ্যায় ৫১-৫২ নং শ্লোকে উল্লেখিত-

চণ্ডালশ্বপচানাস্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।

অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্।।

বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।

কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ।।

অর্থ: 'চণ্ডাল এবং চণ্ডালবিশেষ যে শ্বপচ জাতি, ইহাদিগের গ্রামের বাহিরে বাস হইবে। ইহাদিগকে জলপাত্রাদিরহিত করিবে, কুক্কুর ও গর্দ্দভ ইহাদিগের ধন, ইহারা শববস্ত্র পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহের অলঙ্কার ধারণ করিবে, ইহারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করিবে, এক স্থানে থাকিবে না।'

-উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা., *মনুসংহিতা* , বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৭৮।

তথ্যসূত্র

১. বর্ণালী প্রামাণিক, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই কবি-মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি: তুলনামূলক অধ্যয়ন*, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯, পৃ. ৫৫০ ।

২. তদেব,পৃ. ২৫১ ।

৩. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত,*ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭ ।

৪. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১ ।

৫. তদেব, পৃ. ২৫০ ।

৬. অতুল সুর, *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৬২ ।

৭. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দী*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৭১ ।

৮. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯ ।

৯. সত্যবতী গিরি, *চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন কবির পারস্পরিক তুলনা* ; তাপস ভৌমিক সম্পা., *কোরক সাহিত্য পত্রিকা, মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা*, কলকাতা, শারদ ২০১৬, পৃ. ১২০ ।

১০. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২ ।

১১. তদেব, পৃ. ২৮১।

১২. তদেব, পৃ. ৩১৪ ।

১৩. তদেব, পৃ. ৫০৩।

১৪. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়,*প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭)*, কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৩৮ ।

১৫. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯ ।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৭৭।

১৭. তদেব, পৃ. ৩২৯ ।

১৮. সত্যবতী গিরি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯ ।

১৯. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮।

২০. তদেব, পৃ. ৩২০।

২১. তদেব, পৃ. ৩২০।

২২. তদেব, পৃ. ৩২৬।

২৩. তদেব, পৃ. ৪৯৯।

২৪. তদেব, পৃ. ৪২২ ।

২৫. তদেব, পৃ. ৪২২ ।

২৬. তদেব,পৃ. ২৪৯ ।

২৭. তদেব,পৃ. ২৯৮ ।

২৮. তদেব,পৃ. ২৪৮ ।

২৯. তদেব,পৃ. ৩৮৭ ।

৩০. তদেব,পৃ. ৩৪৩ ।

৩১. তদেব,পৃ. ৪৫১-৪৫২ ।

৩২. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পা., *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, ভারবি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৩৩ ।

৩৩. তদেব,পৃ. ১৩৫ ।

৩৪. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮ ।

৩৫. তদেব, পৃ. ৩০৯।

৩৬. তদেব, পৃ. ২৪৯ ।

৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য,*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪৫০-৪৫১ ।

কবি রামানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

কবি রামানন্দ-র ব্যক্তি পরিচয় কাব্যে অনুপস্থিত, সেই ভাবে তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। স্বরূপগত ভাবে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন; সমালোচক সত্যবতী গিরির মতে-'... রামানন্দ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন।'[১] কাব্যে কবি সমন্বয়ের বার্তা দিলেও কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

কাব্যের শুরুতে কবি গণেশ বন্দনা করেছেন। তারপর কবি দেবী সরস্বতীর স্তুতি করেছেন এইভাবে-

বর্ণরূপা সরস্বতী তোমার চরণে নতি
মূল শক্তি বিশ্বের জননী।
আগমেতে এই যুক্তি তোমার স্মরণেতে মুক্তি
কণ্ঠ পদ্মে থাক্যা হও ধ্বনি।।
মন্ত্রমাতা মন্ত্রময়ী স্মরণে শমন জয়ী
মূল পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী।
কোটি সূর্যরূপ হাসি উজ্জ্বলকিরণরাশি
হৃদয় কমলনিবাসিনী।।[২]

তন্ত্রের আগমশাস্ত্রের প্রতিধ্বনি এখানে শোনা যায়-

মূলাধার-স্থিতাং দেবীং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্।
সুপ্তাং প্রোত্থাপ্য তাং শক্ত্যা ক্রমাচ্চক্রাণি ভেদয়েৎ।।
ততঃ পরশিবে নীত্বা সৌধীঞ্চ প্রাপয়েৎ ততঃ।
ঊর্ধ্বং গ্রন্থিং বিনির্ভিদ্য জিত্বা দীপ-স্বরূপিণীম্।।

বীজরূপাং স্বশক্ত্যা তু প্রোল্লসন্তীং পরাত্মিকাম্।

শব্দব্রহ্ম-স্বরূপাঞ্চ নিস্বনাং চিন্তয়েৎ ততঃ।

তৎ-প্রভাপটল-ব্যাপ্তং শরীরং চিন্তয়েৎ ততঃ।।

নিত্যং সহস্রমানেন জপেৎ সংবৎসরং যদি।

ততঃ সংজায়তে মন্ত্রী বাচস্পতিরিবাপরঃ।।

-অর্থাৎ 'সমস্ত জগৎকে সেই গুরুর প্রভাসসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত চিন্তা করিবে। মূলাধারস্থিতা সুপ্তা সেই পরদেবতা দেবী কুণ্ডলিনীকে শক্তি দ্বারা জাগরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে চক্র সমূহ ভেদ করিবেন।

তাহার পর সেই কুণ্ডলিনীকে পরম শিবে লইয়া গিয়া সৌধীকে(সুধাধারাকে) পাওয়াইয়া দিবেন। তাহার পর উর্ধ্ব গ্রন্থি ভেদ করিয়া ও নিজ শক্তি দ্বারা জয় করিয়া দীপ শিখাতুল্যা বীজরূপিণী দীপ্তিময়ী পরস্বরূপা শব্দব্রহ্মময়ী নিস্বনা (শব্দহীনা) কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিবেন।

যদি প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় এক বৎসর মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে তদদ্বারা সাধক দ্বিতীয় বৃহস্পতির ন্যায় হইবেন।'[৩]

সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য-র মতে-' যদিও নিখিল বিশ্বই পরম শিবের শক্তি, তথাপি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন রূপেই শক্তির সমধিক প্রকাশ। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী পাঠ করিতে পাঠকগণ মহাসরস্বতী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই জ্ঞানশক্তি। মহাকালী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই ইচ্ছাশক্তি রবং মহালক্ষ্মী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই ক্রিয়াশক্তি। এই তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সকল বিশ্বই শক্তি-স্বরূপ।'[৪] কবি কাব্যে এই বিষয়কেই তুলে ধরেছেন; দেবী সরস্বতীকে জ্ঞানের আধার, দেবী লক্ষ্মীকে 'ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা'[৫] এবং দেবী চণ্ডীকে দেবী কালিকার সাথে অভিন্ন করে কাব্যে স্থান দিয়েছেন-

ভৈরবী ভবানী ভীমা ভাবিয়া না পাই সীমা

ভদ্রকালী ভয় নিবারিণী।।

কাতরে কালুরে কালী কৃপা কর সুকঙ্কালী

কপার্দিনী কপালি কামিনী।

কৌমোদকী কমলাক্ষী কলিকালে কিছু সাক্ষী

কালু পরে রাখ কমলিনী।।[৬]

কবি কাব্যের বহু জায়গায় দেবী চণ্ডীর বিষয় অবতারণার ক্ষেত্রে শক্তিতত্ত্ব ও তন্ত্রের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। দেবী চণ্ডী স্বয়ং মহাবিদ্যার অংশ; সময়ে সময়ে নানা প্রয়োজনে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন। এক জায়গায় কবি দেবীকে বলেছেন 'মহাবিদ্যা' স্বরূপ-

সতী হৈলা দশতনু মুক্তিধাম মহামনু

স্মরিলে ঘুচয়ে বন্ধপাশ।

আশীলক্ষ মহাবিদ্যা ভাব্যামুনিগণসিদ্ধা

আমি চাই তব পদে বাস।।[৭]

আবার কখনো তিনি সতী রূপে জন্ম নিলে তখন হয়ে যান 'আদ্যাশক্তি ভগবতী'-

মেনকা কি পুণ্যবতী তাঁর গর্ভে আস্যা সতী

জন্মিলেন আদ্যা ভগবতী।।[৮]

আবার তিনি স্থানবিশেষে কবির ভাষায় হয়ে যান-

তন্ত্রনিবাসিনী তর্কবিনাশিনী

তমোগুণপ্রকাশিনী।।

থোদো অক্ষররূপিনী।

দুষ্ট বিনাশিনী দুর্গমবিনাশিনী

দীপনীদক্ষ নন্দিনী।।[৯]

দেবী চণ্ডীর নানা রূপ নানা ভাবে কাব্যে কবি তুলে ধরেছেন। মূল শক্তি এক, কিন্তু প্রকাশ বহু। জগৎ সংসার সৃষ্টির মূলে এই আদ্যাশক্তি; সংসারের স্থিতি ও বিনাশের ইচ্ছাশক্তি তাঁর উপর বর্তায়। তাঁর ইচ্ছাতেই সারা বিশ্ব গতিশীল এবং ক্রমবর্ধমান ধারাতে এগিয়ে যেতে সক্ষম। তিনি দিক প্রদর্শন না করলে সারা বিশ্ব অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকবে। কবির কাব্যের তার ইঙ্গিত উল্লেখিত-

তুমি বিধাতার বিধি আছে সকলের হৃদি

সৃষ্টি স্থিতি সংসারের মূল।

তুমি পাপ তুমি পুণ্য তুমি বিশ্ব তুমি শূন্য

কর্তা কর্ম দিক কাল দেশ।[১০]

শক্তিরূপা দেবী একেধারে সৃষ্টি, স্থিতির মূল আবার পালনকর্ত্রীও বটে; কালকেতু যখন যুদ্ধে বিপদের সম্মুখীন তখন দেবী কালী রূপী চণ্ডী তার উপর কৃপা বর্ষণ করেন, তা নাহলে এই বিপদ থেকে কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না-

দেখ্যা নৃপবর ভাবিত অন্তর

ঝাঁকে ঝাঁকে ছাড়ে শর।

কিছুই না হয় সেনাগণে তয়

গোলা ছাড়ে খরতর।।

কালীর কৃপা কালুরে।[১১]

আবার অন্যত্র তিনি মহাকালরূপী শিবকে ধারণ করে আছেন তার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়-

শুন্যা সকলের বাণী লাজ পায়্যা শূলপাণি

শিশুরূপ হৈলা পশুপতি।

গৃহমাঝে প্রবেশিয়া গৌরীকে আশ্বাস দিয়া

কোলে উঠ্যা করেন বসতি।।[১২]

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা শিব সেই দেবাদিদেব শিবকেই দেবী ধারণ করে আছেন, ফলে জগৎ সৃষ্টির পালন ও ধারক দেবী আদ্যাশক্তি; কবি সেই আদ্যাশক্তিকেই দেবী চণ্ডীরূপে আবাহন করেছেন। তন্ত্রানুসারে নারীই হল জগৎ সংসারের মূল। কবির কাব্যে সেই ইঙ্গিতই ব্যক্ত হয়েছে।

সমালোচক আশুতোষ দাসের মতে- ‘বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছেন নারী, জগজ্জনয়িত্রী মহামায়া- এ তন্ত্রপ্রতিপাদ্য। তিনি স্বয়ংভবা, আদ্যাশক্তি। এক থেকে বহু হলেন আপন সৃজনেচ্ছায়। সৃষ্টিপ্রকরণে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের জননী।

তন্ত্রানুসারে তিনি যখন বিশ্বরূপা তখন ব্রহ্মসনাতনী, যখন প্রলয়রূপা তখন মহাকালী, যখন স্বরূপা তখন পরা (পরাৎপরা), পরমা, পরমেশ্বরী।’[১৩]

কাব্যে কিছু জায়গায় আখ্যানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বর বিষয় উঠে এসেছে। কাব্যের শুরুর দিকে জগতের সৃষ্টি বিষয়ে উঠে এসেছে প্রকৃতি-পুরুষের প্রসঙ্গ-

প্রকৃতি পুরুষ নাম এক বস্তু সর্ব্বধাম
পুরুষচৈতন্য বল্যা গণি।।
দুই নাম রূপহীন প্রকৃতির গুণ তিন
রজ সত্ত্বতম তিন নাম।
তিন গুণময়ী মায়া তিনিও ব্রহ্মোর জায়া
তিনি করিলেন সৃষ্টি কাম।।[১৪]

এখানে প্রকৃতি বলতে বোঝায় চিত্ত বা মন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণের সমান অবস্থা বা সরলীকরণের নাম প্রকৃতি; প্রকৃতিই বুদ্ধির মূল কারণ। অনেক সময় একে মূল প্রকৃতি বলেও অভিহিত করা হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের যৌথ সমন্বয়ে এই জগতের উদ্ভব হয়েছে। সমালোচক মহেন্দ্রনাথ সরকার-এর মতে- ‘...প্রকৃতি সৃজন-শক্তি-পুরুষের সান্নিধ্যে পুরুষকে সৃজন দ্বারা, ভোগ ও লয়ের দ্বারা মোক্ষ দিবার জন্য চেষ্টিত। শক্তির স্পন্দনে সৃষ্টি। পুরুষ তা উপস্থিত হয়ে ভোগ করে। চিত্তের অবসিত অধিকারে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়। তন্ত্র শুদ্ধ-পুরুষে বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্টির বা লয়ের আনন্দ গ্রহণ করেনি। ভোগ ও মোক্ষ, সৃজন ও লয়, তন্ত্র মতে নিত্য শিবে অবস্থিত।’[১৫] তাই শক্তিতত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন-

প্রকৃতি পুরুষে তথা জানিবা অভেদ কথা
এই কথা কবে চারি বেদে।।[১৬]

অপরদিকে দেবী চণ্ডী ধনপতিকে শুনিয়েছে শক্তিতত্ত্বর প্রসঙ্গ-

আমি অর্ধ অঙ্গ থাকি শিব সঙ্গ
আমি মহেশের শক্তি।।
শিবে আমাতে অভেদ।[১৭]

সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী-র মতে-'...তন্ত্রেও যে পরম শিবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, বিকাররহিত, সাক্ষী-'বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ' (প্রয়োগসার)। কিন্তু তন্ত্রমতে শিব পরম শান্ত, পরিস্পন্দহীন হইলেও অতি সূক্ষ্মভাবে স্পন্দনশীল। এই অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন বা ক্রিয়া স্থূলবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব যে আছে, তাহার প্রমাণ সৃষ্টির মধ্যে এই শক্তিস্পন্দনের প্রকাশ। শাক্তমতে-'শক্তি-শান্তিমতোয়-ভেদঃ'। শক্তি ছাড়া শিব নেই, শিব ছাড়া শক্তি নেই।'[১৮] অর্থাৎ কাউকে বাদ দিয়ে জগৎ-সংসারের সৃষ্টি অচল। যারা এই ভেদ করে তারা দিক-বিদিক জ্ঞান রহিত। সাধু ধনপতি দেবী চণ্ডীকে বাদ দিয়ে শুধু শিবকে পুজো করেন, তার ফলেই সে নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়; কারণ শিব ও শক্তি একে অপরের সমার্থক, কাব্যে বর্ণিত-

কেন করে ভেদ না শুন্যাছে বেদ

সদা আমি শক্তিসঙ্গ।।

শক্তি পূজে আগে তবে পাছু ভাগে

আমি পূজা লই তার।[১৯]

তন্ত্রের গূঢ় বিষয় কবি রামানন্দ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন, শক্তি বিনা শিব 'শিবোহপি শবতাং যাতি'[২০], শিব শবতুল্য। আরেকটি বিষয় কবি কাব্যে অবতারণা করেছেন সেটি হল মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রসঙ্গ। দক্ষযজ্ঞের পর শিব মৃত প্রাণীদের মধ্যে আবার প্রাণ সঞ্চার করে তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন-

মৃত সঞ্চারিণী মনে করিলেন শিব।

মর্য্যাছিলা যত প্রাণী সবে পান জীব।।[২১]

এই মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যার উল্লেখ তন্ত্রে পাওয়া যায়। *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*-এ উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষয়টি প্রতিপাদন করার ক্ষেত্রে তন্ত্রোক্ত রীতি-নীতি জানা প্রয়োজনীয়। মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান জানার জন্য শিবের আরেক নাম 'মৃত্যুঞ্জয়', কাব্যে তাই উল্লেখিত-

বেদে বলে মহেশের নাম মৃত্যুঞ্জয়।

তাঁর সেবা করিলে না থাকে মৃত্যুভয়।।[২২]

অপরদিকে দেবাদিদেব শিবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সতী যখন দক্ষের যজ্ঞে যেতে কাতর অনুরোধ জানাচ্ছে শিবকে, তখন শিব তাঁকে বারণ করলে দেবী সতী যুক্তি দেন এইভাবে-

পিতা মোর জ্ঞানবান   তোমাকে না অপমান

করিলেন হৈয়া মুনিজন।।

তিনি তো জানেন বেদ   ব্রহ্মেতে তোমাতে ভেদ

কেনে করিবেন মুনি হৈয়া।[২৩]

তন্ত্রেও দেবাদিদেব শিবকে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন রূপে তুলনা করা হয়েছে। তন্ত্রে উল্লেখিত-

সর্ব্বব্রহ্মা ময়ং দেব ! ব্রহ্ম বদাচরেত সদা

কুলা কুলং ব্রহ্ম রূপং ব্রহ্মাযজ্ঞাত্মকং স্মৃতম।।

যৎ শরীরং ব্রহ্ম রূপং ব্রহ্মতেজঃ প্রপূজিতম।।

-অর্থাৎ ‘ ব্রহ্মময় হে দেব তাই সর্ব্বদা ব্রহ্মবৎ আচরণ করিবে। শিবশক্তি ব্রহ্মরূপ এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রদায়ক।।’[২৪]

কবি কাব্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি বলেছেন-

না হইলে হরিভক্তি   মুক্তি নাহি দেন শক্তি

আগমে কহেন মহেশ্বর।[২৫]

কবি এখানে তন্ত্রের মতকেই কাব্যে প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*-এ উল্লেখিত-

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সর্বার্থ-সাধকান্।

যস্য সংস্মরাৎ সন্তো ভবাব্ধেঃ পারমাশ্রিতা।।

-অর্থাৎ ‘অনন্তর সমস্ত অর্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) সাধক বিষ্ণুর মহামন্ত্র সমূহ বলিব। যাঁহার সম্যক্ স্মরণ হইতে সজ্জনগণ ভব-সমুদ্রের (সংসার সাগরের) পার আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ সংসার রূপ সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন।’[২৬] দ্র.১ কাব্যে কবি শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে বিষ্ণুভক্তি একাত্ম করে পাঠকদের উদ্দেশে পরিবেশন করেছেন। একই সঙ্গে এটি সময়োচিত এবং তন্ত্রোক্ত চিন্তা প্রসূত।

পূজার ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় তন্ত্রের অনুষঙ্গ এসেছে, যেমন দেবী চণ্ডীর পূজার ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা-

স্তব কর্য়া দম্পতী করেন আকুঞ্চন।।

নিত্য ষোড়শোপচারে করেন পূজন।[২৭]

'ষোড়শোপচার' বিষয়টির গভীরে তন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট। তন্ত্রে উল্লেখিত-

পাদ্যমর্ঘং তথাচামং স্নানং বসন-ভূষণে।

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাচমনং ততঃ।।

তাম্বুলমর্চনাস্তোত্রং দর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।

প্রয়োজয়েৎ প্রপূজায়ামুপচারাংস্ত ষোড়শ।।[২৮]

অর্থাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বুল, অর্চনাস্তোত্র, দর্পণ, নমস্কার এই সব মিলিয়ে বলে ষোড়শোপচার। এইভাবে ব্যাধ দম্পতি পূজা সম্পন্ন করেছে।

কবি রামানন্দ সর্বসাধারণের উদ্দেশে বলেছেন-

শুন সাধূ সংসারী হইবে যে যে জন

অবশ্য করিবে পঞ্চ দেবতা পূজন।।

শিব সূর্য্য বিষ্ণু দুর্গা অগ্নি এই পঞ্চ।

গণেশের পূজা আগে কর‍্যা মুখে বঞ্চ।।[২৯]

কবি এও নির্দেশ দিয়েছেন-

প্রভাতে গণেশ মন্ত্র জপিলে পুরাণ তন্ত্র

সিদ্ধি হয় সেই মন্ত্র হেতু।[৩০]

এই পঞ্চদেবতা শক্তি শব্দের সঙ্গে একাত্মক। সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য-র মতে-' বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য-প্রধান এই পঞ্চদেবতাও সেই শক্তি-শব্দের বাচ্য। কেবল শিব জ্ঞেয় হইয়া থাকেন। সগুণ উপাসনার দ্বারা বিশুদ্ধীভূত চিত্তে নির্গুণ শিব-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে।'[৩১] কবি রামানন্দ প্রকারান্তরে শক্তিতত্ত্বেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আবার কবি কাব্যে দেবী সাবিত্রীর প্রসঙ্গ এনেছেন-

সবিতাকে দ্যোতন করেন বেদমাতা।

সাবিত্রী বলিয়া তাঁকে তেঞি কন ধাতা।

ইষ্টদেবে অর্ঘ্যদান করে যেঞি মন্ত্রে।

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কন সর্ব্বতন্ত্রে।।

আদিত্যমণ্ডলে দেব গায়ত্রীর ধ্যানে।

জগতের সাক্ষী আমি এই জানি সীমা।।[৩২]

গায়ত্রীর অপর নাম বেদমাতা, তিনিও শক্তির অংশ। সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য-র মতে-' প্রাতঃকালে তাঁহার নাম গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী এবং সায়াহ্নে সরস্বতী। এই তিনটি ধ্যান হইতে জানা যাইতেছে যে, গায়ত্রী দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তিরূপিণী।'[৩৩] পরোক্ষভাবে এখানে শক্তিতত্ত্বেরই ইঙ্গিত বহন করে।

কাব্যে দেবীর পূজা প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করাচার্য, *কালিকাপুরাণ* এবং *আগম-নিগম* গ্রন্থের কথা স্থানে স্থানে উল্লেখ করেছেন, যেমন-

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কালিকাপূরাণে।

ধর্ম্ম পুরাণেও আছে পণ্ডিতেরা জানে।।[৩৪]

বা

কালী পুরাণের মত চণ্ডীর পূজার পথ

লাঘব ত কৃত্য তত্ত্বে আছে।[৩৫]

কবি তন্ত্রের উল্লেখ বহু স্থানে করেছেন বিশেষত *আগমশাস্ত্র*-র দ্র.২ কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তন্ত্র ও পুরাণ কাহিনীকে অবলম্বন করেই কবি তাঁর কাব্যের আখ্যান তৈরি করেছেন এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্রষ্টব্য

১. *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*-এ উল্লেখিত *বিষ্ণু প্রকরণ শারদাতিলক* গ্রন্থ (পৃ. ৩৯৮) থেকে গৃহীত। সম্ভবত ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে গুর্জরনিবাসী লক্ষ্মণ দেশিক-এর দ্বারা এই গ্রন্থ সংকলিত হয়।

২. *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*-এর সম্ভাব্য রচনাকাল ১৬০৯ শকাব্দ বা ১৬৮৭ সাল।

গ্রন্থস্তৎকৃতি-নির্মিতো গ্রহ-বিয়ৎ-ষট্-চন্দ্র-শাকে মধৌ।

শ্রীমাংস্তত্ত্ববিলাস এষ কৃতীনাং হর্ষায় পূর্ণোহভবৎ।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১. সত্যবতী গিরি, *চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন কবির পারস্পরিক তুলনা* ; তাপস ভৌমিক সম্পা., *কোরক সাহিত্য পত্রিকা, মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা*, কলকাতা, শারদ ২০১৬, পৃ. ১১৯ ।

২. বর্ণালী প্রামাণিক, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই কবি-মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি: তুলনামূলক অধ্যয়ন*, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯, পৃ. ২৩৬।

৩. পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পা. রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৯২৪-৯২৫।

৪. সুখময় ভট্টাচার্য, *তন্ত্রপরিচয়*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭৬।

৫. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

৬. তদেব, পৃ. ৩৩২।

৭. তদেব, পৃ. ২৪৩।

৮. তদেব, পৃ. ২৭২।

৯. তদেব, পৃ. ৩২২।

১০. তদেব, পৃ. ৩২৫।

১১. তদেব, পৃ. ৩৪২।

১২. তদেব, পৃ. ২৮৬।

১৩. আশুতোষ দাস, *মঙ্গলকাব্যে মাতৃকাতন্ত্র* ; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯-৮১, পৃ. ১০১।

১৪. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

১৫. মহেন্দ্রনাথ সরকার, *তন্ত্রের আলো*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৯।

১৬. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।

১৭. তদেব, পৃ. ৪০৮।

১৮. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা*, ডি. এম লাইব্রেরি, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৯৯৩, পৃ. ৯০।

১৯. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯।

২০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় সাধনার ঐক্য*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৮৯৯, পৃ. ২৩।

২১. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

২২. তদেব, পৃ. ৩০১।

২৩. তদেব, পৃ. ২৫৯।

২৪. ভৈরব শ্রীমৎ ত্রিপুরানন্দনাথ ও সুরজিৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পা., *নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৬।

২৫. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০।

২৬. পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পা., পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৯।

২৭. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২।

২৮. পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পা., পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

২৯. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২।

৩০. তদেব, পৃ. ২৯৫।

৩১. সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

৩২. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬।

৩৩. সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৩৪. বর্ণালী প্রামাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১০।

৩৫. তদেব, পৃ. ৩৮৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা পৃ. ১৫৭-১৯৭

- ঘনরাম চক্রবর্তী ১৬০-১৯৭
- মানিকরাম গাঙ্গুলী ১৮০-১৮৮
- রূপরাম চক্রবর্তী ১৮৯-১৯৭

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা

বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখার মধ্যে *ধর্মমঙ্গল* কাব্যধারা অন্যতম। মনসা, চণ্ডী প্রধান মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে নারী দেবী। একমাত্র ধর্মদেবতা পুরুষ দেবতা রূপে কাব্যে বিরাজ করছেন। ধর্ম দেবতার উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে নানা ধর্মের সম্মিলিত প্রভাব এসে এখানে ভিড় করেছে। কোনো নির্দিষ্ট একটি ধর্ম এসে দেবতার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেনি। অনেকের কাছে ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ দেবতা, কারোর কাছে তিনি হিন্দু বিষ্ণু দেবতার অবতার কুর্ম রূপে কল্পিত। *শূন্যপুরাণ* ও ধর্মপূজার বিধান দেখে ধর্মঠাকুরকে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের শ্রেণিভুক্ত করেছেন। সমালোচক সুকুমার সেন ধর্ম দেবতার সঙ্গে সূর্য দেবতার মিল পেয়েছেন। অনেক জায়গায় সূর্যমূর্তি ধর্মঠাকুরের থানে পূজিত হয়। *ধর্মমঙ্গল*-এর কাহিনী হরিশচন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনির সঙ্গে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর হরিশচন্দ্র আখ্যানের সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার কাব্যে দেখা যায় ধর্মঠাকুর কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করছেন এবং সন্তানদাতার ভূমিকাও পালন করছেন। কবি রূপরাম চক্রবর্তী-র কাব্যে লাউসেনের পরিধেয় রাত্রিবাস ধুতি মহামদের সারা মুখে লজ্জার কারণে না বোলানোর জন্য মহামদের ‘মাঝ মুখে রহিল ধর্মের নিদর্শন’[১] অর্থাৎ কুষ্ঠচিহ্ন। তিনি তুষ্ট হলেই সব কিছুর উপশম হবে নচেৎ নয়। সমালোচক সুকুমার সেন-এর সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক সমালোচক এই তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে কোনো একটি ধর্মের সীমানায় ধর্মঠাকুরকে ফেলা যাবে না। বৈদিক ধর্মাচার, শৈবধর্ম, নাথ ধর্ম, সূর্যাপাসনা সব কিছুর প্রভাব এই দেবতার উপরে পড়েছে।

পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ধর্মঠাকুরের উপর পড়েছে। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে- ‘পরবর্তীকালে ইহাতে ইসলামের প্রভাবও প্রত্যক্ষ করা যায়। শূন্যপুরাণের ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’, ধর্মের ব্রত-উপাসনায় ‘জালালি কলিমা’র আবৃত্তি (ছোটো জালালি ও বড়ো জালালি), ফকিরের বেশে নিরঞ্জনের আবির্ভাব প্রভৃতি ইঙ্গিত হইতে দেখা যাইতেছে যে, মুঘলযুগে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মনিরঞ্জনের পরিকল্পনায় কিছু কিছু ইসলামি প্রভাব পড়িয়াছিল।’[২] ধর্মঠাকুরের পূজারীর ক্ষেত্রে যেকোনো ধর্মের লোক তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে; তিনি ডোম, চণ্ডাল, গোয়ালা যে কেউ হতে পারে। এক সময় ধর্মঠাকুরের পূজা নিম্নশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও এই ধর্মঠাকুরের পূজার ভার নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাছে তার স্বীকৃতি মিলেছে যেমন পূজা অর্চনায় তেমনি কাব্য রচনায়। এখানে আলোচিত ঘনরাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, রূপরাম চক্রবর্তী তিনজনই ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও আরো অনেক কবি বিদ্যমান।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব সেভাবে কিছু নেই। কাহিনীর মধ্যে রূপকের আশ্রয় যেমন নিয়েছেন তেমনই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের আখ্যানও ব্যক্ত করেছেন। কাহিনীর মধ্যে বীর রসের ভাব ফুটে উঠলেও গভীরতর মানবিক উপাদান অনুপস্থিত। কাহিনীর মধ্যে তন্ত্রের উপাদান কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়, সেগুলির নিরিখে আলোচনার বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। বর্ণনা ও অলৌকিক কাহিনীর ফাঁকে বহু কবির সক্রিয়তা হারিয়ে গেছে, শুধুমাত্র আখ্যানভাগই থেকে গেছে। পূর্বকবিদের অনুসরণ করতে করতে তাঁদের কাব্যে মৌলিকতার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার ঘনরাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, রূপরাম চক্রবর্তী এখানে আলোচিত হয়েছে। তাঁদের কাব্য কতটা তন্ত্রের উপাদান অনুসৃত হয়েছে সেটিই এখানে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল* , ভারবি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫, পৃ. ৪৩২।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* তৃতীয় খণ্ড: প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮-১৯, পৃ. ১৬৯-১৭০।

ঘনরাম চক্রবর্তী

বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শাখা হল *ধর্মমঙ্গল* । এই ধারায় ঘনরাম চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি। কবির আবির্ভাবকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। বিষ্ণুপাল, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যান্য শাখার কবি এই সময়ের কালপর্বে আর্বিভূত হয়েছিলেন। কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এই সময়কালে থেকে প্রত্যক্ষত সবকিছুই তার কাব্যে স্থান দিয়েছেন ক্রান্তদর্শী কবির মতো। কবির কাব্যে রচনাকাল দিয়েছেন একটু অন্যভাবে। কাব্যের শুরুর নির্দিষ্টকাল কবি ব্যক্ত করেননি-

সঙ্গীত আরম্ভকাল নাইক স্মরণ।

শুন সবে যে কালে হইল সমাপন।।[১]

কাব্যের রচনা সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে কবির বক্তব্য-

শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।

মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।

সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।

যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।।[২]

গণনা করলে দেখা যায় ৮ অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ।$_{দ্র.১}$ সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন-'ঘনরাম ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।'[৩]$_{দ্র.২}$ কবির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কবি উল্লেখ করেছেন রাজা কীর্তিচন্দ্রকে। সমালোচক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে-'...১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে জগৎরামের পুত্র কীর্তিচন্দ্র বর্ধমানের রাজা হন। তিনি ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে বাদশাহী ফরমান পেয়েছিলেন এবং ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরমান লাভ করেছিলেন বাদশাহ মহম্মদ শাহের কাছ থেকে। কীর্তিচন্দ্রের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল বর্ধমানের ইতিহাসে বিশেষ গৌরবময় যুগ।'[৪] আশ্রয়দাতার সময়কালে থাকাকালীন কবি যে এই কাব্য রচনা করেন তা স্পষ্ট।

কাব্যের শুরুতে কবি গণেশ বন্দনার পরে 'ধর্ম্মবন্দনা' করেছেন-

স্বগুণ শরীর ধর বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর

রজঃ সত্ত্ব তমোগুণাধার।।

তুমি সকল তন্ত্রে তন্ত্রী জগন্ময় যন্ত্রে যন্ত্রী

তুমি মন্ত্র মন্ত্রী মহাশয়।[৫]

অর্থাৎ সব দেবতার উপরে সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা নিয়েছেন ধর্মঠাকুর। তাঁর স্বরূপ ভেদ করা সাধারণের সাধ্যের বাইরে। আগম, নিগম, পুরাণ, বেদ সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন। কবি শুরুতেই তাঁকে বলেছেন-'সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন'[৬]। এই শূন্য শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সমালোচক সুকুমার সেন-এর মতে, '...ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। এই শূন্য বৌদ্ধ মহাযান-মতের শূন্য নয়। এখানে শূন্য মানে নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র। ধর্মদেবতা নিষ্কলঙ্ক সর্বশ্বেত, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে সাদা পেঁচা বা সাদা কাক।'[৭] কাব্যানুযায়ী ধর্মঠাকুর স্বগুণ মূর্তিতে 'বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর' রুপ ধারণ করলেন। ধর্মঠাকুর নিজে ব্রহ্মস্বরূপ। অনাদি তার বিস্তার। অপরদিকে শক্তিবন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

তুমি বিঘ্ন বিনাশিনী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী

দাক্ষ্যায়ণী দনুজদলনী।[৮]

এখানে 'দাক্ষ্যায়ণী' বলতে দেবী সতীকে বোঝানো হয়েছে; আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরেক রূপ তিনি। তিনি সারা বিশ্বের 'চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী' এবং সর্বশক্তিরূপা। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস *দেবীভাগবত* -এর মতামতকে উদ্ধৃত করে বলেছেন-'শক্তি সর্বগতা, তাঁকেই ব্রহ্ম বলা হয়। মনীষীরা সগুণা নির্গুণা দ্বিবিধা শক্তির কথা বলেন। সগুণা শক্তি সংসারে অনুরক্ত সাধকদের পূজ্যা এবং নির্গুণা শক্তি সংসারবিরাগি সাধকদের পূজ্যা। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানে ব্যাপারে সেই নিরাকুলা শক্তিই কর্ত্রী।'[৯] কবি এই দেবীরই বন্দনা করেছেন। শাক্তদের মতে শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী। ধর্মঠাকুরও ব্রহ্মস্বরূপ। কোথাও যেন একটি সূক্ষ্ম মিল দেখা যায়। দেবী সরস্বতী বন্দনার ক্ষেত্রে শক্তিতত্ত্বের প্রতিধ্বনি শোনা যায়-

তুমি চতুর্বর্গদাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী

সুখদাত্রী সংসারদায়িনী।

বিষ্ণুরূপা ব্রহ্মময়ী ত্রিজগৎগতিময়ী

কৃপাময়ী কলুষনাশিনী।[১০]

আগম-তত্ত্ব-বিলাস-এ দেবী সরস্বতী বিষয়ে বলা হয়েছে-

অথ বাগীশ্বরীং বক্ষ্যে বাগীশত্ব-প্রদায়িনীম্।

যস্যাঃ প্রসাদাদ্ ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাঃ কর-স্থিতাঃ ।।

অর্থাৎ 'যাঁহার প্রসাদে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ করস্থিত অর্থাৎ অনায়াস-লভ্য হয়, বাগীশত্ব-প্রদায়িনী সেই বাগীশ্বরীকে আমি বলিব।'[১১] কবি এখানে তন্ত্রের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে কবি দেবীকে 'চতুর্বর্গদাত্রী' বলেই উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রের এই সুর কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। দেবী সরস্বতী বন্দনার পাশাপাশি দেবী যোগাদ্যার বন্দনা কবি কাব্যে করেছেন। দেবী যোগাদ্যার বিবরণ সব কাব্যে দেখা যায় না। তন্ত্রগ্রন্থ মতে এই দেবীর স্বরূপ হল-

ভূতধাত্রী মহাদেবী ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠকঃ।

যুগাদ্যা সা মহাবিদ্যা বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে।।[১২]

'ভূতধাত্রী' শব্দের অর্থ যিনি জীবকে ধাত্রী বা মাতার ন্যায় পালন করেন। কবি ঘনরাম কাব্যে সেই ভাবেই আরাধনা করেছেন-

ঊরু গো আসরে আসি ঈশ্বরী অভয়া।

অভয়দায়িনী মা বালকে কর দয়া।।[১৩]

যিনি অভয় দান করেন এবং পালন করেন তিনিই দেবী যোগদ্যা। কবি তন্ত্রের এই সুরকে কাব্যে একাত্ম করে দেখাতে চেয়েছেন। 'গীতারম্ভ' অংশ থেকে কাহিনীর গ্রন্থনা শুরু হয়েছে। শুরুতেই কবি প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবীর স্বরূপ দেখিয়েছেন-

পক্ষীর প্রার্থনা শুনি পরম পুরুষ।

পক্ষীমুখে দিলা প্রভু বদন পীযূষ।।

কিছু খেতে বাড়ে বল মহা সুখোদয়।

কিছু যে পড়িল তায় হয় জলময়।।

নিরাশ্রয়ে হল তবে সৃষ্টি ইচ্ছামতি।

পরমব্রহ্ম বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি।।[১৪]

এভাবে জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর পরমা প্রকৃতি থেকে জন্ম নিল দেবতাগণ-

প্রকৃতি হইতে হল ত্রিগুণআধান।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব জন্মিলা মহান।।[১৫]

এখানে ‘প্রকৃতি’ শব্দের অর্থ ভিন্ন। সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য-র মতে-‘প্রকৃতি শব্দ চিত্তকে বুঝাইয়া থাকে। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতিই বুদ্ধি প্রভৃতির মূল কারণ।’[১৬] কাব্যের উপরিউক্ত অংশে সেই ধ্বনিই উচ্চারিত হয়েছে।

তন্ত্রোক্ত মতে, ঈশ্বর তিনি ‘এই জগৎকে যিনি নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন... ‘আমি বিশ্ব হইতে ভিন্ন’ এই ভাব প্রকাশ পাইলেই সৃষ্টি, পালন ও লয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঈশ্বরই ব্রহ্মাদি-রূপে যথাক্রমে এই তিনটি কর্ম করিয়া থাকেন।’[১৭] কাব্যে এর প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায়-

বিষ্ণুকে কহেন তবে দেব শিরোমণি।

বিধাতা করিবে সৃষ্টি পালিবে আপনি।।

শূলপাণি শেষকালে করিবে সংহার।

হল রজঃ সত্ত্ব তম ত্রিগুণ আধার।।

আজ্ঞা করি অন্তর্দ্ধান আপনি ঈশ্বর।[১৮]

কবি কাব্যে এর পাশাপাশি একথাও জানিয়েছেন যে ‘প্রকৃতি পুরুষ বিনে না হইবে সৃষ্টি’[১৯]। তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়টি কবি এখানে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন। কাব্যের কাহিনী যত এগিয়েছে তন্ত্রের উপাদান আরো লক্ষিত হয়। ‘ঢেকুর পালা’ অংশে ইছাই ঘোষ দেবী ভগবতীর পূজা করছেন। সেখানেও তন্ত্রের অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়-

আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে আরাধিতে হেমযন্ত্রে

মন্ত্রবশে সাক্ষাত পার্ব্বতী।।[২০]

এখানেও দেবীর মহিমা প্রসঙ্গে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের উল্লেখ কবি করেছেন-

তুমি ত্রিলোকের মাতা শক্তি ভক্তি মুক্তিদাতা

বিশ্বগতি ব্রহ্মার জননী।।

প্রলয় পালন সৃষ্টি প্রসবে তোমার দৃষ্টি

তুমি মতি গতি সবাকার।।[২১]

দেবীমাহাত্ম্য-এ দেবীর শক্তিস্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-

র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।

সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।।

-অর্থাৎ ‘আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ। আপনি সত্ত্বাদি গুণময়ী হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত। ব্রহ্ম হইতে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশভূত। কারণ, আপনিই সকলের আধারস্বরূপা। আপনি ষড় বিকার রহিতা পরমা প্রকৃতি।’[২২] কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এই বিষয়কেই কাব্যে উপজীব্য করে তুলেছেন। ‘ঢেকুর পালা’ অংশে দেবীর রুদ্র রূপকেও কবি তুলে ধরেছেন এইভাবে-

নমঃ নারায়ণী নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনী।

নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গাখর্পরধারিণী।।

শিবানী সর্ব্বাণী শান্তি সর্ব্বকৃপাভূতে।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে।।[২৩]

এখানে দেবীকে ‘নারায়ণী’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবীর এই রূপের সমর্থন পাওয়া যায় কালীর রূপের সঙ্গে। *দেবীমাহাত্ম্য*-এ উল্লেখিত-

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।।

বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।

দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।

নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।।

-অর্থাৎ 'দেবীর ভ্রুকুটী-কুটিল ললাটদেশ হইতে শীঘ্র খড়্গ ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী বিনিঃসৃতা হইলেন।

[চণ্ডাদি অসুরগণ অতি তমোগুণী বলিয়া তাহাদের বিনাশার্থ তামসী চামুণ্ডা দেবীর আবির্ভাব হইলেন।]

অম্বিকার ললাটোদ্ভূতা সেই চামুণ্ডা দেবী বিচিত্র নরকংকালধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী,ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিহিতা, অস্থিচর্মমাত্রদেহা, অতিভীষণা, বিশালবদনা, লোলজিহ্বায় ভয়প্রদা, কোটরগত আরক্ত-চক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকট শব্দে দিঙ্মণ্ডলপূর্ণকারিণী।'[২৪] *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর *গণেশখণ্ড*-এ ৭ম অধ্যায়ে উল্লেখিত-

সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা।

মমতুল্যা চ মৃন্ময়া তেন নারয়ণী স্মৃতা।।

-অর্থাৎ 'যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী, প্রকৃতি ও সকলের পরমা জননী এবং যিনি মন্ময়া ও আমার মত শক্তিশালিনী, তিনিই নারায়ণী।'[২৫] পুরাণ মতে, দেবী নারায়ণীই জগতের আধার এবং সৃষ্টিকর্ত্রী। এই দেবীই কবির আরাধ্যা হয়ে উঠেছেন। 'কাঙুর যাত্রা পালা'য় আমরা মহামদের আরাধনায় একইভাবে উঠে এসেছে 'নারায়ণী' প্রসঙ্গ। কাব্যের পরবর্তী অংশে 'শালে ভর পালা'-য় রঞ্জাবতী ধর্মপূজা করেছে তান্ত্রিক উপাচারে-

তাম্রপাত্রে সজল তুলসী তিল কুশ।

সঙ্কল্প করিয়া স্মরে পরম পুরুষ।।

পুঁথি হাতে পুজাবিধি পণ্ডিত প্রকাশে।

আসনাদি ভূতশুদ্ধি বাহ্যবুদ্ধি নাশে।।[২৬]

আলোচ্য অংশে 'ভূতশুদ্ধি' তান্ত্রিক ক্রিয়ার একটি অঙ্গ। 'ভূতশুদ্ধি' হল-'মানবদেহ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতের শোধনকেই বলা হয় ভূতশুদ্ধি। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে শরীরাকারে পরিণত পঞ্চভূতের যে শোধন তার দ্বারা পঞ্চভূত অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই শোধনকেই বলে ভূতশুদ্ধি।'[২৭] আবার 'লাউসেনের জন্ম পালা' অংশে ইন্দা মেটে লাউসেনকে চুরি করার আগে দেবী কালিকাকে পূজা করেছে তন্ত্রমতে-

চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত রক্তজবা দিয়া।

আগমোক্ত পূজে চোর চিত্ত মজাইয়া।।[২৮]

দেবী কালিকার উপাসনা এখানে করলেও এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে দেবী ভদ্রকালীর প্রসঙ্গ। তাঁকে ‘চতুর্ব্বর্গদাতা’ বলা হয়েছে।

মন্ত্র জপ করিতে উঠিলা ভদ্রকালী।।

বর মাগ বাছারে বলেন বিশ্বমাতা।[২৯]

ইন্দা মেটার অনুরোধ দেবীর কাছে-

এসেছি রঙ্গার ঘরে দিতে যাব সিন্দ।

অতেব স্মরণ রাঙ্গা চরণারবিন্দ।।

নগরে না হবে বিঘ্ন লাগিবে নিদুটি।

কেহ যেন না জাগে নির্ভয়ে সিঁদ কাটি।।[৩০]

তন্ত্রে দেবী ভদ্রকালীকে আশু শত্রু দমনের জন্যই অর্চনা করা হয়। তন্ত্রে উল্লেখিত-

প্রয়োগমাত্রং কর্ত্তব্যং বৈরিনিগ্রহকারকম্।

ইয়ং দেবী মহাদেবী শত্রুনিগ্রহকারিণী।

যথেষ্টচিন্তয়া চিন্ত্যা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদা।

-অর্থাৎ ‘এই দেবীর উপাসনা দ্বারা আশু শত্রুদমন হয়। যে ব্যক্তি যেরূপ কামনা করিয়া এই শত্রুদমনকারিণী ভদ্রকালী দেবীকে উপাসনা করে, তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হয়।’[৩১] ইন্দা মেটা নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যই দেবীর স্মরণাপন্ন হয়েছেন। আবার দেবী উপাসনা করেই ইন্দা মেটে চুপ করে থাকেনি, তার সঙ্গে সে প্রয়োগ করেছে ডাকিনী তন্ত্রের মন্ত্র-

আগম ডাকিনীতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।

কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগরে নিদুটি।।[৩২]

ডাকিনী মন্ত্রের প্রয়োগ তন্ত্রপ্রসূত। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* অনুসারে ডাকিনীকে দেবী কালিকার অংশ রূপে বা গণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী-র মতে-‘হিন্দু তন্ত্রে ডাকিনীর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু তিনি প্রধান দেবতার স্থান লাভ করেন নি। মূল শক্তির অংশ বা কলারূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। মূল শক্তি নাদব্রহ্মরূপে সৃষ্টিতে বিরাজ করেন। এই নাদের স্থূল রূপ অ-ক্ষাদি মাতৃকা বর্ণ। ডাকিনী এই মাতৃকা শক্তির একটি প্রকাশ।’[৩৩] এদের

কাজ ও প্রকৃতি দুটোই ভয়ংকর। সাধারণত শিশুর অনিষ্টসাধন, স্তম্ভন, উচাটন, কামসাধন ইত্যাদি কাজে এদের জুড়ি মেলা ভার। উক্ত রচনায় এখানে শিশুর অমঙ্গলের প্রসঙ্গই বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে ডাকিনী মন্ত্রের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।

'আখড়া পালা'-য় দেবীর রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

বিধি বিষ্ণু বামদেব বাসব বরুণ।

ধ্যানে জ্ঞানে না জানে মহিমা কত গুণ।।

বিষ্ণুমায়া ছায়া নিদ্রা তুমি সর্ব্বভূতে।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে।।[৩৪]

কবির এই বক্তব্যের সঙ্গে *দেবীমাহাত্ম্য*-র এই অংশের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়-

হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-

র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।

সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।।

-অর্থাৎ 'আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ। আপনি সত্ত্বাদি গুণময়ী হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের অজ্ঞাত। ব্রহ্ম হইতে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশভূত। কারণ আপনিই সকলের আধারস্বরূপা। আপনি ষড় বিকার রহিতা পরমা প্রকৃতি।[৩৫] 'কামদল বধ পালা'-য় বাঘার দেবীর স্তুতির ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রতিপাদিত হয়েছে। 'গোলাহাট পালা'-য় আমরা সুরিক্ষা-র দেখা পাই। সুরিক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে-

মহাবিদ্যা জপ করে সুরিক্ষা সুন্দরী।।

বীজমন্ত্র জপ করে সুরিক্ষা নটিনী।

নিজরূপে সাক্ষাৎ হইল নারায়ণী।।[৩৬]

এখানে সুরিক্ষা-র কার্যাবলি দেখে সহজেই অনুমেয় সে তন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। নিজে সে কামাখ্যা দেবীর পূজা করে। সুরিক্ষার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তার সামনে প্রকট হন। সুরিক্ষার সম্মুখে দেবী আবির্ভূত হলে সুরিক্ষার দেবী বন্দনায় উঠে এসেছে শক্তি প্রসঙ্গ-

শক্তিরূপা সনাতনী জগতের মাতা।

ত্রিগুণধারিণী তুমি হরিভক্তি দাতা।।[৩৭]

সুরিক্ষার বন্দিত দেবী কামাখ্যার স্বরূপ তন্ত্রে উল্লেখিত-

বরদানন্দদা নিত্যা মহাবিভববর্দ্ধিনী।

সর্ব্বেষাং জননী সাপি সর্ব্বেষাং তারিণী মতা।।

রমণী চৈব সর্ব্বেষাং স্থূলা সূক্ষ্মা শুভা সদা।

-অর্থাৎ 'তিনি নিত্যা বর ও আনন্দদায়িনী এবং মহাবিভববর্দ্ধিনী। তিনি সকলের জননীরূপা এবং সকলের ত্রাণকারিণী। তিনি সর্ব্বদা স্থূল এবং সূক্ষ্ম সমস্তের মূলীভূত শক্তিস্বরূপা এবং শুভদায়িনী।'[৩৮] সুরিক্ষা বর্ণিত শক্তি প্রসঙ্গ এবং তন্ত্রে উল্লেখিত দেবীর স্বরূপ প্রকারান্তরে একই। কাব্যের নায়ক লাউসেন পর্যন্ত তাকে সমীহ করে চলে। সুরিক্ষার কাছে পরমজ্ঞানের সন্ধান না পাওয়া অবধি তার মুক্তি নেই। সমালোচক পীযূষ কান্তি মহাপাত্র এই বিষয়কে 'যৌগিক সাধনার রূপক' [৩৯] দ্র.৩ বলে চিহ্নিত করেছেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি দিক এটি এ সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না। 'কাঙুর যাত্রা পালা'-য় ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন কবি-

প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম   অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম

বিশ্ববীজ অখিল আধান।

সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন   নিরাকার নিরঞ্জন

নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান।[৪০]

সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন-'অব্যক্ত, অব্যয়, চিরন্তন, অনন্ত, অনাদি, কালাতীত, উপাধিহীন, স্বয়ম্ভু, সর্বসৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপী।'[৪১] আবার তন্ত্রমতে, 'সাধনার চরম লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্ম। তন্ত্রে যাকে মন্ত্রের বাচ্যশক্তি বলা হয় তা এই নির্গুণ ব্রহ্ম। আর মন্ত্রের বাচকশক্তি সগুণ ব্রহ্ম। বাচকশক্তির

উপাসনার দ্বারাই বাচ্যশক্তির উপাসনা করতে হয়।'[৪২] শৈব বা তান্ত্রিক মতে ব্রহ্ম=শিবের তুল্য। সারা বিশ্বের আধার ধর্মঠাকুর। তিনি এই জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। তাঁকে ঘিরেই সমস্ত জগত আবর্তিত।

'কাঙুর যাত্রা পালা'-য় এই অংশে উঠে এসেছে ক্ষীরগ্রামের প্রসঙ্গ। কাব্যে উল্লেখিত-

মহাসিদ্ধ পীঠ বলে লিখিয়া পুরাণে।।

জ্বালামুখে মুখ ধায় ক্ষীরগ্রামে স্তন।

কামরূপে যোনি যায় সিদ্ধ যোগিজন।।[৪৩]

এই ক্ষীরগ্রামের প্রসঙ্গ তন্ত্রের নানা গ্রন্থে উল্লেখিত। *কুব্জিকাতন্ত্র, বৃহন্নীলতন্ত্র* ইত্যাদি নানা তন্ত্রে দেবী যোগদ্যা ও ক্ষীরগ্রামের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। *কুব্জিকাতন্ত্র*-এর ৭ম পটলে উল্লেখিত-

ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানিয়াদ্ বামলোচনে।

কামরূপং মহাপীঠং সর্বকাম ফলপ্রদম্।।[৪৪]

কাব্যের পরবর্তী অংশ 'কানড়ার স্বয়ম্বর পালা' অংশে দেবী ভদ্রকালীর প্রসঙ্গ এসেছে। দেবীর রূপ এইরকম ভাবে বর্ণিত হয়েছে-

চায়্যা দেখে সম্মুখে চঞ্চল ভদ্রকালী।

লহ লহ রসনা ভূষণ মুণ্ডমালী।।[৪৫]

দেবীর এই মুণ্ডমালার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর অর্থ হল-'...কর্পূরাদিস্তোত্রের ষষ্ঠ শ্লোকে আছে, 'বাগদেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎ কণ্ঠি-অর্থাৎ মুণ্ডমালা দিয়ে সুশোভিত কণ্ঠশালিনী মা বাগদেবী, অর্থাৎ দেবী শব্দময়ী। শব্দ, বর্ণ, মুখে উচ্চারিত হয় ও বুদ্ধিপূর্বক তা বলা হয় বলে-মুণ্ড হল বর্ণের প্রতীক। তাই মুণ্ডমালা অর্থাৎ বর্ণমালা। মাতৃকা বর্ণ পঞ্চাশটি, মতান্তরে একপঞ্চাশৎ-একান্নটি শব্দ দিয়েই মানুষ ভাব প্রকাশ করে। অধিক কি, শব্দার্থময় জগৎ। নাদস্পন্দন থেকে শব্দের উৎপত্তি, নাদাত্মক জগৎ। সকল নামরূপ শব্দ ও অর্থময় হয়ে মহাশক্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে, তাই কালী আদ্যাশক্তি মুণ্ডমালিনী।'[৪৬]

কাব্যের পরবর্তী অংশে 'কানড়ার বিবাহ পালা'-য় এসেছে চৌষট্টি যোগিনী প্রসঙ্গ। দেবীর সহায়তার জন্য তাঁরা আবির্ভূতা হয়েছেন-

এত বলি নিজ সেনা   চৌষট্টি যোগিনী দানা

হটে হাঁকরিল হৈমবতী।।

বসনহীন কটি কেহ পরে বীরধটী

হাতে জাঠি বিকট দশনা।

সাজিল শ্মশানবাসী ডাকিনী যোগিনী ভাসি

মুক্তকেশী দীঘল রসনা।।[৪৭]

সমালোচক সোমব্রত সরকার জানিয়েছেন-'...তান্ত্রিকগুরুরা বলে থাকেন, অষ্ট মাতৃকা ও তাঁদের চৌষট্টি জন সহচরী সকলে আদ্যাশক্তির অংশ। আদ্যাশক্তিতে জগৎ পরিচালিত হয়। পৃথিবী ধ্বংস হলে আদ্যাশক্তিতে বিলীন হয়ে যাবে অষ্ট মাতৃকা আর চৌষট্টি যোগিনীর শক্তি।'[৪৮] দেবীর সহকারী হিসাবে এঁনাদের আবির্ভাব। দেবীর ইচ্ছায় সব কিছু সংগঠিত হয়। আবার 'ইছাই বধ পালা' অংশে দেবীর নামের তাৎপর্য পাওয়া যায়-

বেদে বলে সদাশিব দেবের দেবতা।

তুমি ত ত্রিপুর তন্ত্রে ত্রিলোকের মাতা।।

পরম বৈষ্ণবী নাম পুরাণে বলাও।[৪৯]

সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস-এর মতে-' এই আদ্যাশক্তিকে শ্রীকুলের উপাসকেরা বলেন, ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা। বামকেশ্বর তন্ত্রার্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবে বলা হয়েছে-ত্রিপুরা পরমা শক্তি। তিনি জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-রূপ জগতের আদ্যা। তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম ত্রৈলোক্যের উৎপত্তিকারিণী মাতৃকা।'[৫০] কাব্যের সমর্থন এই তন্ত্রোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাব্যের অন্যান্য অংশে তন্ত্রোক্ত মতে পূজা পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়-

আবাহন তন্ত্রমন্ত্রে পূজা করি হেমচন্দ্রে

হৈমবতী হোল অধিষ্ঠান।।[৫১]

কাব্যের শেষাংশে আবার আমরা দেখতে পাই শক্তিতত্ত্বের আরাধনা-

তুমি ত্রিলোকের মাতা শক্তি ভক্তি মুক্তিদাতা

ব্রহ্মার জননী বিশ্বপতি।।

প্রলয় পালন সৃষ্টি এসবে তোমার দৃষ্টি

তুমি মতি তুমি গতি গো সবার।।[৫২]

দেবীসূক্ত-এ উল্লেখিত-'আমিই জগতের ঈশ্বরী, রাষ্ট্রী; উপাসকগণের ফলদাত্রী, অতএব যজ্ঞার্হগণমধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ (কেননা, মা-ই চিকিতুষী নিজ আত্মারূপে ব্রহ্মকে তিনিই অনুভব করেন সর্বপ্রথম, অর্থাৎ ভ্রমাবরক আবরণ শক্তি তিনিই, তাই যজমানগণমধ্যে তিনিই প্রথমা); আরো কি, 'আমি প্রপঞ্চরূপে বহুলভাবে অবস্থিত ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা সকল দেশে সর্বভাবে সুরনরাদি যজমানগণ আমাকেই উপাসনা করে।'[৫৩] কাব্যের উপরিউক্ত পঙক্তির সুর আলোচ্য অংশে প্রতিফলিত। কাব্যের শেষাংশে দেবী কালিকার রুদ্র মূর্তির ছবি কবি তুলে ধরেছেন-

হেন কালে নানা মূর্ত্তি উরিলা রঙ্গিণী।।

খড়্গিনী শূলিনী কেহ গদিনী চক্রিণী।

শঙ্খিনী চাপিনী ঘোরা নৃমুণ্ডমালিনী।।

কেহ ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।

কালী কপালিনী কেহ করালবদনা।।[৫৪]

দেবীর রূপ অনুযায়ী দেবী কালিকার একটি রূপভেদ লক্ষণীয়। দক্ষিণাকালীর রূপের সঙ্গে কাব্যের এই রূপ একাত্ম। দক্ষিণাকালীর রূপ অনুযায়ী তিনি করালবদনা এবং ঘোরা। *নির্বাণতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-'দক্ষিণদিকে যমের অবস্থান, কালী নামে যম ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটে পালায়, এই জন্য নাম দক্ষিণা কালী।'[৫৫] সমালোচক অমৃতত্বানন্দ-র মতে-'...তিনি মহাকালেরও কলনধারিণী সমগ্র জগৎকে প্রলয়কালে বীজাকারে নিজ উদরে ধারণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, মহারাত্রি তাই ঘোরা! ঘোর শব্দের অর্থ অন্ধকার। যিনি সংহার করার জন্য ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেন।'[৫৬]

তন্ত্রানুযায়ী আবার দক্ষিণাকালীর ব্যাখ্যা অন্যরকম। তন্ত্রে উল্লেখিত-

পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তি নিগদ্যতে।

বামা যা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী।।

-অর্থাৎ 'পুরুষ দক্ষিণ। বামা হল শক্তি। ভোগকে জয় করে যখন বামা অর্থাৎ নিরোধ-শক্তি প্রধানা হয় তখনই মহামোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং দক্ষিণাকালী ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী। এপ্রসঙ্গে তন্ত্রতত্ত্বের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য-দক্ষিণাঙ্গ বলে পুরুষ দক্ষিণ, বামাঙ্গস্বরূপ বলে শক্তি বামা।'[৫৭]

কাব্যের ‘পশ্চিম উদয় পালা’-য় আবার ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। আমরা কাব্যের পূর্বের অংশে দেখেছি ধর্মঠাকুর সম্পর্কে ‘সগুণ’, ‘নির্গুণ’, ‘ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করলেও এই অংশে ধর্মঠাকুর অন্যান্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন-

তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।[৫৮]

সব দেবতার সম্মিলিত রূপ হিসাবে এখানে ধর্মঠাকুরকে কল্পনা করা হয়েছে। লাউসেন ধর্মপূজা করেছে একটু ভিন্নভাবে। লাউসেন হাকন্দে নিজ দেহ নয় খণ্ডে ছেদন করে কঠোর নবখণ্ড সাধনা করেছিল-

ধর্ম্ম জয় জয় ধ্বনি উঠে উচ্চৈঃস্বরে।

অকাতরে নৃপতি কাটারি নিল করে।।

হাকন্দে যখন হলো গত এক দণ্ডে।

দক্ষিণ উরুর মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে।।[৫৯]

এই বিবরণ দীর্ঘ, সংক্ষেপে এখানে ব্যক্ত করা হল। সমালোচক পীযূষকান্তি মহাপাত্র-র মতে, ‘এইভাবে লাউসেন নবখণ্ডে কঠোর সাধনা করিলেন। এই সাধনা কেবল বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের সাধনাই নহে। ইহার একটি যৌগিক তাৎপর্য আছে। নবখণ্ডে দেহ-সাধনা যৌগিক কায়া-সাধনার নামান্তর।’[৬০] শুধু এখানেই নয়, লাউসেন ও সামুলার কথোপকথনে সাধনার যৌগিক প্রক্রিয়া বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়-

সামুলা বলেন বাছা জলপদ্ম নয়।

স্থলপদ্ম পরমাত্মা পুরুষ আশ্রয়।।

....

সামুলা বলেন বাছা বুঝ ব্রহ্মজ্ঞানে।।

তোমার শরীরে বাপু আছে কত পদ্ম।

শিরসি সহস্রদল সেই ব্রহ্মসদ্ম।

তোমার দুখানি বাহু কমলের ডাঁটা।

লোমাবলী যত কিছু কমলের কাঁটা।।[৬১]

এর অর্থ হল-'...কঠোর দেহ-সাধনা করিয়া সহস্রার পদ্মে ধর্মের পূজা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে পশ্চিমে সূর্যোদয় অর্থাৎ বিপরীত প্রক্রিয়ায় সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। দেহকে নবখণ্ডে ভাগ করিয়া অর্থাৎ নয়টি স্তর পার হইয়া সাধক সহস্রার পদ্মে চেতনা নিবদ্ধ করিলে এক জ্যোতির্ময় আলোকে চিত্তলোক উদ্ভাসিত হয়।'[৬২] তন্ত্রোক্ত সাধনার নামান্তর মাত্র এই যৌগিক সাধনা।

এই ভাবনাকে এই ভাবে ভাবা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিপর্যয়ের কাল রূপে গণ্য করা হয় সেখানে উচ্চ-নীচ দেবতার একটা মিশ্র রূপ এখানে কবি ধর্মঠাকুরকে দেখাতে চেয়েছেন। তৎকালীন সময়ের বিস্তারিত সমাজচিত্র কাব্যে সেভাবে উঠে আসেনি, কিছু কিছু প্রসঙ্গ কাব্যে এসেছে। 'কাঙুর যাত্রা পালা'-য় মহামদের অত্যাচারের ছবি পাওয়া যায়-

অবিচারে ভাঙে রাজ্য গৌড়ের ভুবন।

পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ।।

কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয়।

অধর্ম্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম্মভয়।।[৬৩]

এর বিস্তারিত রূপ আমরা পরবর্তী সময় ভারতচন্দ্র রচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দেখতে পাব। কিন্তু কবি ঘনরামের সময়ে এই চিত্র প্রায় অনুপস্থিত। সম্পাদক ও সমালোচক পীযূষকান্তি মহাপাত্র-র মতে, 'ঘনরাম যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন মুর্শিদকুলীখান তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহার পূর্বে শায়েস্তাখানের আমলে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ ছিল। সেই সমৃদ্ধির কিছু অংশ অবশ্য শায়েস্তাখানের বিলাসে ব্যয়িত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শায়েস্তাখানের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি হয় নাই বা শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নাই।'[৬৪]

অস্থির সময়কাল বুঝে কবি কাব্যে যুগধর্ম উল্লেখ করেছেন যা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে যথাযথ-

শিব শক্তি যুক্তি জীব সবে মুক্তি

কলিকালে হেন পদে।

না বুঝিয়া তত্ত্ব পরদারে মত্ত

মজাইবে মাংস মদে।।

মহতের দায় মিছা দিবে রায়

দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।

কাণে দিয়া মন্ত্র করে কত তন্ত্র

কেবল কড়ির উদ্দেশ।।[৬৫]

কড়ি মাহাত্ম্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিল তার ইঙ্গিত কবি আগেই পাঠকের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছেন। এর পাশাপাশি কাব্যে উঠে এসেছে নারীদের অবস্থান। নারীদের অবস্থা যাই হোক না কেন নারীদের সতী হওয়ার উপদেশ স্বয়ং কাব্যের নায়ক লাউসেন দিয়েছে। স্বামীই তার জগৎ, তার বাইরে তার আর কিছুই নেই-

স্বামীসেবা সব ধর্ম্ম সংসারে কি আছে কর্ম্ম

শুন শুন ওগো কুলবালা।

সেই সাধ্বী কুলকন্যা সেই সে সংসারে ধন্যা

পতি অন্যা মতি নাই যার।[৬৬]

নারীদের হতাশার ছবি একমাত্র নারীদের পতিনিন্দা অংশে প্রতিফলিত হয়। 'জামতি পালা' অংশে বিস্তারিত ভাবে কবি এই ছবি তুলে ধরেছেন। সেই বর্ণনা সুদীর্ঘ। কাব্যে বর্ণিত-

শয়নের কালে স্বামী কাঁপে হালে

মোর কি এ দুখ টুটা।

যদি কিছু বলি করয়ে ব্যাকুলি

দশনে ধরয়ে কুটা।।

ভজিব নাগরে কিবা পাপ ঘরে

স্বামীটা জীয়ন্তে মরা।।[৬৭]

কাব্যে কবি নারীমনের অবদমিত ইচ্ছাকেই তুলে ধরেছেন। তাদের হয়ে সমাজে কেউ বলবার নেই; একমাত্র মঙ্গলকাব্যের কবিরাই নারী মনের ইচ্ছাকে তাদের কাব্যে জায়গা দিয়ে কাব্যকে স্বতন্ত্র মণ্ডিত করে তুলেছেন। কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু কবি নারীদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার পথ খুঁজে পাননি, মধ্যযুগের যুগধর্মকেই তিনি কাব্য স্থান দিয়েছেন অন্যান্যদের মতো-

স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।

ঘরে যেয়ে ভক্তিভাবে ভজ নিজ পতি।।[৬৮]

কাহিনীর বিশালতা, ইতিহাস, সমাজবৈশিষ্ট্য কাব্যকে অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছে। ঘনরামের লিখনশৈলী এবং ঘটনার পারম্পর্যে কাহিনীর গ্রন্থনা এ এক অভিনব কৌশল। অন্যান্য *ধর্মমঙ্গল* কবিদের থেকে ঘনরাম চক্রবর্তী এজন্যই পৃথক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

দ্রষ্টব্য

১. গ্রন্থের সম্পাদক ও সমালোচক পীযূষকান্তি মহাপাত্র-র মতে কবি ঘনরামের কাব্য রচনাকাল ৮ই অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ। সেই মতকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম* (পৃ. ২১২) গ্রন্থে এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম* গ্রন্থে জানিয়েছেন সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন এই তারিখ কবির এক বংশধরের কাছ থেকে পান। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই তারিখ সঠিক হওয়া অসম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন (পৃ. ২১৩)।

৩. গ্রন্থের সম্পাদক ও সমালোচক পীযূষকান্তি মহাপাত্র গ্রন্থের ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন- '...ভারতীয় যৌগিক সাধনায় হেঁয়ালীতে উত্তর প্রত্যুত্তর বিশেষ স্থান অধিকার করিযাছে। গোরখ-বাণীতে দেখা যায় প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়া যৌগিক সাধনার কথা বলা হইয়াছে।' (পৃ. ক ৪৬)

তথ্যসূত্র

১. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., *ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৭১২।

২. তদেব, পৃ. ৭১২।

৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,* ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২১৩।

৪. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রাজসভার কবি ও কাব্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

৫. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৩।

৬. তদেব, পৃ. ৩।

৭. সুকুমার সেন, *প্রবন্ধ সংকলন ৪,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ২৮।

৮. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৫।

৯. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৩৫।

১০. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ১০।

১১. পঞ্চানন শাস্ত্রিণা অনূদিত ও সম্পা., *আগম-তত্ত্ব-বিলাস,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৯০৮।

১২. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৭৭।

১৩. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৯।

১৪. তদেব, পৃ. ১২।

১৫. তদেব, পৃ. ১৩।

১৬. সুখময় ভট্টাচার্য, *তন্ত্রপরিচয়,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৮৪।

১৭. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৪৯।

১৮. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ১৫।

১৯. তদেব, পৃ. ১৫।

২০. তদেব, পৃ. ৫৬।

২১. তদেব, পৃ. ৫৬।

২২. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, *দেবী-মাহাত্ম্য,* শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৯, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

২৩. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৬৬।

২৪. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ঐ, পৃ. ৩৫৮।

২৫. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ঐ, পৃ. ৪৫১-৪৫২।

২৬. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৯৪।

২৭. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৮৫৫।

২৮. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ১২৫।

২৯. তদেব, পৃ. ১২৫।

৩০. তদেব, পৃ. ১২৫।

৩১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৬৭।

৩২. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ১২৬।

৩৩. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *তন্ত্রে ডাকিনী ও ডাকিনী-বিদ্যা* ; সনৎকুমার মিত্র সম্পা., *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* কার্ত্তিক-পৌষ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৩৯৫, পৃ. ১১-১৭।

৩৪. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ১৬৩।

৩৫. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ঐ, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

৩৬. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৭২৩।

৩৭. তদেব, পৃ. ৭২৪।

৩৮. জ্যোতিলাল দাস ও সৌম্যানন্দ নাথ সম্পা., *কামাখ্যাতন্ত্রম্* , নববভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৩।

৩৯. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ক ৫৭।

৪০. তদেব, পৃ. ৩৬৫।

৪১. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা,* ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮, পৃ. ২৫৯।

৪২. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, ঐ, পৃ. ৮২৭।

৪৩. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৩৫৭।

৪৪. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৫৩।

৪৫. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৪১৯।

৪৬. স্বামী অমৃতত্বানন্দ, *শক্তি,* রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৭, পৃ. ৬৯।

৪৭. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৪৫১।

৪৮. সোমব্রত সরকার, *তন্ত্রের চৌষট্টি যোগিনী ও যোগি-যোগিনীদের কথা* , গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১২।

৪৯. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৪৫১।

৫০. উপেন্দ্রকুমার দাস, ঐ , পৃ. ৩৩৫।

৫১. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৬০০।

৫২. তদেব, পৃ. ৬৪৬।

৫৩. স্বামী অমৃতত্বানন্দ, ঐ, পৃ. ২৯।

৫৪. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৬৫৫।

৫৫. স্বামী অমৃতত্বানন্দ, ঐ, পৃ. ৬০।

৫৬. তদেব, পৃ. ৫৯।

৫৭. তদেব, পৃ. ৬০।

৫৮. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., ঐ, পৃ. ৬৮১।

৫৯. তদেব, পৃ. ক ১৬২।

৬০. তদেব, পৃ. ক ১৬৩।

৬১. তদেব, পৃ. ৬৭০।

৬২. তদেব, পৃ. ক ১৬৪।

৬৩. তদেব, পৃ. ৩৫১।

৬৪. তদেব, পৃ. ক ৫০।

৬৫. তদেব, পৃ. ৭০৭।

৬৬. তদেব, পৃ. ৭১০।

৬৭. তদেব, পৃ. ২৫৮।

৬৮. তদেব, পৃ. ২৬৪।

মানিকরাম গাঙ্গুলী

অষ্টাদশ শতাব্দীর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যধারার আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মানিকরাম গাঙ্গুলী। কবির কাব্য রচনার কাল নিয়ে সমালোচক মহলে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা যায়। কবির কাব্যের শেষের দিকে কালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায়-

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।

সিদ্ধসহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে।।

বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।

শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত।।[১]

কবির কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছিলেন ১৪৬৯ শকে অর্থাৎ ১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে।[২] সমালোচক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কবির কাব্যের সম্ভাব্য রচনাকাল ধরেছেন ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে।[৩] কিন্তু এই মতকে খণ্ডন করেছেন সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়।[৪] তাঁর মতে-'...রূপরামের ধর্মমঙ্গল যদি ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ রচিত হয়, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল তার অন্তত পঞ্চাশ বছর পরে লেখা হবে।'[৫]

কাব্যের শুরুতে কবি ধর্মঠাকুরের বন্দনা করেছেন-

তুমি পরাৎপর বিষ্ণু মহেশ্বর

কে আছে তোমার পর।[৬]

দেবতাদের মধ্যে সর্বোত্তম স্তরে আছেন ধর্মঠাকুর। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই জগতে হওয়া সম্ভবপর নয়। গণেশবন্দনা-র পর কবি দুর্গা বন্দনা করেছেন-

সত্ত্বগুণে ব্রহ্মাণী আপনি মহামায়া।

জগতজননী তুমি তুমি সর্বজয়া।।

রজোগুণে বিষ্ণু তুমি তমোগুণে ভব।

সৃজন পালন ধ্বংস তোমা হতে সব।

লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি সুরধনী সীতা।[৭]

দুর্গা বন্দনায় উঠে এসেছে শক্তি প্রসঙ্গ। *দেবীমাহাত্ম্য* -এ উল্লেখিত-

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ

ত্বং বোই প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।।

-অর্থাৎ ‘হে দেবি, আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি, বিষ্ণুর জগৎ পালিনী শক্তি। আপনি বিশ্বের আদি কারণ মহামায়া। আপনি সমগ্র জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন। আবার আপনিই সুপ্রসন্না হইলে ইহলোকে শরাণাগত ভক্তকে মুক্তিপ্রদান করেন।’[৮]দ্র.১ এই দেবীই সর্বভূতে অবস্থিত। দেবী ‘সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।’[৯]দ্র.২ সমালোচক স্বামী প্রজ্ঞানন্দ-র মতে-‘...দেবী দুর্গা নিজেই জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী ও ঐশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মীদেবী। সমগ্র দিনের সার্থকতা যেমন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল নিয়ে, তেমনি তেজঃ ও মহাশক্তিরূপিণী দেবী দুর্গা এবং তিনি পূর্ণ দেবী সরস্বতী ও দেবী লক্ষ্মীকে নিয়ে।’[১০] কবির কাব্যের প্রতিধ্বনি এই উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

কবি ‘শিবঠাকুরের বন্দনা’-য় এনেছেন তন্ত্রের প্রসঙ্গ-

জয় জয় মহেশ্বর মহিমা বিশ্বের পর

মহাতন্ত্রে আদ্য করি মানে।

ভুবন পালনকর্তা ভবসিন্ধু ভয়হর্তা

ভক্তি মুক্তি দেহ ভক্তজনে।।[১১]

সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস-এর মতে-‘শিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সুরেশের স্রষ্টা এবং প্রভু। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বকর্মকৃৎ। তিনি স্বয়ং বপুহীন কিন্তু সমস্ত দেবতাদের বপু ধারণ করান। সমস্ত দেবতা তাঁর স্তব করেন। তিনি এক, বহু শতসহস্র প্রকারে অভিব্যক্ত।’[১২] *কৌলজ্ঞাননির্ণয়তন্ত্র*-এ উল্লেখিত-‘তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, তাঁর মধ্যেই সেই সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়। যাঁর মধ্যে চরাচর লয়প্রাপ্ত হয় তাই লিঙ্গ নামে খ্যাত।’[১৩] দেবাদিদেব শিবের ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বই খাটে। উপরিউক্ত প্রসঙ্গ যথাযথভাবে কবির বন্দনায় কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে।

কবি নিরঞ্জনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে আবার শক্তিতত্ত্বের অবতারণা করেছেন-

শক্তি হল্যা তিন ইথে নাহি ভিন

ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা।

আদ্য আদ্যা সনে তিরোধান মনে

দিএ যোগ জন্য মায়া।[১৪]

কবির এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায় দেবীর রূপ অনেক হলেও সত্তা একই। *দেবীমাহাত্ম্য*-এ উল্লেখিত-

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈবকালে সনাতনী।।

-অর্থাৎ 'সেই জন্মরহিতা সনাতনী দেবীই সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে (ব্রহ্মারূপে) প্রকাশিতা হন, তিনিই স্থিতিশক্তিরূপে (বিষ্ণুরূপে) পালন করেন এবং তিনিই প্রলয়কালে সংহাররূপ (শিবরূপ) ধারণ করেন।'[১৫] 'ব্রহ্মাণী', 'বৈষ্ণবী', 'শিবা' দেবীশক্তির এক একটির প্রকাশ, পুরুষের সঙ্গে মিলিত না হলে জগতের চালিকা শক্তি অচল হয়ে পড়বে। সেই জন্য কবি সৃষ্টির যোগসূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন-

ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার সঙ্গে বিনিময় আগে।

বৈষ্ণবী বিষ্ণুর সহ বসিলেন যোগে।।

রুদ্রাণী রুদ্রের সঙ্গে রহিলেন ভাবে।[১৬]

দেবীর চালনা শক্তির পাশাপাশি দেবীর ভয়াল রূপ কবি কাব্যে দেখিয়েছেন। ঢেকুরের রাজা দেবীকে স্মরণ করেছেন এভাবে-'করাল বদনা কালী খর্পর ধারিণি।'[১৭] দেবীর সংহারিত মূর্তি কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে-

খড়্গাহস্তা খরতরা ক্ষুর (অস্ত্র) ধরি।

নখে খণ্ড খণ্ড ক্ষিপ্র কর ক্ষেমঙ্করী।।

গজারিবাহিনী গৌরী গিরীন্দ্রনন্দিনী।

গড় রক্ষ গুণান্তিকা গণেশ জননী।।[১৮]

এই প্রসঙ্গে *দেবীমাহাত্ম্য*-এর একাদশ অধ্যায়ের ৪৫তম মন্ত্র দ্রষ্টব্য-

রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তবসনা রক্তদন্তিকা।

পতিং নারীবানুরক্তা দেবীভক্তং ভজেজ্জনম্।।

-অর্থাৎ 'তাঁহার তীক্ষ্ম নখগুলি রক্তবর্ণ এবং তিনি রক্ত জিহ্বা ও রক্ত-দ্রংষ্ট্রা। সতী নারী যেমন পতির প্রতি অনুরক্তা হন, তিনি সেইরূপ ভক্তজনের প্রতি অনুরাগিণী (স্নেহশীলা)।'[১৯] সেইরূপ কাব্যে ভক্ত সোমঘোষ-এর প্রতি দেবীর কৃপা বিদ্যমান। দেবীই জগতের আদ্যা শক্তি এবং একই সঙ্গে 'দিগম্বরী'। তিনিই জগতের জননী। কাব্যে উল্লেখিত-

জগৎজননী হই জগতের আদ্যা।

প্রকৃতি প্রধান আমি আমি মহাবিদ্যা।।[২০]

সাধারণত 'মহাবিদ্যা' বলতে বোঝায়- কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা। এঁনারা 'দশমহাবিদ্যা' নামে খ্যাত। দেবী এই সব রূপের মূল। জগতের প্রয়োজনে নানা রূপে তিনি আবর্তিতা হন। সৃষ্টির মূল বলে তিনি জগতের কেন্দ্র স্বরূপ। প্রকৃত অর্থেই তিনি 'জগৎজননী'। তিনি কালকে গ্রাস করেন বলে তিনি কালস্বরূপা। সকলের আদি এবং মূলস্বরূপ তাই তিনি 'আদ্যা'। কাব্যের আরেকটি অংশে দেবীর দশভূজা স্বরূপ প্রকাশে দেবীর সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী শক্তিও প্রকাশিত হয়। কাব্যে উল্লেখিত-

কিঞ্চিতদূর্ধ্ব বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষ উপরে।

অষ্টদিগে অষ্টশক্তি অষ্ট শোভা করে।।[২১]

ডামরতন্ত্র[দ্র.৩]-এ উল্লেখিত ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা- এই অষ্ট নায়িকা 'অষ্টমাতৃকা' রূপে গৃহীত হন। অষ্টদিকে অষ্ট শোভা দেবীর শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। দেবীর এই রূপ প্রকাশ ছাড়াও আরো নানা রূপ বিদ্যমান। কাব্যে উল্লেখিত-

নৃমুণ্ডমালিনী নমোহস্তু নারায়ণী।

চণ্ডিকা চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডা বিঘাতিনী।

নিশুম্ভনাশিনী নমোহস্তু তে নারায়ণী।।

কলুষনাশিনী কালরাত্রি করালিনী।

....

দক্ষের দুহিতা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

বিশ্বের নিদানভূতা বরাহরূপিণী।[২২]

দেবীর 'নৃমুণ্ডমালিনী'-র অর্থ বিদ্যমান। সমালোচক অশোক রায়-এর মতে- 'কালীর গলায় পঞ্চাশৎ (মতান্তরে এক পঞ্চাশ) মুণ্ডমালা। কারণ তিনি শব্দব্রহ্মময়ী, পঞ্চাশদ্ মাতৃকা বর্ণরূপিণী। এই মাতৃকা বর্ণগুলোও আবার নামরূপাত্মক শব্দার্থময় জগতের প্রতিনিধি। সৃষ্টিকালে দেবীর থেকেই শব্দ-শব্দার্থময় জগতের উদ্ভব; আবার প্রলয়কালে-তাঁতেই বিলয়। এই মাতৃকা বর্ণগুলোর প্রত্যেকটাই-বীজমন্ত্র। অর্থাৎ কোনও দেবতার সূক্ষ্মরূপ।'[২৩] আবার এই দেবীই '...মহাকালেরও কলনধারিণী সমগ্র জগৎকে প্রলয়কালে বীজাকারে নিজ উদরে ধারণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, মহারাত্রি তাই ঘোরা! ঘোর শব্দের অর্থ অন্ধকার। যিনি সংহার করার জন্য ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেন।'[২৪] দেবীর সৃষ্টির নিদান স্বরূপ, কাব্যে সেই জন্য দেবীকে বলা হয়েছে 'নিদানভূতা'। কবির বক্তব্য দেবীর অস্ত্র সম্বন্ধে-

কালিকার দণ্ড খড়্গ কালের সমান।[২৫]

দেবীর খড়্গের তাৎপর্য বিদ্যমান। এ খড়্গ মানে '...বিবেক খড়্গ। বিবেক সদসদ্ বিচার। জ্ঞানখড়্গ। খাঁড়া অখণ্ড বস্তুকে খণ্ডিত করে। মায়ায় সদসদ্ মিশ্রিত হয়ে আছে। বিচার করে তাকে আলাদা করতে হবে। বিবেক মানে পার্থক্য করা, আলাদা করা।'[২৬] দেবীর কাল জ্ঞান আছে বলেই তিনি কালিকা। কাব্যে কবি দেবী কালিকার আরেকটি রূপ তুলে ধরেছেন। দেবী ভদ্রকালীর রূপ-

মাথায় মুকুট মণি মুণ্ডমালা গলে।

শবরূপ সদাশিবে পড়ে পদতলে।।[২৭]

দেবীর এরূপ শক্তিতত্ত্বের আরেকটি বিষয়কে স্পষ্ট করে। দেবাদিদেব শিব আর দেবী কালিকার এই অবস্থান শিবশক্তির যুগনদ্ধ রূপকেই ইঙ্গিত করে। *শক্তিসঙ্গমতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-' শিব বলেছেন: দেবীই আমি পুরুষরূপে, স্ত্রীরূপে আমিই দেবী। আমাদের মধ্যে ভেদ নাই। যে-ভেদ কল্পিত হয় তা অজ্ঞানের জন্য হয়।'[২৮] অন্যান্য তন্ত্র গ্রন্থে একই বক্তব্য লিখিত।*গন্ধর্বতন্ত্র* -এ উল্লেখিত-' যিনি শক্তি তিনিই শিব। এঁদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। শিব ছাড়া শক্তি নাই, শক্তি ছাড়া শিব নাই।'[২৯]

কাব্যের দ্বাদশ পালায় কবি চৌতিশা উল্লেখ করেছেন। এটি পরিপূর্ণভাবে শক্তিতত্ত্বের পরিচায়ক-

কএঃ কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী।

করালবদনা কালী কর্পরধারিণী।।

খএঃ খ্যাতিরূপা ক্ষিতিধরসুতা ক্ষেমঙ্করী।

খড়্গাহস্তা খরতরা ক্ষয় কর ঐরি।।[৩০]

এই তালিকা সুদীর্ঘ । সংক্ষেপে এখানে ব্যক্ত করা হল। মানিকরামের কাব্যে পুরাণ, *মহাভারত* ইত্যাদি বর্ণনার প্রাচুর্য বিস্তরিত ভাবে দেখা যায়। তন্ত্রের উপাদান সেক্ষেত্রে নিছকই কম। কিন্তু শক্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন অনেক জায়গায়।

অষ্টাদশ শতাব্দী হল অবক্ষয়ের কাল। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে কবি কাব্য লিখেছেন। প্রজাদের উপর রাজারা তীব্র অত্যাচার করত । মহামদ ক্ষমতা পেয়ে রাজ্যে যে সীমাহীন অনাচার শুরু করেছিল কবি মানিকরাম পুঙ্খানুভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন-

দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত

দোষ বিনে প্রজাগণে দুসখ দেও নিত্য।।

জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।

যে না দেয় তার সদ্য গুণাকার করে।।

ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।

বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব।।[৩১]

কবি ভারতচন্দ্র, গঙ্গারাম দত্ত প্রমুখ কবির পরবর্তী কালের কবি হলেন মানিকরাম গাঙ্গুলী। কবি ঘনরাম চক্রবর্তী-র পরে কবি মানিকরাম গাঙ্গুলী কাব্য রচনা করেন। কিন্তু সামগ্রিক চিত্রটি পাল্টায়নি। সমালোচক বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত দেশের অবস্থার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-‘ শুধু তাই নয়, দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগল। এ দুঃখ বাস্তব মানিকরামের সমসাময়িক লোকের পক্ষে।’[৩২] নারীদের সতীন প্রথা জীবনে বিষবৎ ধারণ করেছিল। কাব্যে বর্ণিত-

সদা সতিনীর সবক্র গতি।

বিনা দোষে জ্বলে বিষের বাতি।।

সহজে সতিনী শেলের কাঁটা।

উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁটা।[৩৩]

কবি ঘনরামের মত কবি মানিকরাম কলিকালের বিবরণ শুনিয়েছেন যা পরোক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগচিহ্নকে বহন করে-

কহিব কলির কথা কর অবধান।।

বেদ ছেড়্যা ব্রাহ্মণ বিষয়ে হবে মত্ত।

প্রতিগৃহে প্রীত সদা পরান্নে প্রবর্ত।

....

চতুরাক্ষে হবেক স্ত্রীয়ের বশ পতি।।

কামিনীর কন্দলে কর্ণের হব বাদ।

চাপিতে স্বামীর কান্ধে সদা মনে সাধ।।[৩৪]

এই অংশ দীর্ঘ। এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল। কাব্যে সক্রিয়তার প্রসঙ্গ খুব কম। ঘনরামের প্রভাব কাব্যে পরোক্ষে পড়েছে। কবি নিজে সংস্কৃত চর্চা করতেন। পুরাণ সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন। কাব্যে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে *রামায়ণ, মহাভারত*-এর আখ্যানের ছায়াও পড়েছে। কাহিনীর গতানুগতিকতা ছাড়া সমাজের নানা ক্রিয়াকলাপ কাব্যে বড় অংশ জুড়ে অধিকার করে রয়েছে। কাহিনীর ভারে কাব্যটির গুণাগুণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

দ্রষ্টব্য

১. সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেবী মহামায়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেছেন- ব্রহ্মার দেহ থেকে একটি নারী মূর্তি প্রকাশিত হয়। এই নারীমূর্তি নিজে তিন ভাগ হয়ে স্বাহা, স্বধা, মহামায়া ইত্যাদি নামে খ্যাত হন। এই মহামায়াই ত্রিমূর্তির জননী। ইনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বরী। (*পৌরাণিকা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০)

২. সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।

ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ।। (*দেবীমাহাত্ম্য*- পৃ. ৪৪৬)

৩. *ডামরতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।

বারাহী নারসিংহ্যৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ।। (*দেবীমাহাত্ম্য*- পৃ. ৪২)

তথ্যসূত্র

১. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ভূমিকা অংশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯।

২. তদেব, পৃ. ৯।

৩. তদেব, পৃ. ১০।

৪. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,* ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২২৮।

৫. তদেব, পৃ. ২২৭।

৬. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১।

৭. তদেব, পৃ. ৪।

৮. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, *দেবী-মাহাত্ম্য,* শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৯, পৃ. ৪৪৬।

৯. তদেব, পৃ. ৪৪৬।

১০. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী,* শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪২৫, পৃ. ৩২০।

১১. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ৭।

১২. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ২০১।

১৩. তদেব, পৃ. ২১৫।

১৪. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ২৫।

১৫. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ঐ, পৃ. ৫০৮।

১৬. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ২৭।

১৭. তদেব, পৃ. ৩৯।

১৮. তদেব, পৃ. ৪০।

১৯. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ঐ, পৃ. ৪৬১।

২০. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, ঐ, পৃ. ১২৮।

২১. তদেব, পৃ. ১৩৫।

২২. তদেব, পৃ. ১৩৬।

২৩. অশোক রায়, *মাতৃকাশক্তি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২০ জানুয়ারি, পৃ. ৬১।

২৪. স্বামী অমৃতত্বানন্দ, *শক্তি*, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৭, পৃ. ৬১।

২৫. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, ঐ, পৃ. ১৪৩।

২৬. স্বামী অমৃতত্বানন্দ, *শক্তি*, ঐ, পৃ. ৬২।

২৭. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, ঐ, পৃ. ২৬৬।

২৮. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৩৯।

২৯. তদেব, পৃ. ৩৩৯।

৩০. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, ঐ, পৃ. ৪৪৫।

৩১. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা., *মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, ভূমিকা অংশ, ঐ, পৃ. ২০।

৩২. তদেব, পৃ. ২১।

৩৩. তদেব, পৃ. ২৩।

৩৪. তদেব, পৃ. ৫৯৯-৬০০।

রূপরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী । সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি রূপরাম চক্রবর্তী ছাড়া যে কয়েকজন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন- রামদাস আদক, যাদুনাথ রায়, সীতারাম দাস। এঁদের তুলনায় কবি রূপরাম চক্রবর্তী-র কাব্য অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী *ধর্মমঙ্গল* কাব্যধারার কবি মানিকরাম গাঙ্গুলী তাঁর কাব্যে কবি রূপরাম চক্রবর্তী-র ঋণ স্বীকার করছেন। সম্ভবত কবির কাব্যের জনপ্রিয়তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই কারণে অন্য কবির কাব্যে এই ধরনের স্বীকৃতি লক্ষ করা যায়।

কবির কাব্যে রচনাকাল নিয়ে সমালোচকমহলে দ্বিধার অবকাশ আছে। কবি কাব্যে কালজ্ঞাপক শ্লোক উল্লেখ করেছেন-

শাকে সিমে জড় হৈলে যত শক হয়।

তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।।

রসের উপরে রস তায় রস দেহ।

এই শকে গীত হৈল লেখা কর‍্যা লেহ।।[১]

কবির কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী নানা সমালোচক নানা সময়কাল গণনা করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কবির কাব্য রচনাকাল ধরেছেন ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ। সুকুমার সেন কাব্য রচনাকাল গণনা করেছেন ১৬৪৯-৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মতে সম্ভাব্য রচনাকাল ১৬৬২-৬৩ খ্রিষ্টাব্দ। কবির 'আত্মকাহিনী' অংশে শাহ সুজার উল্লেখ দেখা যায়-

রাজমহলের অঙ্কে যবে ছিল শুজা।

পরম কল্যাণে তার বৈসে যত প্রজা।।[২]

সমালোচক অক্ষয়কুমার কয়াল-এর মতে-'...শাহ সুজা রাজমহলে ছিলেন ১৬৩৯ এপ্রিল থেকে ১৬৬০ এপ্রিল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই রূপরামের গীত প্রচারিত হয়েছিল, আমরা কেবল এইটুকুই সংবাদ দিতে পারি।'[৩] সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপরিউক্ত মতকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে-'...সুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদারি করিয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ সময়েই তিনি আর্দ্র ভূমি ঢাকা অপেক্ষা ঈষৎ শুষ্ক রাজমহলই অধিকতর পছন্দ করিতেন। সেই সময় হইতে রূপরাম ধর্মের গীত গাহিয়া আসিতেছেন-"সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।"'[৪] আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি এই সময়কালের মধ্যে কবির কাব্য লেখা হয়েছিল।

কাব্যের প্রথম অংশে বন্দনা অংশ উপস্থাপিত হয়েছে। 'গণেশ বন্দনা'-র পর কবি 'ধর্ম-বন্দনা' করেছেন। অন্যান্য কবিদের মত কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্ম ঠাকুরকে 'এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন'[৫] বলে উল্লেখ করেছেন। তারপরের অংশে কবি 'মহামায়া-বন্দনা' করেছেন। এখানে উঠে এসেছে শক্তি প্রসঙ্গ। কাব্যে বর্ণিত-

বন্দো মাতা নারায়ণী কামরূপা কাত্যায়নী করালবদনা হৈমবতী।

শিবানী ইন্দ্রানী শিবা ক্ষেমদাত্রী কালজিহ্বা দূর কর দাসের দুর্গতি।।

উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী সর্বাণী শূলিনী শৈলসুতা।[৬]

এই তালিকা দীর্ঘ। এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল। দেবী নামের নানা ভাব আমরা এখানে দেখতে পাই। সব কিছুর মূলে শক্তির অনুষঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। কবির 'আত্মকাহিনী' অংশে কবির কাব্য রচনার সূত্র উল্লেখ করেছেন। ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম ধরে কবির কাছে এসেছেন এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলি অনুসরণ করতে বলেছেন-

যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত।

সদাই গাইবে গুণ আমার চরিত।।

এত বলি মহাবিদ্যা দিল মোর কানে।

দিবসে আন্ধার দেখি চাহে চারিপানে।।

বলিবারে বচন বিলম্ব সহে নাই।

গলেতে হাড়ের মালা দিলেন গোঁসাই।।[৭]

এখানে বিষয়টি বেশ অভিনব। কবিকে কানে মহামন্ত্র প্রদান করছেন। বিষয়টি যেন সর্বজনগ্রাহ্য নয়। শুধুমাত্র যিনি দীক্ষিত বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তিনি ছাড়া আর কেউ এই 'মহাবিদ্যা' শোনার অধিকারী নয়। তন্ত্রে গুরু শিষ্যকে এভাবে দীক্ষিত করেন। তার কানে একমাত্র মন্ত্র তিনি উত্থাপন করবেন, সর্বসমক্ষে নয়। তন্ত্রে গুরুর ভূমিকা অপরিসীম। তিনিই সঠিক পথ প্রদান করবেন। সমালোচক সোমব্রত সরকার জানিয়েছেন-' জ্ঞান লাভের জন্য চাই একজন জ্ঞানীগুরু। যিনি জ্ঞানপথের নির্দেশটি দেবেন।'[৮] কাব্যে ধর্মঠাকুর সেই দিকই নির্দেশ করেছেন। তন্ত্রোক্ত দীক্ষাদান পদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয়েছে।

'মহাবিদ্যা' জ্ঞান দানের পর কবিকে দিয়েছেন 'হাড়ের মালা'- 'গলেতে হাড়ের মালা দিলেন গোঁসাই।।'[৯] এই হাড়ের মালার একটি তন্ত্রোক্ত তাৎপর্য আছে। দেবী কালিকার গলে এরকম মুণ্ডমালার অবস্থান রয়েছে। একমাত্র গুরুর

পক্ষে সম্ভব এর তাৎপর্য শিষ্যকে শিখিয়ে দেওয়ার। এখানে ধর্মঠাকুর গুরুর অবস্থানে আছেন। সমালোচক সোমব্রত সরকার-এর ভাষায়- 'মায়ের মুণ্ডমালা সুপ্ত রয়েছে এককেকখানি মাতৃকাবর্ণের স্বরূপশক্তি নিয়ে। গুরু এগুলো চিনিয়ে দিলেই দেহে মাতৃকার প্রকাশ অনায়াসে ধরা যাবে।'[১০]

'রঞ্জারবিভাপালা' অংশে মহামন্ত্র প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। পুত্রলাভ করার জন্য রামাঞি পণ্ডিত তাকে মহাবিদ্যা অর্পণ করেন এভাবে-

মহাবিদ্যা গুরু তারে করিল অর্পণ।।

মহাবিদ্যা রঞ্জাবতী শুনে বর্ণ দশ।

দিল বীজ ধর্মের আগম পূজা রস।।

তিন বার বাম কানে করিল অর্পণ।

রামাঞি পণ্ডিত বলে হইবে নন্দন।।[১১]

এভাবে রামাঞি পণ্ডিত রঞ্জাবতীকে শিখিয়েছে কীভাবে জপ করতে হবে-'জপিবে আঙ্গুলে বীজ পূরণ পরব।/ আঙ্গুলে রাখিয়া তবে শিখাইল জপ।।'[১২] বীজমন্ত্র হল তন্ত্রের পরিভাষা। এই বীজমন্ত্র কীভাবে কাজ করবে তাও বলা আছে-'বীজ যখন জ্যোতি, তখনই আজ্ঞাভেদ। দেহভূমি তখন মায়ের মন্দির। যাঁদের এই মন্দিরের চূড়া ভেদ হয়, তাঁদের কোনও মন্দিরের দূর চূড়া দেখতে পেলেই উদ্দীপন হবে।'[১৩] বীজমন্ত্র পাওয়ার আবার শর্ত আছে। তন্ত্রে উল্লেখিত কোনো অদীক্ষিত ব্যক্তি এই মন্ত্রের জন্য যোগ্য মানুষ নন। মন্ত্র পেতে গেলে শুদ্ধ চিত্তে তা গ্রহণ করার রীতি। কাব্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়-

স্নান করি রঞ্জাবতী আইস বিদ্যমান।

শুভক্ষণে তোর কানে মন্ত্র দিব দান।।

অদীক্ষিত জনে দয়া না করে দেবতা।

মন্ত্র উপদেশ হৈলে কয়্যা দিব কথা।।[১৪]

'শালে-ভর পালা' অংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যেভাবে পূজার করার রীতি উল্লেখিত তা তন্ত্রোক্ত প্রসূত। প্রথমে আদ্যপূজা আরম্ভের পর 'ভূতশুদ্ধি' প্রক্রিয়া পুরোপুরি তন্ত্রের ক্রিয়াকেই স্পষ্ট করে-

বেদ উচ্চারিল স্বস্তিবাচকাদি তবে।

আরম্ভিল অর্ঘ্যদান জবাফুল-যবে।

অপরঞ্চ ভূতশুদ্ধি আর অঙ্গন্যাসে।[১৫]

'ভূতশুদ্ধি' হল-'মানবদেহ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতের শোধনকেই বলা হয় ভূতশুদ্ধি। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে শরীরাকারে পরিণত পঞ্চভূতের যে শোধন তার দ্বারা পঞ্চভূত অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই শোধনকেই বলে ভূতশুদ্ধি।'[১৬] 'অঙ্গন্যাস'ও আরো একটি তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া। এই অঙ্গন্যাস দেহ শোধনের একটি বিষয়। তন্ত্রে উল্লেখিত-

অঙ্গানি মায়য়া কুর্য্যাৎ ততো দেবীং বিচিন্তয়েৎ।

কল্পে চ- যদ্ বীজাদ্যা তবেদ্ বিদ্যা তদ্ বীজেনাঙ্গ-কল্পনা।

-অর্থাৎ 'যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন-মায়াবীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর দেবীকে ধ্যান করিবে। কল্পে বলিয়াছেন-যদ্ বীজাদ্যা ভবেদ্ বিদ্যা তদ্ বীজেনাঙ্গকল্পনা। এই বিদ্যা যে বীজাদি হইবে, সেই বীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে।'[১৭] পূজা প্রক্রিয়ার বিষয়টি যে তন্ত্রের উপাদানে সমৃদ্ধ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'লাউসেনচুরিপালা'-য় ইন্দা মেটার প্রসঙ্গ এখানে বলতেই হয়। সে লাউসেনকে চুরি করার সময় মহাবিদ্যা জপ করেছে যাতে চুরির সময় কোনো বিঘ্ন না আসে। সেখানে দেবীর যে রূপ প্রকটিত হয়েছে তা দেবীর রুদ্র রূপকেই সামনে আনে-

কাজলবরণ কালী গলে মুন্ডমালা।

দুহাথে খর্পর কাতি বদন বিশালা।।

পরিসর মড়ার উপরে দুই পা।

নিকটে শিবার শুনি বিপর্যয় রা।।[১৮]

কালীর রূপ উল্লেখিত-

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।।

দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।।

নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।

-অর্থাৎ 'বিনিষ্ক্রান্তা (অম্বিকা দেবীর ললাট থেকে) করালবদনা কালী অসিধারিণী ও পাশহস্তা। তিনি বিচিত্রখট্বাঙ্গধারিণী, নৃমুণ্ডমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা। তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার, বদন অতিবিস্তৃত, জিহ্বা লকলক করছে, তাতে তাঁকে অতিভয়ঙ্করী মনে হচ্ছে। দেবীর আরক্তনয়ন কোটরগ্রস্ত। সিংহনাদে তিনি দিঙ্ মণ্ডল পূর্ণ করছেন।'[১৯] দেবীর এই রূপের সঙ্গে কাব্যে দেবী কালিকার রূপ অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়।

আবার 'গোলাহাটপালা'-য় সুরিক্ষা দেবীর পূজা করে দেবীকে খুশি করার চেষ্টা করেছে। সুরিক্ষা মহাবিদ্যার অধিকারী। তার সামনে স্বয়ং দেবী এসে উপস্থিত হয়েছে। দেবীর রুদ্র রূপই এখানে উঠে এসেছে-

স্মরণ করিতে কালি হইল উপনীতা।।

রূপের প্রতাপে তথা পড়িছে বিজলি।

স্তব করে সুরীক্ষা হইয়া কৃতাঞ্জলি।।

চণ্ডিকা চামুণ্ডা মুণ্ড মথনের কালে।

শিরোমালা বিভূষণ হইল রণস্থলে।।[২০]

আবার একইভাবে 'ইছাইবধপালা' অংশে ইছা ঘোষ দেবীকে স্মরণ করেছে মহাবিদ্যা মন্ত্র সহযোগে পূজার মাধ্যমে। এখানেও দেবী তার ভক্তকে দেখা দিয়েছে মুণ্ডমালা পরিধান করে-

চামুণ্ডা চণ্ডিকা মাতা মথনের কালে।

মুণ্ডমালা কৌতুকে পরিলে রণস্থলে।।[২১]

উভয় ক্ষেত্রেই দেবী এসে ভক্তকে আশ্বাস দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ মহাবীর লাউসেন। ইছা ঘোষ দেবী পূজা করে যুদ্ধে জয়লাভ করে গড়ে গিয়ে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করেছে আশু শত্রু নাশ হয়েছে এই ভেবে। 'কানড়াবিভাপালা' অংশে দেবী দুর্গার যুদ্ধ যাত্রার ছবি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন-

রণমধ্যে জয়দুর্গা উরিলা আপনি।

সঙ্গেতে উরিল তার চৌষট্টি যোগিনী।[২২]

শুধুমাত্র দেবী একাকী যুদ্ধ করছেন না। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দেবীর সহযোগী শক্তি একই ভাবে যুদ্ধে সামিল হয়েছে। দেবীদের এই সংগ্রাম শক্তিতত্ত্বের ইঙ্গিতকেই সূচিত করে। কবির বর্ণনায়-

কার্তিকেয়ী মউরে ইন্দ্রাণী ঐরাবতে।

ব্রহ্মাণী হংসেরে পিঠে কমন্ডলু হাথে।।

বৃষপৃষ্ঠে শিবানী ত্রিশুল শোভা করে।

গরুড়ে বৈষ্ণবী যুঝে বিপদ সাগরে।।[২৩]

কাব্যে শক্তিতত্ত্বের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়গুলি কবি তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়ে নারী মনের বিষয়কে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রাধান্য দেয়নি। তাদের চাহিদা মনের মধ্যে অবদমিত ভাবেই থেকে গেছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে তাদের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। লাউসেনকে দেখে তাদের খেদোক্তি-

কেহ বলে ঝাঁপ দিব সাগরের জলে।

এহেন সুন্দর স্বামী পাব কোথা গেলে।।

দারিদ্র আমার স্বামী বিশেষ যন্ত্রণা।

আর সখী বলে সই মোর স্বামী কানা।।

হাথ ঠারে কথা কহি নাই বুঝে পতি।

কুবচনে কালি হৈল কাঞ্চন মূরতি।।[২৪]

এ বিবরণ সুদীর্ঘ। আরেকটি বিষয় কবি এখানে তুলে ধরেছেন। বিলাস-ব্যসনে তাড়িত হয়ে অনেকেই সমাজে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। কালু কাব্যে বীরত্ব ব্যঞ্জক চরিত্র। সে লাউসেনকে বলেছে-

মদ মাংস নাহি তথা বলে দুবরাজ।

কালুডোম বলে তবে স্বর্গে নাঞি কাজ।।[২৫]

সে স্বর্গে যেতে রাজি নয় কারণ সেখানে সুরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস নেই বলে। কাব্যের চরিত্রগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। কবি রূপরাম চক্রবর্তী-র আগে কাহিনীর এই রূপ সুবিন্যস্ত রূপ অন্য কোনো কবির কাব্যে দেখা যায়নি। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মতে-'...ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে এমন একটি গুণ দেখতে পাওয়া

যায়, যা প্রাচীন সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ; এই কাহিনীতে একটি অখণ্ড সমগ্রতা ও ঐক্য বিরাজমান-অবান্তর উপাদানের সমাবেশ ও অহেতুক বিস্তারে কাহিনীটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। রূপরামের *ধর্মমঙ্গল*-এর কাহিনীতেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয়েছে।'[২৬]

কাব্যে তন্ত্রের উপাদান খুবই কম। বৃহত্তর অর্থে সেই রূপ দর্শন অনুপস্থিত। কাব্য জুড়ে কবির পাণ্ডিত্য যেমন প্রকাশিত হয়েছে তার পাশাপাশি কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে অলৌকিক ঘটনাবলি। কাব্যে কবি কিছু রূপকধর্মী আখ্যানের অবতারণা করেছেন যা অন্যান্য কবিদের কাব্য দুর্লভ। এই কাহিনী একান্ত ভাবেই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে-'...লোকমুখে প্রচলিত অসম্বন্ধ ব্যালাডকে রূপরামই সম্ভবত একটি দীর্ঘ বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের রূপ দিয়াছিলেন, যাহাতে ধর্মাচরণ ও ভক্তিরস অপেক্ষা দুঃসাহসিক ঘটনা ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে।'[২৭]

তথ্যসূত্র

১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল* , ভারবি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫, পৃ. ৪৩৪।

২. তদেব, পৃ. ৫০।

৩. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ।

৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* তৃতীয় খণ্ড: প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮-১৯, পৃ. ২১০।

৫. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ৪২।

৬. তদেব, পৃ. ৪২।

৭. তদেব, পৃ. ৪৯।

৮. সোমব্রত সরকার, *মাতৃকা রহস্য,* সিসৃক্ষা, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩৯,।

৯. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ৪৯।

১০. সোমব্রত সরকার, *মাতৃকা রহস্য,* ঐ, পৃ. ১০০।

১১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ৮৪।

১২. তদেব, পৃ. ৮৪।

১৩. সোমব্রত সরকার, *মাতৃকা রহস্য,* ঐ, পৃ. ৩৬।

১৪. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ৮৩- ৮৪।

১৫. তদেব, পৃ. ১০১।

১৬. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৬৭।

১৭. রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভটাচার্য কৃত ও পঞ্চানন শাস্ত্রি অনূদিত, *আগম-তত্ত্ব-বিলাস,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৯৪৭।

১৮. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল* , ঐ, পৃ. ১২৭।

১৯. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪৯০, ৫৪৭।

২০. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ. ২২৬।

২১. তদেব, পৃ. ৩৩৬।

২২. তদেব, পৃ. ৩১০।

২৩. তদেব, পৃ. ৩১১।

২৪. তদেব, পৃ. ২০১।

২৫. তদেব, পৃ. ৪৩৪।

২৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *রূপরামের কাব্যের সাহিত্যমূল্য* ; অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ঐ, পৃ.

২৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* তৃতীয় খণ্ড: প্রথম পর্ব, ঐ, পৃ. ২১১।

তৃতীয় অধ্যায়: অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

অপ্রধানমঙ্গলকাব্য	পৃ. ১৯৮-৩৫৩

অন্নদামঙ্গল	১৯৯-২৪৭
কালিকামঙ্গল	২৪৮-৩১৯
গোসানীমঙ্গল	৩২০-৩২৭
বাশুলীমঙ্গল	৩২৮-৩৪৩
শীতলামঙ্গল	৩৪৪-৩৫৩

অন্নদামঙ্গল

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ পরম্পরা যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে এই যুগে কিছু কিছু অবিসংবাদী প্রশ্ন উঠে আসে। প্রথমত, প্রশ্ন ওঠে- সেই সময়ে সমাজ কি রকম ছিল, অর্থাৎ সমাজের রীতি-নীতি, চাহিদা, যুগপরিবেশ এবং শৃঙ্খলার মানদণ্ড স্বরূপ কার হাতে চাবিকাঠি গচ্ছিত ছিল। দ্বিতীয়ত ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন, কোন ধর্মকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ জীবনধারণ করত বা কোনো বিশেষ ধর্ম সাধনা এই সময়ে বিস্তার লাভ করে কিনা তাও এখানে আলোচনার বিষয়াধীন। ধর্ম ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। ধর্ম মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে, সঠিক দিক নির্ণয়ের কাজে সহায়ক হয় আর সমাজ তাকে পরিশীলিত করে, সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করে; তাই কাউকে আলাদা করে বিচার-বিশ্লেষণ করা সঠিক পন্থা নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সময় ও পরিবেশ উভয়ই সাধারণ মানুষের অনুকূল নয়। একদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজসিংহাসন টালমাটাল অপরদিকে বর্গী আক্রমণের মতো ভয়ংকর, দুর্বিষহ পরিবেশ বাংলার বুকে ঘনায়মান কালরাত্রির মতো নেমে এসেছিল। সাধারণ মানুষ একদিকে রাজশাসনের নামে অপশাসনের সম্মুখে প্রতিদিন লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছিল, অপরদিকে কালাপাহাড়ের মতো বর্গীর অত্যাচার প্রতিনিয়ত সাধারণ জনমানসকে জাঁতাকলে পিষ্ট করছিল। এরই মধ্যে ধর্ম নিয়ে মানুষের নিরন্তর সংকট, সমাজের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয় সাধারণ মানুষকে সরাসরি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য করছিল। সমাজে স্থিতিশীলতা অপেক্ষা সাধারণ মানুষ সবসময় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিল যে কোন শক্তি বা ধর্ম তাদের মননের সহায়ক হবে বা স্থিরতা প্রদান করবে। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা এক ধর্মের অপর ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ক্রমেই এই সময় বিলীয়মান বিন্দুর মত মানুষের মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছিল; সেইজন্য সাধারণ মানুষের অভীষ্ট ছিল এই ভরাডুবি থেকে উদ্ধার করবে এমন এক শক্তি যা তাদের পথ চলার সহায়ক হবে।

এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে এই যুগ বৈশিষ্ট্যকে বহন করে যেসব কবিরা কাব্যরচনা করেছেন তাঁরা কেউই এই যুগদায়কে এড়িয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেননি। প্রত্যেক কবিই এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুচারু শিল্পীর মত তাঁদের কাব্যে বয়ন করেছেন। *শিবায়ন*-এর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে *মহারাষ্ট্রপুরাণ* রচয়িতা গঙ্গারাম দত্ত প্রত্যেকেই এই অস্থির সময়ের সাক্ষী ছিলেন, যুগজিজ্ঞাসাকে তাঁদের কাব্যে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে শিব, মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর ব্যতিরেকে অন্যান্য যেসব দেবতাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে সেগুলিকে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রূপে ধরা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রচিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম মাষ্টারপিস। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করলেও দেবী অন্নদার হাত ধরে সমাজ তথা ধর্মের সাধারণ জনমানসের অন্বেষণ সতত আমাদের মুগ্ধ করে; রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর যাকে আখ্যা দিয়েছেন-‘রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।’[১]

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে আরো একজন কবির নাম পাই যিনি হয়তো প্রধান মঙ্গলকাব্যধারার কবি ছিলেন না কিন্তু বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল কাব্যধারায় তাঁর নাম পাই, তিনি হলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর খ্যাতি মূলত শাক্ত কাব্যধারায় থাকলেও যুগবৈশিষ্ট্য বা মানুষের প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার সংকট কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তিনি এ যুগের বিকৃত, কদাকার রূপকে তুলে ধরেছেন, তেমনি দেখাতে চেয়েছেন মানুষের এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার আকুল বাসনা। জগৎমাতা বা বিশ্বজননীকে তিনি এই প্রশ্নই বারবার করেছেন সাধারণ মানুষ এই সংকট থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে।

রামপ্রসাদ সেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সরাসরি রাজসভার সাথে যুক্ত ছিলেন না, সেক্ষেত্রে রাজপরিবারের প্রতি দায়পালন করার মতো দায়িত্বও তাঁর ছিল না। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে সে দায়িত্ব ছিল; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন। সেই আদেশে তিনি *অন্নদামঙ্গল* কাব্যরচনায় ব্রতী হন। ভারতচন্দ্র নিজেও এই অস্থির সময়ে ভুক্তভোগী ছিলেন। বর্ধমানের রাজা খাজনা না দিতে পারার জন্য তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভাগ্য অন্বেষণের জন্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে এলে তাঁর সূত্রেই কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ঠাঁই হয়। মাসিক চল্লিশ টাকার বিনিময়ে পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্রের মন যুগিয়ে চলা তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। পোষ্টা যেরকমই হন না কেন তাকে খুশি করাই সভাকবির একমাত্র কর্তব্য। তারই ফলশ্রুতি রূপে রচিত হয় *অন্নদামঙ্গল* কাব্য।

কবি ভারতচন্দ্র যেহেতু ভাগ্যের বিড়ম্বনা নিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় এসেছিলেন, তাই তাঁর কবিত্বশক্তি তাঁর নিজের মতো করে বিকাশ করার সুযোগ পাননি। কাব্যে সব জায়গায় টিপ্পনীর মতো রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমোদন উপস্থিত। সেই অনুমোদন ছাড়া কাব্যের চরিত্র বা ঘটনা বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিকে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। শত হোক তিনি রাজার সভাকবি কিন্তু কবির মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রকে মনে রাখতে হয়েছিল পূর্ববর্তী জীবন। সেই জীবনের থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতি পদক্ষেপে তিনি সতর্ক থেকেছেন যাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অখুশি না হন। রাজাকে খুশি করার তাগিদে কবি *অন্নদামঙ্গল*-এ রাজার বংশলতিকা পৌরাণিক ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠা করেন; তার সঙ্গে যুক্ত হয় দেবীর আশিস। কিন্তু ভারতচন্দ্র রাজকবি হলেও রাজবংশের ভালো-মন্দ উভয়ের সাথেই পরিচিত ছিলেন। ব্যঙ্গ-চাতুর্য যাঁর হাতে স্বভাব সিদ্ধভাবেই প্রবহমান সে যে রাজার গুণ গান গাওয়ার সাথে সাথে তীক্ষ্ণ শাণিত বিদ্রূপ ছুঁড়ে দেবে না, এ কখনই হতে পারে না। আমরা দেখি ‘ব্রহ্মাদির তপ’ অংশে-

কুবের ছাড়িয়া ভোগ
আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।[২]

কুবেরের অনুচর বসুন্ধর অভিশাপ পায় অকালে স্ত্রী সংসর্গ করার জন্য। কুবেরের পুত্র নলকুবর সরাসরি বিলাসে মত্ত থাকার জন্য দেবীপূজা অগ্রাহ্য করে-

এ সুখযামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক।।[৩]

নলকুবের অভিশাপগ্রস্ত হয়েও রতি বিষয়ে মর্ত্যে এসেও বিস্মৃত হয়নি। 'ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ' অংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়-

ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিল মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার।।[৪]

অর্থাৎ পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্রের মান রাখতে কবি ভারতচন্দ্র পৌরাণিক আবহে রাজবংশের বংশ কৌলিন্যকে অভিষিক্ত করলেও বংশের পূর্বপুরুষদের ভোগ-সংসক্ত পরিচয়ের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন তাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। ভবানন্দ মজুমদার-এর উত্তর পুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরবর্তীকালে সপারিষদবর্গ আদিরসাত্মক গল্প শুনতে চাইবেন কবির কাছ থেকে এ আর আশ্চর্যের কী! কবি ভারতচন্দ্র সুকৌশলে এর ইঙ্গিত কাব্যে তুলে ধরেছেন।

কবি রাজাজ্ঞা যেমন পালন করেছেন তেমনি সমাজ ও সময়ের অস্থিরচিত্ততাকেও লক্ষ করেছেন নিপুণভাবে। বর্গী আক্রমণের নৃশংসতা, ধর্ম নিয়ে যুগসংকট, বিশ্বাসহীনতা, সর্বোপরি মানুষে মানুষে ক্ষমতার লড়াই, আগ্রাসন সব কিছুই দু'হাত ভরে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি নিজে যেহেতু ভুক্তভোগী তাই অন্নের হাহাকার বা অন্নকষ্ট কী তা সহজেই তাঁর মানসচক্ষে ধরা পড়েছে। তিনি বোঝেন খালি পেটে ধর্মবোধ থাকে না, দু'বেলা দু'মুঠো অন্নর কী মাহাত্ম্য সেটি রাজবাড়ির জনগণ না বুঝলেও কবি ভারতচন্দ্র বোঝেন। সময়ের উপযোগী সেইজন্য গীত রচনা করা অবশ্য কর্তব্য। ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-এর পৃষ্ঠপোষকতায় সেই কাব্যই তুলে ধরলেন।

দেবী অন্নদা সেইজন্য সময় ও যুগোপযোগী সেই দেবী যে নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেয়; যেখানে ঈশ্বরী পাটনীর মতো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ অর্থমোহের পরিবর্তে আকাঙ্ক্ষা করে উত্তরপুরুষের স্বাচ্ছন্দ্যের-

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।।[৫]

এবার *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করা যাক। *অন্নদামঙ্গল* কাব্য তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্ম, শিবের সঙ্গে বিবাহ ও সাংসারিক জীবন, অন্নপূর্ণা দেবীর প্রকাশ, কাশী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত যুক্ত হয়েছে। গঙ্গার পশ্চিম এবং গাঙ্গিনীর পূর্ব তীরবর্তী বড়গাছি গ্রামের অধিবাসী কিভাবে দেবীর কৃপায় ঘুঁটে বিক্রেতা থেকে লক্ষপতি হল এবং শেষজীবনে দুই পত্নীসহ কলহ বিবাদের ফলে দেবী অন্নপূর্ণা তার নিবাস ছেড়ে ভবানন্দ মজুমদার-এর উপর কৃপা বর্ষণের উদ্দ্যোগী হল তার উল্লেখ আছে। এখানেই প্রথম অংশের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে।

দ্বিতীয় অংশে কবি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অবতারণা করেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ কবি এই কাহিনী সংযোজন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান দ্বিতীয় অংশ জুড়ে পুরোটাই রয়েছে। কবি সংযোগসূত্র হিসাবে ভবানন্দকে দাঁড় করিয়ে বর্ধমানে আগত মানসিংহ সুন্দরের সুড়ঙ্গ খনন দেখিয়ে কাহিনী বিবৃত করেছেন। মূলত এই অংশের বিস্তৃত আলোচনা এখানে স্থগিত রাখব। *কালিকামঙ্গল* অধ্যায়ে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা করার অভিপ্রায় রাখি।

তৃতীয় অংশে কবি কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। কল্পনার ছায়া এখানে এই অংশে থাকলেও কবি সুকৌশলে তা ব্যক্ত করেছেন। মানসিংহ কিভাবে ভবানন্দের সহায়তায় রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করলেন এবং পরবর্তীকালে ভবানন্দকে খেলাত দেবার জন্য দিল্লি নিয়ে যাওয়া, সেখানে দিল্লির সুলতান জাহাঙ্গীরের কাছে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন ও পরিশেষে ভবানন্দের রাজা খেতাব পাওয়ার বিস্তৃত কাহিনী এই অংশে বিদ্যমান।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে কবি পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। যে যুগপরিবেশে কবি কাব্য লিখছেন সেই পরিবেশ মানুষের পক্ষে অনুকূল নয়। নিরন্ন মানুষের হাহাকার যেমন তিনি লক্ষ করেছেন তেমনি নিজেও সেই পরিস্থিতির সঙ্গে একত্রীভূত থেকেছেন একসময়। দেবী অন্নদার পরিকল্পনা কবি পোষ্টার কথামাফিক করলেও দেবী অন্নদা কবির মানস প্রতিমা। দেবী অন্নদার স্বরূপ লক্ষ করলে দেখা যাবে-'শিববন্দিতা ও শিবপ্রতিষ্ঠিত কাশীর অধিষ্ঠিত দেবী অন্নপূর্ণা বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী দেবীর সাথে অভিন্না। তিনি গৌরী; তিনি উমা, সতী

এবং শঙ্করগেহিনী শঙ্করী এবং এ সমস্তই পরমাপ্রকৃতি আদ্যাদেবীর বিভিন্ন রূপ। শঙ্করাচার্যও তাঁর বিখ্যাত অন্নপূর্ণাস্তোত্রে বলেছেন-

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।

অর্থাৎ পুরাণ ও তন্ত্রের আলোকে, দেখা যায়, বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন দেবী শক্তি উপাসনা ও দেবীকল্পনার বিভিন্ন ধারা বেয়ে ক্রমশ শিবের সঙ্গে শিবগেহিনীরূপে সম্পর্কিত হয়ে অবশেষে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাদেবীর সত্তায় মিলিত হয়ে গেছেন নিঃশেষে।'[৬]

আবার *লক্ষ্মীতন্ত্র* -এ দেবী অন্নদার স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকেশা চ পার্বতী।।
শাকম্ভরীং স্তবন ধ্যায়ন শক্র সংপূজন নমন্।
অক্ষয়ামশ্নুতে ভূতিমন্নং পানং ভবান্তরে।।

-'শতাক্ষী শাকম্ভরী দেবীই দুর্গা, উমা, সতী, চণ্ডী, কালীকেশা ও পার্বতী নামে খ্যাতা। হে ইন্দ্র! শাকম্ভরীকে স্তব-ধ্যান-পূজা ও প্রণাম করিলে অন্যজন্মে অক্ষয় অন্ন, পান ও ঐশ্বর্য লাভ হয়।'[৭] কবি এই দেবীরই আবাহন করেছেন কাব্যে-

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাহার ছায়া
পরাৎপর পরম প্রকৃতি।।
অনিবার্য্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি।।
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।।[৮]

কবি ভারতচন্দ্র দেবী অন্নপূর্ণার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন, তা কাব্যে তিনি স্বীকার করেছেন। ‘অন্নপূর্ণা-বন্দনা’ অংশে তিনি জানিয়েছেন-

বিস্তার অন্নদাকল্পে কত গুণ কব অল্পে
নিজগুণে হব বরদায়।[৯]

অন্নদাকল্পতন্ত্র ও একান্ন পীঠের বর্ণনায় কবি *তন্ত্রচূড়ামণি* গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। কবির বর্ণনায়-

করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পুজিলা ভব হইলা ভৈরব।।
একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রমত।।[১০]

কবি পুরাণ-তন্ত্রের আলোকে কাহিনীর বিন্যাস করেছিলেন কিন্তু কাব্যে তা ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজচিত্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ধর্মমত পোষণ করতেন সেই জন্য কবি দেবীর বিবরণে ও কাহিনীর বিন্যাসে শক্তি প্রসঙ্গ ও তন্ত্রের উপাদান যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন। কবির বর্ণনায়-

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল।।[১১]

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত গ্রন্থে এর স্বপক্ষে প্রমাণও পাওয়া যায়-‘রাজারা শাক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহারা পুরাণোক্ত বিবিধ অবতারের ধাতু প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত বিস্তর ভূমি দান করিয়াছেন। কালী, কৃষ্ণ উভয়েরই প্রতি ইঁহাদের নির্বিশেষ ভক্তি ছিল। ইঁহারা কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিতেন।’[১২] কিন্তু কবি এটিও মাথায় রেখেছিলেন যে তার পোষ্টা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মমত বিদ্বেষী ছিলেন, তাই কবির কাব্যে গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু, কৌষিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী দেবীর বন্দনা থাকলেও, চৈতন্য বন্দনা স্থান পায়নি। সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী-র মতে-‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শক্তির উপাসক.তাঁহার প্রত্যক্ষ পোষকতায় অষ্টাদশ শতকে শাক্তাচার ব্যাপক প্রসার লাভ করে।’[১৩] এক্ষেত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছাকে মান্যতা দেওয়া ছাড়া কবি ভারতচন্দ্রের আর অন্য কোনো অভিপ্রায় ছিল না।

পোষ্টাকে রাগিয়ে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, তাই কবি স্বপ্নাদেশের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব এনেছেন। সাধারণত কবিরা স্বপ্নাদেশ পান দেবীর, তারই আদেশে কবিরা কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে কাব্যে দেখা যায় দেবী কবিকে স্বপ্নে দেখা দিলেন পরলোকগতা নিজের মায়ের রুপে। কবির দেবীকে স্বপ্নে দেখার চেয়ে নিজের মাকে দেখা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রথমে তা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নে দেবী অন্নপূর্ণা সেই আদেশ দেন, তারপর রাজা আদেশ দিলে কবি *অন্নদামঙ্গল* কাব্য লেখার কাজ শুরু করেন; অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে দেবীর যোগাযোগ কতটা প্রত্যক্ষ এটা যাতে সবার সামনে আসে সেই ব্যবস্থাই এখানে করা হয়েছে। রাজা যেহেতু পোষ্টা তাই সবই সম্ভব। তাই সেক্ষেত্রে দেবী অন্নপূর্ণার কাহিনী নির্মাণের বিষয়ে রাজার অভীষ্ট ধর্ম তন্ত্রমতকে প্রাধান্য দেবেন এতে আর আশ্চর্য কী !

কাব্যে বর্গী আক্রমণের প্রসঙ্গ এসেছে অন্যভাবে। সেখানে মোগলদের দৌরাত্ম্য রুখতে বাংলাদেশে বর্গীর উপদ্রব ঘটেছে, তারই আবহ রচনা করেছেন কবি। মোগলদের অত্যাচার দেখে নন্দী ক্রোধবশত মহাদেবকে অবগত করলে মহাদেব নন্দীকে রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিতকে স্বপ্ন দেওয়ার নির্দেশ দেন। ভাস্কর পণ্ডিত সেই নির্দেশ মত বাংলায় আক্রমণ করে এবং বিস্তর লুঠকার্য চালায়। সেই বর্ণনা খুবই সংক্ষেপে কবি দিয়েছেন এবং ফলশ্রুতিরূপে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বারো লক্ষ টাকা খাজনা দিতে না পারার কারণে কারাগারে নিক্ষেপ করার কথাও কবি বলেছেন। এরই সঙ্গে মিল রেখে কবি দেবী অন্নপূর্ণার প্রসঙ্গ এনেছেন এবং দেবী নির্দেশ দিয়েছেন-

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।।
আমার মঙ্গল-গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস।।
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি-ব্যবস্থায়।।[১৪]

দেবীর পূজার কাল এখানে নির্দেশ করা হয়েছে। *বৃহৎতন্ত্রসার* গ্রন্থে অন্নদা পূজার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-

তারশ্চ ভুবনেশানী শ্রীবীজং কামবীজকম্।
হৃদন্তে ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ঠযুগলং বিদ্যেয়ং বিংশদক্ষয়ী।
তথা চ কল্পে- কামবীজং বিনা দেবি শ্রীবীজপূর্ব্বিকা যদা।
ঊনবিংশাক্ষরী দেবী ধনধান্যসমৃদ্ধিদা।।

-'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা এই বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে অন্নপূর্ণা ভৈরবীর আরাধনা করিবে অর্থাৎ প্রণব, ভুবনেশ্বরী-বীজ, শ্রীবীজ, কামবীজ পরে নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা বলিলেই এই মন্ত্র হয়। কল্পে লিখিত আছে, উক্ত মন্ত্রের কামবীজ পরিত্যাগ করিলে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা এই ঊনবিংশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ ও উক্ত মন্ত্রে দেবতার পূজা করিলে ধনধান্যাদি ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হয়।'[১৫] বিস্তারিতভাবে *বৃহৎতন্ত্রসার* গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। কবি কাব্যের শুরুতে 'শিব-বন্দনা' অংশে বলেছেন-

অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদচ্ছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান।।
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়ামুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।[১৬]

তন্ত্র মতে জীবমাত্রেই শিব স্বরূপ, কিন্তু জগতের মায়া, মোহের কারণে জীব আত্মজ্ঞানহীন এবং কর্মচক্রে বারবার জন্মগ্রহণ করে। যদি জীব সাধনার দ্বারা মায়ামুক্ত হয় তাহলে শিবত্ব লাভ করতে পারে।*কুলার্ণবতন্ত্র*-এ বলা হয়েছে-

জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধঃ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।।

-'জীব শিব। শিব জীব। সেই জীব অদ্বিতীয় শিব। পাশবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর পাশমুক্ত হলে সদাশিব।'[১৭]

আবার কবির 'অন্নপূর্ণা-বন্দনা' অংশে উল্লেখ করেছেন-

রক্ত-সরসিজোপরি বসি পদ্মাসন করি
পদতলে নব রবি দেখা।
রক্তজবা-প্রভা হর অতি মনোহরতর
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ উর্দ্ধরেখা।।

বাম করতলে ধরি কারণ-অমৃত ভরি

পানপাত্র রতন-নির্ম্মিত।

রত্ন-হাতা ডানি-হাতে সঘৃত পলান্ন তাতে

কিবা দুই ভুজ সুললিত।[১৮]

এই অংশটি *অন্নদাকল্পতন্ত্র*-এ ধ্যানমন্ত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত-

বামে মানিক্যচষকং কারণামৃতপূরিতম্।

রত্নদর্ব্বিং দক্ষ করে পলান্নঘৃতপূরিতাম্।।

পায়য়ন্তীং শিবং তীর্থং ভোজয়ন্তীং পল্লান্নকম।

পীত্বা ভুক্ত্বানন্দময়ং নৃত্যন্তং শশিশেখরম্।।

বিলোক্য হৃষ্ট্যাং পদ্মান্তঃ ষট্ কোণান্তর্নিষেদুষীম্।

মুক্তাহারলসত্তুঙ্গ-কুচযুগ্মমনোহরাম্।।[১৯]

কবি সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়টি 'গীতারম্ভ' অংশে বলেছেন। শিবই যে এই জগত সংসারের মূল নিয়ন্ত্রণ কর্তা, তার ইঙ্গিত কবি এখানে দিয়েছেন; তার সঙ্গে সতী রূপ প্রকৃতি মিলে এই সমগ্র পৃথিবীকে একে একে সৃষ্টি করেছেন তার কথাও কবি এখানে বলেছেন-

দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে পশিলা মর্ম্ম

ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।

পতিরূপ পশুপতি দুজনে সন্তুষ্ট অতি

ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা।।[২০]

তন্ত্র মতে, পরমাপ্রকৃতির গুণক্ষোভের ফলে সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণকে আশ্রয় করে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আবির্ভাব। মহাশক্তিই এই সৃষ্টির মূল কারণ। তিনি সগুণা আবার তিনিই নির্গুণা।*অন্নদাকল্পতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

সৃজামি পালয়ামীতি সংহরামি পুনঃ পুনঃ।

সচ্চিদানন্দবিভবঃ প্রকৃতিঃ কারণং মম।।

তস্মাত্তু প্রকৃতের্ম্মূলং কারণং নৈব দৃশ্যতে।

নির্গুণা সগুণা দ্বেধা সগুণা সা ত্রিধা মতা।।

-'সচ্চিদানন্দ-বিভূতি আমি ব্রহ্মরূপে যে সৃষ্টি করি, বিষ্ণুরূপে যে পালন করি ও রুদ্ররূপে যে সংহার কার্য্য সম্পাদন করি, মূল প্রকৃতি মহামায়া তাহার প্রেরয়িত্রী জানিবে। তিনি নিজেই ঈশ্বরী, তাঁহার প্রেরয়িতা বা ঈশ্বর কেহ নাই। তিনি উপাসকদিগের অধিকার ভেদে সগুণা ও নির্গুণা হইয়া থাকেন।'[২১] কাব্যের 'গীতারম্ভ' অংশে কবি তারই ধারণা দিয়েছেন। এইজন্য দেবী আদ্যাশক্তি বা মহামায়ার দ্যোতক রূপে কাব্যে বর্ণিত-

নিগম আগমে তুমি নিরুপমকায়া।
ত্রিগুণ-জননী পুনঃ ত্রিদেবের ছায়া।।[২২]

'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ' অংশে সতীর নানা রূপের বর্ণনা দিয়েছেন, শক্তিদেবতার নানাপ্রকার মূর্তিরূপের মধ্যে দশমহাবিদ্যা রূপ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত, তার মধ্যে একটি হল-দক্ষযজ্ঞে শিব আমন্ত্রিত হওয়া না সত্ত্বেও সতী সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে; শিব নিষেধ করলে অনুমতি পাবার জন্য সতী ভয়ঙ্করী দশটি রূপ শিবকে দর্শন করিয়েছিলেন। এটি 'দশমহাবিদ্যা' নামে খ্যাত।*প্রাণতোষণীতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা।।[২৩]

অপরদিকে *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* অনুসারে দক্ষালয়ে গমনের পূর্বে দেবীর তৃতীয় নয়ন থেকে আগুন নির্গত হয়। দেবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে হয় কালী বা শ্যামা। এই মূর্তি দেখে মহাদেব শঙ্কিত হয়ে পালানোর সময়ে দশদিকে মূর্তি দর্শন করেন। এটিও দশমহাবিদ্যার রূপ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী মহাবিদ্যা দশৈব তাঃ।।[২৪]

কবি ভারতচন্দ্র দুটি কাহিনীকেই সযত্নে কাব্যে গ্রহণ করেছেন। দেবীর নাম ভিন্ন হলেও স্বরূপে তাঁরা একই। তন্ত্রে এর সমর্থন মেলে-

যথা কালী তথা তারা তথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরবী ভুবনা বিদ্যা ছিন্না চ বগলামুখী।।
ধূমাবতী চান্নপূর্ণা দুর্গা চ কমলাত্মিকা।
মাতঙ্গী ধনদা পদ্মাবতী সর্বার্থসিদ্ধিদা।।

-‘কালী যেরূপ, তারাও সেইরূপ, ত্রিপুর-সুন্দরীও সেইরূপ; ইহাঁদের মধ্যে কোনই তারতম্য নাই। মহাবিদ্যা ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী, ধূমাবতী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কমলা, মাতঙ্গী, ধনদা পদ্মাবতী-ইহাঁরা সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।’[২৫] এখানে কবি কালী-তারাদি দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনা করেছেন তন্ত্রানুসারে। কালী রূপের বর্ণনায় কবি বলেছেন-

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দস্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শব কর্ণপূরা।।
গলিত রুধির-ধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধিরমুণ্ড বাম করতলে।।
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান।।
লোহজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট বিলাসে।।[২৬]

উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্ত কালীধ্যানেরই প্রতিরূপ-

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূর্জাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
সদ্যশ্চিন শিরঃ খড়গবামাধোর্দ্ধকরামুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং।
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং
কনঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদধিরার্চিতাং।
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং।
ঘোরদংশট্রাং করল্যাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসনমুখীং।[২৭]

তারা রূপের ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা-

নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করাল-বদনা।
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা।।
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল।।
নীল পদ্ম খড়গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর।[২৮]

তারাস্তোত্রম্-এর প্রতিরূপই অনুসরণ করেছেন কবি-

মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে, প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে, খড়গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে।।

-'হে জননী, নীলসরস্বতী যাহাকে তোমাকে প্রণাম করে, তাহাদিগকে সৌভাগ্যসম্পদ প্রদান করিয়া থাক; শবরূপী হরের হৃদয়ে প্রত্যালীঢ় পদে সহাস্য বদনে রহিয়াছে-প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় তোমার তিনটি নয়ন; চারিহস্তে কর্ত্রিকা, নরকপাল, উৎপল ও খড়গ ধারণ করিতেছ, তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্রী ঈশ্বরী তোমাকে আশ্রয় করি।'[২৯]

ভুবনেশ্বরীর ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা-

রক্তাবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ-বরাভয়ে শোভে চারিভুজ।।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলঝল।।[৩০]

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে ভুবনেশ্বরীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে-

জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্।

চন্দ্ররেখাং জটাজটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীম্।
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতীর্ধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ে।।

-'ভুবনেশ্বরী ভৈরবী জবাপুষ্প ও দাড়িম্বপুষ্পবৎ রক্তবর্ণা। ইঁহার ললাটে শশিকলা ও মস্তকে জটাভার। ইনি ত্রিনেত্রা, রক্তবর্ণবস্ত্রপরিধানা ও নানা অলংকারে বিভূষিতা।'[৩১]

রাজরাজেশ্বরী রূপের ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা-

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে মধুকর।
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর।।
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেতনিয়মিত বসিবার মঞ্চ।।[৩২]

রাজরাজেশ্বরী হল দেবী ষোড়শীর আরেক নাম। ষোড়শীর উল্লেখ তন্ত্রের বহু জায়গায় পাওয়া যায়। তন্ত্রানুযায়ী ষোড়শী বিদ্যা এবং মহা ষোড়শী বিদ্যা শ্রীবিদ্যার অন্তর্গত। *বৃহৎতন্ত্রসার* গ্রন্থে উল্লেখিত-

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহাং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ে।।

-'প্রভাতসূর্যমন্ডলের বর্ণবিশিষ্টা চতুর্বাহুযুক্তা ত্রিনয়না পাশ, অংকুশ, শর ও ধনুররধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি।'[৩৩]

ভৈরবী রূপের ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা-

রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালী গলে নানা ভূষণ-ভূষণা।।
অক্ষমালা পুঁথি বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট-উপর।।[৩৪]

দেবী ভৈরবী কালী, ব্রহ্মাণীর মিশ্রিত রূপ। *বৃহৎতন্ত্রসার* অনুসারে 'ভৈরবী আরাধনায় সাধক লক্ষ্মীর আধার হয়, পলাশকুসুম দ্বারা ভৈরবীর হোম করলে সাধক বাকসিদ্ধি লাভ করেন, চন্দনাক্ত বকুল ও মালতীফুল দিয়ে ভৈরবীর হোম করলে সাধক এক বৎসরের মধ্যে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন ঘৃতাক্ত অন্ন দ্বারা হোম করলে অন্নলাভ হয়।'[৩৫]

ছিন্নমস্তা রূপের ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা-

বিপরীত রতে রত রতিকামোপরী।
কোকনদ-বরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী।।
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে।।
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিনধার।
একধারা নিজ মুখে করেন আহার।।
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তার শব আরোহিণী।।[৩৬]

তন্ত্রানুসারে ছিন্নমস্তা এইরূপ- 'কোটিসূর্যপ্রভাতুল্যা, বামহাস্তে নিজের মস্তক ধারণ করে লোল জিহ্বা সহ মুখব্যাদান করে নিজের কণ্ঠ নির্গত রক্তধারা পানে রতা, কেশপাশ চতুর্দিকে বিকীর্ণ, নানা পুষ্পশোভিতা, ডানহাতে কাতরি, মুণ্ডমালাভূষিতা, নগ্না, মহাঘোরা, বামপদ অগ্রে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে স্থাপন করে দণ্ডায়মানা, অস্থিমালাধারিণী, সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিহিতা, রতি আকাঙ্ক্ষায় স্থিতা, সদা ষোড়শীবর্ষীয়া পীনোন্নতস্তনী, বিপরীত রতিতে আসক্তা, বামে ডাকিনী ও দক্ষিণে বর্ণিনী দেবীর গলদেশ নির্গত রক্তপানে রতা।'[৩৭] ছিন্নমস্তার কাহিনী *প্রাণতোষণীতন্ত্র*-গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

ধূমাবতী প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা-

ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন।।
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ় ধূম্রের বরণ।
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা।।[৩৮]

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে ধূমাবতীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে-

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনস্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা।

-'ধূমাবতী দেবী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা ও দীর্ঘাঙ্গী। ইঁহার পরিহিত বস্ত্র মলিন, কেশকলাপ বিবর্ণ ও রুক্ষ; দন্তসকল বিরল ও স্তনযুগল লম্বিত। ইনি বিধবা-রূপধারিণী ও কাকধ্বজরথে উপবিষ্টা আছেন। দেবীর নয়নযুগল রুক্ষ; ইনি সর্ব্বদা হস্ত কম্পিত করিতেছেন; ইঁহার এক হস্তে সূর্প ও অপর হস্তে বরমুদ্রা।'[৩৯]

বগলামুখী সম্পর্কে কবির বর্ণনা-

রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন-মধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা।।
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্ধ্ব করি।।
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্র খণ্ড সুশোভন।।[৪০]

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে বগলামুখীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে-

'সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতাবর্ণাম্, পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবী স্মরামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাম্।
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্, গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি।।

-'সুধাসাগরমধ্যে মণিময়মণ্ডপ, তন্মধ্যে রত্ন-নির্ম্মিত বেদীর উপরি সিংহাসন আছে, বগলামুখী দেবী সেই সিংহাসন উপবিষ্টা আছেন। ইনি পীতবর্ণা এবং পীতাবর্ণ বস্ত্র, পীতাবর্ণ আভরণ ও পীতাবর্ণ মাল্য দ্বারা বিভূষিতা। ইঁহার একহস্তে মুদগর ও অপর হস্তে বৈরিজিহ্বা। ইনি বামহস্তে শত্রুর জিহ্বাগ্র ধারণ করিয়া

দক্ষিণ হস্তে গদাঘাতে শত্রুর পরিপীড়ন করিতেছেন। বগলামুখী দেবী পীতবস্ত্রে আবৃতা ও দ্বিভুজা; ইহাঁকে নমস্কার।'[৪১]

মাতঙ্গী সম্পর্কে কবির বর্ণনা-

রত্ন পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়গ চর্ম পাশাঙ্কুশ ধরি।।
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল-ফলকে।[৪২]

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে মাতঙ্গী সম্পর্কে বলা হয়েছে-

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্।।

-'ইনি শ্যামবর্ণা, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী এবং ত্রিনয়নবিশিষ্টা; ইনি বাহুচতুষ্টয় দ্বারা খড়গ, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ এই অস্ত্রচতুষ্টয় ধারণ করিয়া রত্ননির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন।'[৪৩]

দশমহাবিদ্যার শেষ দেবী হলেন মহালক্ষ্মী। কবির বর্ণনায়-

সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ।।
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে।।[৪৪]

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে মহালক্ষ্মী সম্পর্কে বলা হয়েছে :

বালারকদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎকোটীরহারোজ্জ্বলাং
রত্নকল্পবিভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্মঞ্জরীম্।
পদ্মং কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং

ফুল্লাম্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম।।

-'দেবীর দেহপ্রভা প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায়, কপালে অর্দ্ধশশী এবং গলদেশে উজ্জ্বল হার আছে, ইনি সর্ব্বাঙ্গে রত্নভূষণে বিভূষিতা, দেবীর হস্তে ধান্যমঞ্জরী, পদ্ম, কৌস্তভ ও রত্নবিরাজিত। এই দেবী হাস্যবদনা, ইঁহার নেত্রত্রয় প্রফুল্লপদ্মের তুল্য, এইরূপে জগদম্বিকার ধ্যান করিবে।'[৪৫]

কবি ভারতচন্দ্র কাব্যে খুবই সুচারুভাবেই দশমহাবিদ্যার দেবী বর্ণনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের অনুসরণ করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 'সতীর দক্ষালয়ে গমন', 'শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ' ইত্যাদি অংশে কবি ভারতচন্দ্র পৌরাণিকতার অনুসরণ করেছেন। 'শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা' অংশে পৌরাণিকতার পাশাপাশি তন্ত্রের প্রসঙ্গও কবি উপস্থাপন করেছেন। কবির বর্ণনা-

চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।।
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁকিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে।।[৪৬]

শিবানুচরদের প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রে নানা বিবরণ দেওয়া আছে। সমালোচক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য-র ভাষায়- 'শিবানুচরদের যেমন ভূত প্রেত ইত্যাদি বলা হয়েছে তেমনি দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গদের ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি বলা হয়। এরা শক্তিদেহসমুৎপন্না। তন্ত্রশাস্ত্রে এদেরবিচিত্র রূপের বিবরণ আছে। ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি শক্তিদেবতার সহচরী।'[৪৭] ডাকিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে *কুলার্ণবতন্ত্র*-এ বলা হয়েছে-

ডাকিনী সর্পবদনা বিত্তজা জ্বলনপ্রভা।
কমণ্ডলুং কর্ত্তৃকাঞ্চ ধারয়ন্তী বরপ্রদা।।

-'ডাকিনী সর্পবদনা, বিত্তজাতা, অগ্নিপ্রভা, কমণ্ডলু ও কর্তৃকা-ধারিণী এবং বরদায়িনী।'[৪৮]

শাকিনীর ক্ষেত্রে *কুলার্ণবতন্ত্র*-এ বলা হয়েছে-

শাকিনী ত্বঞ্জনপ্রখ্যা মার্জারাস্যা সুশোভনা।

কুলিশঞ্চ তথা দণ্ডং ধারয়ন্তী শুচিস্মিতা।।

-শাকিনী অঞ্জনসদৃশা, মার্জারমুখী, সুশোভনা, শুচিস্মিতা এবং কুলিশ-দণ্ড-ধারিণী।'[৪৯]

যোগিনীর ক্ষেত্রে পুরাণ ও তন্ত্রে বিবরণ বিস্তৃত। দেবীর শক্তির অংশ হিসাবে পরিচিত। যোগিনীর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই; কোথাও তাঁর সংখ্যা আটটি, কোথাও চৌষট্টি, কোথাও কোটি সংখ্যক। *কালিকাপুরাণ*-এ বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। *যোগিনীতন্ত্র*-এর বিস্তৃত বিবরণ আছে।*ভূতডামরতন্ত্র*-এও এর বিবরণ আছে।*স্কন্দপুরাণ*-এর *কাশীখণ্ড*-এ চৌষট্টি যোগিনীর বিচিতে নামের বর্ণনা পাওয়া যায়। সমালোচক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য-র ভাষায়-'স্কন্দপুরাণের মতে এই যোগিনীদের নাম জপ করলে সব রোগ দূর হয়, সকল বাধা বিদূরিত হয়, শিশুদের রোগারোগ্য হয়, গর্ভিনীর গর্ভবেদনা উপশম হয়, রাজসভা ও বিচারে জয়লাভ হয়। তন্ত্রসাধনায় যোগিনী উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।'[৫০]

'প্রসূতিস্তবে দক্ষের জীবন' অংশে কবি মহাপীঠ একান্নর সূত্র নির্দেশ করেছেন। কবির বর্ণনায়-

করিরা একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হল ভৈরব।।
একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্র চূড়ামণিতন্ত্রমত।।[৫১]

'পীঠমালা' অংশে সতীর দেহ যেখানে যেখানে পড়েছে সেখানে সেখানে তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। তার বিস্তৃত বর্ণনা কবি করেছেন *তন্ত্রচূড়ামণি* গ্রন্থ অনুসারে। পীঠমালা গড়ে ওঠার পিছনে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী এবং পরবর্তীকালে সতীর দেহনাশ ইত্যাদি বর্ণনা সুচারুভাবেই কবি বিবৃত করেছেন। এখানে সতী হল গুণস্বরূপ শক্তি, অর্থাৎ সতী হলেন নির্গুণ ব্রহ্মের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ। ব্রহ্মস্বরূপ শিব, সতী হলেন তাঁর প্রকাশ, প্রকৃতি। সতীর দেহের কোনো খণ্ডাংশ তো একা পড়তে পারে না কোথাও, শিব ছাড়া সতীর কোনো সার্থকতা নেই, তাই যেখানে যেখানে সতীর দেহের অংশ পড়েছে সেখানে সেখানে শিব আছেন তাঁর পাশে সূক্ষ্ম অর্থাৎ লিঙ্গ রূপে ভৈরব হয়ে। সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে, 'সতীর দেহ যেখানে যেখানে পড়েছিল সেখানে লিঙ্গস্বরূপ হয়ে শিব বাস করেন।'[৫২] সতীর দেহের অঙ্গাংশ যেখানে যেখানে পড়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে পীঠস্থান। এই পীঠের আদি অর্থ হল শিক্ষা বা জ্ঞানক্ষেত্র, এখানে মন, বুদ্ধি, অহং বিলয়প্রাপ্ত হয়ে সূক্ষ্ম স্তরে অবস্থান প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গ অর্থ সূক্ষ্ম। অপরপক্ষে এই লিঙ্গ পীঠস্থানে শুদ্ধ চিৎসত্তা রূপে বিরাজ করে, পীঠস্থানের মাহাত্ম্য এই শুদ্ধ চিৎসত্তা লাভের

মধ্যেই। এই লিঙ্গ ভৈরব নামে খ্যাত। শাস্ত্রমতে, যিনি ভরণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন, বিশ্ব যাকে ধারণ ও পোষণ করে অর্থাৎ বিশ্বময় বলে যিনি সর্বত্র স্ফুরিত এবং যিনি শব্দন স্বভাব বলে সবিমর্শ অর্থাৎ শব্দরাশি সমুখকাদি-কলা-বিমর্ষময় রব তিনিই ভৈরব।

আবার অন্যভাবে 'ভৈরব' শব্দের ব্যাখ্যা করা যায়। সমালোচক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী-র মতে, 'ভী অর্থ ভয়। এই ভয় অর্থ সংসারত্রাস। সেই ত্রাসজনিত রব অর্থাৎ ক্রন্দন বা চিন্তা থেকে যিনি জাত তিনিই ভৈরব। সংসার ভয়ে ভীত জীব যখন ভগবান বলে পরিত্রাণ করে বা ভগবদ্ বিষয়ক চিন্তা চেতনায় আনার চেষ্টা করে তখন সেই জীবের হৃদয়ে পরমার্থরূপে আবির্ভূত হন, তিনিই ভৈরব।'[৫৩]
পীঠমালা বর্ণনার ক্ষেত্রে পীঠমালার সংখ্যা অনেক জায়গায় অনেক রকম।*জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র, বৃহৎতন্ত্রসার* ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থে পীঠমালার সংখ্যার হেরফের লক্ষণীয়। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে *তন্ত্রচূড়ামণি* গ্রন্থের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্র.১

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে পীঠমালার সংখ্যা নির্দেশ করেছেন ৫১টি। কিন্তু বহু গ্রন্থে পীঠমালার সংখ্যার তারতম্য আছে। সমালোচক দীনেশচন্দ্র সরকার 'মন্ত্রচূড়ামণি' ওরফে *তন্ত্রচূড়ামণি* গ্রন্থে পীঠসংখ্যা নির্দেশ করেছেন ৫৩ টি। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন-'এটা 'তন্ত্রচূড়ামণি'কারের গ্রন্থে উত্তরকালীন সংস্কারক গণের হস্তক্ষেপের ফল।'[৫৪] অপরপক্ষে সমালোচক মদনমোহন গোস্বামী দীনেশচন্দ্র সরকারের মতামতকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর মতে- 'ডা.দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অবশ্য প্রয়াগে দশটি পীঠস্থান ধরিয়া মোট সংখ্যা ৫১ বলিয়াছেন কিন্তু এই যুক্তি সমর্থন করা যায় না...দ্বিতীয়ত ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় মহাপীঠ ও উপপীঠ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। যদি সমগ্র তালিকাটি মহাপীঠ সংক্রান্ত বলিয়া ধরা যায়, তবে দেখা যায় দুইটি উপপীঠও [কিরীট ও কেশ] এই তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় এই পীঠগুলির উল্লেখ নাই-কক্ষ, কফোণি(দক্ষিণ), জঠর, জানু(বাম ও দক্ষিণ), পদাঙ্গুলি(বাম), পৃষ্ঠ, মনঃ, মর্ম্ম এবং নেত্রাংশতারা।' [৫৫]
ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'পীঠমালা' অংশটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথমে ৪২ টি মহাপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়, বাকি নয়টির সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে মহাপীঠ ও উপপীঠগুলি নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে, যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তালিকাটি পেশ করা হল। তালিকাটি সমালোচক মদনমোহন গোস্বামী[৫৬]-র গবেষণালব্ধ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

মহাপীঠের তালিকা

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
অধর (মতান্তরে উদর)	প্রভাস (মথুরা)	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
ওষ্ঠ (মতান্তরে উর্দ্ধ ওষ্ঠ)	ভৈরব পর্বত (অবন্তী দেশে বা উজ্জয়িনীর নিকট)	অবন্তী (মহাদেবী)	নম্রকর্ণ (লম্বকর্ণ)
কক্ষ	কোঁক	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
কণ্ঠ	কাশ্মীর (অমরনাথ)	মহামায়া (ভগবতী)	ত্রিসন্ধ্য (ত্রি সন্ধ্যেশ্বর)
কনুই (দক্ষিণ)	রণখণ্ড	বহুলাক্ষী	মহাকাল
ঐ (বাম)	উজানী (কোগ্রাম)	মঙ্গলচণ্ডী (মঙ্গলা)	কপিলাম্বর (কপিলেশ্বর)
কর্ণ (বাম)	করতোয়াতটে (বগুড়া)	অপর্ণা	বামেশ (বামন)
ঐ (দক্ষিণ)	শ্রী পর্বত (কাশ্মীর)	সুন্দরী (সুনন্দা)	সুন্দরানন্দ (নন্দ)
কাঁকাল	কাঞ্চী (কোপাই নদী তীর)	বেদগর্ভা (দেবগর্ভা)	রুরু
গণ্ড (বাম)	গোদাবরী নদী তীর	বিশ্বমাতৃকা (রাকিণী	বিশ্বেশ (দণ্ডপাণি)
ঐ (দক্ষিণ)	গণ্ডকী নদী তীর	গণ্ডকী চণ্ডী	চক্রপাণি (চন্ডপাণি
গুলফ্ (বাম)	বিভাস (তমলুক)	ভীমরূপা (কপালিনী)	কপালী (সর্ব্বানন্দ)
ঐ (দক্ষিণ)	কুরুক্ষেত্র (দ্বৈপায়ন হ্রদ তীর)	বিমলা (সম্বরী, সাবিত্রী)	সম্বর্ত্ত(স্থাণু)

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
গ্রীবা	শ্রীহট্ট (জৈনপুর)	মহালক্ষ্মী(মহামায়া)	সর্ব্বানন্দ(সম্বরানন্দ)
চিবুক	জনস্থান(মধ্যপ্রদেশ)	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ(বিকৃত)
জঙ্ঘা(বাম)	জয়ন্তী(শ্রীহট্ট-বাউড়-ভোগগ্রাম)	জবন্তী	ক্রমদীশ্বর
ঐ(দক্ষিণ)	নেপাল (মগধ)	মহামায়া (নব দুর্গা সর্ব্বানন্দ করী)	কপালী (ব্যোমকেশ)
জঠর	হরিদ্বার	ভৈরবী	বক্র
জানু (বাম)	মালব (মধ্যভারত)	শুভচণ্ডী	তাম্র
ঐ (দক্ষিণ)	স্রোতা	চণ্ডিকা	সদানন্দ
জিহ্বা	জ্বালামুখী	অম্বিকা	বটুকেশ্বর (উন্মত্ত)
দন্তপঙক্তি (উর্দ্ধ)	অনল (মতান্তরে শুচি দেশ)	নারায়ণী	সংক্রুব (সংহার)
ঐ (অধঃ)	পঞ্চসাগর	বারাহী	মহা রুদ্র
নাভি	উৎকল (পুরী)	বিজয় (বিমলা)	জয় (জগন্নাথ)
নাসিকা	সুগন্ধা (বরিশাল)	সুনন্দা (সুগন্ধা)	ত্র্যম্বক (বটুকেশ্বর)
নিতম্ব (বাম)	কালমাধব	কালী (নর্ম্মদা)	অসিতাঙ্গ (ভদ্রসেন)

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
নিতম্ব (দক্ষিণ)	নর্ম্মদা	শোণাক্ষী	ভদ্রসেন
নেত্র (ত্রিসংখ্যক)	শর্কর (করবীরপুর)	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ (ক্রোধেশ)
নেত্রাংশ তারা	তারাপীঠ (বীরভূম)	তারিণী	উন্মত্ত
পদ (বাম)	ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)	অমরী (ভ্রামরী)	অমর (ঈশ্বর, অম্বর)
ঐ (দক্ষিণ)	ত্রিপুরা (পর্ব্বতের উপর)	ত্রিপুরাসুন্দরী	নল (ত্রিপুরেশ)
পদাঙ্গুলি (বাম)	বিন্ধ্যশেখর	বিন্ধবাসিনী	পুণ্যভোজন
ঐ চারিটি (দক্ষিণ)	কালীঘাট (কলিকাতা)	কালিকা	নকুলেশ্বর (নকুলেশ)
পৃষ্ঠ	বৈবস্বত (কালিকাশ্রম)	ত্রিপুটা (সর্ব্বাণী)	শমনকর্ম্মা (নিমিষ)
বাহু (বাম)	বাহুলা (কাটোয়ার কেতুগ্রাম)	বাহুলা (বাহুলী)	ভীরুক (ত্রিবক্র)
ঐ (দক্ষিণ)	বক্রেশ্বর (বীরভূম)	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গুলা (বেলুচিস্তান)	কোট্টরী (কোট্টরীশা)	ভীমলোচন
মণিবন্ধ (বাম)	মণিবন্ধ (আজমীর)	গায়েত্রী	শঙ্কর (সর্ব্বাণ, সর্ব্বানন্দ)
ঐ (দক্ষিণ)	মণিবেদ	সাবিত্রী	সর্ব্বানন্দ

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
মনঃ(মতান্তরে ভ্রূমধ্য)	বক্রনাথ (মতান্তরে বক্রেশ্বর)	পাপহরা (মহিষমর্দ্দিনী)	বক্রনাথ
মর্ম্ম	প্রভাস (মথুরা)	সিদ্ধেশ্বরী (চন্দ্রভাগা)	সিদ্ধেশ্বর (বক্রতুন্ড)
মহামুদ্রা	কামরূপ (আসাম)	কামাখ্যা (নীল পার্ব্বতী)	রাবানন্দ (উমানন্দ)
স্কন্ধ (বাম)	মিথিলা (জনকপুর স্টেশনের নিকট)	মহাদেবী (উমা)	মহোদর
ঐ (দক্ষিণ)	রত্নাবলী (মাদ্রাজ)	শিবা (কুমারী)	শিব (কুমার)
স্তন (বাম)	জালন্ধর (পাঞ্জাব)	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ (ঈশান)
ঐ (দক্ষিণ)	রামগিরি (চিত্রকূট)	শিবানী	চণ্ড
হস্ত (বাম, মতান্তরে দক্ষিণ-অৰ্দ্ধ)	মানসসরোবর (তিব্বত)	দাক্ষায়ণী	হর (অমর)
ঐ (দক্ষিণার্দ্ধ)	চট্টগ্রাম (চট্টল)	ভবানী	চন্দ্রশেখর
হস্তাঙ্গুলি (উভয়)	প্রয়াগ (এলাহাবাদ)	কমলা (কল্যাণী, ললিতা)	বেণীমাধব (ভব)
হৃদয়	বৈদ্যনাথধাম (সাঁওতাল পরগণা)	জয়দুর্গা (নবদুর্গা)	বৈদ্যনাথ
পদাঙ্গুষ্ঠ (দক্ষিণ)	ক্ষীরগ্রাম (বর্ধমান)	যোগাদ্যা (যুগাদ্যা)	ক্ষীরকণ্ঠ (ক্ষীরখণ্ডক)
*মুণ্ড (কারো কারো মতে)	কালীঘাট (কাটোয়া)	জয়দুর্গা	অভীরুক (ক্রোধীশ)

*নিশ্চিত তথ্য প্রমাণ নেই।

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
অস্ত্র	চণ্ডদ্বীপ	চক্রধারিণী	শূলপাণি
উচ্ছিষ্ট	নীলাচল (উড়িষ্যা)	বিমলা	জগন্নাথ
ওষ্ঠাংশ (মতান্তরে অধঃ ওষ্ঠ)	অট্টাহাস (বীরভূমে লাভপুরের নিকট)	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ (বিশ্বেশ)
কক্ষাংশ	সর্ব্বসৈন্য	বিশ্বমাতা	দণ্ডপাণি
কণ্ঠহার	অযোধ্যা	অন্নপূর্ণা	হরিহর
করাংশ	সতীচল	সুনন্দা	সুনন্দ
কিরীট	কিরীটকোণা (বটনগর গঙ্গাতীর)	ভুবনেশ্বরী (বিমলা)	কিরীটী (সিদ্ধরূপ, সম্বর্দ্ধ, সংবর্ত্ত)
কুণ্ডল	বারাণসী (মণিকর্ণিকা)	বিশালাক্ষী (অন্নপূর্ণা)	বিশ্বেশ্বর (কাল ভৈরব)
কেশ	কেশজাল (বৃন্দাবন)	উমা (কাত্যায়নী)	ভূতেশ (কৃষ্ণনাথ)
গণ্ডাংশ	-	উত্তরিণী	উৎসাদন
ঐ (দক্ষিণ)	নলস্থল	ভ্রামরী	বিরূপাক্ষ
গ্রীবাংশ	শ্রী শৈল (কাশ্মীর মধ্যে হিন্দুকুশ পর্বতের নিম্নে)	সর্ব্বশ্বেরী	-
চর্ম্মাংশ	কটক	কটকেশ্বরী (কাত্যায়নী)	বামদেব

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
দণ্ডাংশ	সংহর	সুরেশী (শূরেশী)	সুরেশ (শূরেশ)
নিতম্বাংশ	শোণ	ভদ্রা	ভদ্রশ্বের
নূপুর	লঙ্কা (সিংহল দ্বীপে সমুদ্রতীর)	ইন্দ্রাক্ষী	রক্ষেশ্বর (রাক্ষসেশ্বর)
পদাংশ	ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ির শালবাড়ি গ্রামে তিস্তা তীরে)	পার্ব্বতী	ভৈরবেশ্বর (ঈশ্বর)
পাণিপদ্ম	যশোহর (টাকির নিকট ঈশ্বরীপুর)	যশোরেশ্বরী (যশোরী)	প্রচন্ড (চন্ড)
বসাচর্ব্বি	গৌরীশেখর	যুগাদ্যা	ভীম
ভগ্নাংশ	সেতুবন্ধ (দক্ষিণ ভারত)	জয়া	মহাভীম
লোম	পুণ্ডর (পুণ্ড্র)	সর্ব্বাক্ষিণী	সর্ব্ব
লোমখন্ড	তৈলঙ্গ	চণ্ডনায়িকা (চণ্ডদায়িকা)	চন্ডেশ
শিরানলি (মতান্তরে নলি বানলা)	নলহাটি	সাফালিকা	যোগীশ (যোগেশ)
শিরাংশ	কালিপীঠ	চণ্ডেশ্বরী	চন্ডেশ্বর
স্কন্ধাংশ	বৃন্দাবন	কুমারী (কাত্যায়নী)	কুমার
হারাংশ	নন্দীপুর	নন্দিনী	নন্দিকেশ্বর (নন্দীশ্বর)

কবি পুরাণানুযায়ী কাহিনীর বর্ণনা করে গেলেও স্তরে স্তরে বর্ণনা দিয়ে গেছেন তৎকালীন সময়ের সমাজচিত্র। ‘শিববিবাহ’-র পরবর্তী ‘কোন্দল ও শিবনিন্দা’ অংশে সেই আমলের সামাজিক রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেবার রীতি ছিল এবং বর বা পাত্রের বয়সের ক্ষেত্রে কোনো মাপকাঠি বিচার করা হত না। কুলীন স্বামী পেলে তো আর কথাই নেই, সেক্ষেত্রে পাত্র যতই খারাপ হোক না কেন পাত্রীর জন্য সেই বরই যোগ্য। কবির বর্ণনায়-

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো।।

উমার কেশ চামরছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,

তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।

উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,

ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো।।[৫৭]

গৌরীর ক্ষেত্রে নিদারুণ সমাজের প্রথা কবির মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কঠোর প্রথা হলেও এটিই বাস্তব। সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন-এর ভাষায়-‘বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,-শিশু কন্যার পিতৃগৃহ হইতে গমন, দুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহাকে ধূলিখেলা সাঙ্গ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতী বধূর অভিনয় করিতে হইত,...’[৫৮] সমাজের এই কঠোর, নির্মম নাগপাশের হাত থেকে সাধারণ মানুষজনের ভবিতব্য কিভাবে লেখা হত তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদাহরণ কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মহাদেবের ‘সিদ্ধিভক্ষণ’ অংশে কবির বর্ণনা-

সম্মুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।

বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন।।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে।

ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে।।

ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া অশেষ।

একই নিশ্বাসে পিয়া করিল নিঃশেষ।।[৫৯]

কবি ভারতচন্দ্র একটি তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুন্দর বর্ণনা বিবৃত করেছেন। তন্ত্রে সিদ্ধির পারিভাষিক শব্দ 'বিজয়া'। তন্ত্রের ক্ষেত্রে পঞ্চ ম-কার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন যেমন প্রযোজ্য তেমনি সিদ্ধি বা 'বিজয়া' সাধনাঙ্গ রূপে শোধন করেই গ্রহণ করতে হয়। *মহানির্ব্বাণতন্ত্র*-এ এর উল্লেখ আছে-

তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোদ্ভবে।

অমৃতবর্ষিণী ততোহমৃতমাকর্ষয় দ্বিধা।।

সিদ্ধিং দেহি ততো ব্রূয়াৎ কালিকাং মে ততঃ পরম্।

বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং সংবিদাশোধনে মনুঃ।।

-'প্রথমে প্রণব ও মায়াবীজ (ওঁ হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া তদন্তে অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতম্ আকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা, এই মন্ত্রে শোধন করিতে হইবে।'[৬০]

এছাড়া সিদ্ধি বা 'বিজয়া'-র উপর মূলমন্ত্র জপ করতে হয়। তন্ত্রে এর নির্দেশ আছে-

মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য বিজয়োপরি।

আবাহন্যাদিমুদ্রাঞ্চ ধেনুযোনিং প্রদর্শয়েৎ।।

গুরুং পদ্মে সহস্রারে যথা সঙ্কেতমুদ্রয়া।

ত্রিধৈব তর্পয়েদ্দেবীং হৃদি মূলং সমুচ্চারন্।।

বাগভবং বদ-যুগ্মঞ্চ বাগ্বাদিনি পদং ততঃ।

মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি।

স্বাহান্তেনৈব মনুনা জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে।।

-'অনন্তর সেই বিজয়ার উপর মূলমন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধিনী, সম্মুখীকরণী দ্র.২ ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর গুরূপদিষ্ট তত্ত্বমুদ্রা সহকারে সহস্রদলকমলে বিজয়া দ্বারা গুরুর উদ্দেশে (ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক) তিনবার তর্পণ করিবে। পরে হৃদয়ে মূলমন্ত্র জপ করিয়া (তত্ত্বমুদ্রাযোগে আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহা মন্ত্রে) ঐরূপ বারত্রয় দেবীর তর্পণ করিবে। তৎপরে প্রথম ঐং উচ্চারণ করিয়া 'বেদ' এই শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ 'বাগ্বাদিনি' এই পদ উচ্চারণকরতঃ 'মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভবসর্ব্বসসত্ত্বশঙ্করি স্বাহা' এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে।'[৬১] এই বিশেষ তন্ত্রের পদ্ধতি কবি ভারতচন্দ্র 'ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে', 'মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ' ইত্যাদির মধ্যে ফুটে উঠেছে। শিবের সিদ্ধি ভক্ষণের কবি যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা গভীরভাবে তন্ত্রের ক্রিয়া-আচারকেই ফুটিয়ে তোলে।

'হর-গৌরীর কথোপকথন', 'হর গৌরীর কোন্দল' সমাজের রূঢ় বাস্তবচিত্রের ছবি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন।'হর-গৌরীর কথোপকথন'-এ শিব যখন গৌরীকে বলেছে-

অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে।।[৬২]

এর প্রত্যুত্তরে গৌরীর উত্তর-

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে।।
পুরুষেরা দেখে যদি নারী মরে যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরি তায়।।
নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা।।[৬৩]

নারী-পুরুষের সম্পর্কের অবস্থান কিরূপ তা সমাজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে গৌরীর জবানিতে তুলে ধরেছেন কবি। নারীর অবস্থান স্পষ্টতই এখানে অবহেলিত প্রায়। স্বামীর স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীতে আসক্ত হবে, এটি তাদের ভবিতব্য ছিল; মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সমাজের বেড়াজালে এভাবেই তাদের জীবনযাপনের রীতি ছিল। ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মৃত স্বামীর চিতায় তাদের আরোহণ করতে হত। সমাজে মেয়েদের জন্য নরকোচিত অভিশাপ বরাদ্দ ছিল এর থেকেই বোঝা যায়। অন্যদিকে 'হরগৌরীর কোন্দল' অংশে পুরুষের অসমর্থতার কথাও কবি উল্লেখ করেছেন। গৌরীর খেদ এখানে প্রকাশিত-

মা-বাপ পাষাণ-হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া

ভারত এ দুখের ঘর ছাড়িবে।।[৬৪]

তৎকালীন সময়ে পাত্রের বংশপরিচয় বা কুলীন পাত্র দেখে কন্যার বিবাহদান করলে তাদের সমাজ রক্ষা হত। কিন্তু কন্যার পরবর্তী জীবন যে কত দুর্বিষহ হয়ে উঠত তার বিবরণ কবি এখানে তুলে ধরেছেন-

শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।

নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া।।[৬৫]

এটা শুধু কবি সেই সময়ের ছবি তুলে ধরেছেন তা নয়, অর্থ বিনা সংসারের অচল অবস্থার ছবি কিরূপ তার ছবিও কবি তুলে ধরেছেন। তাই বাধ্য হয়ে শিব ভিক্ষা পাওয়ার জন্য উদ্দ্যোগী। পৌরাণিক শিব-এর সাথে এই শিব মূর্তির কত তফাৎ। সময়ের দিক থেকে শিব এখানে নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেখানে সাধারণ মানুষের দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোটে না, সেখানে দেবাদিদেব শিবের পৌরাণিক স্বরূপ যে ধূলিধূসরিত হবে সময়সাপেক্ষে এ আর আশ্চর্য কী ! অপরদিকে 'জয়ার উপদেশ' অংশে শিব যাতে ভিক্ষা না পায় তাই তাঁর বক্তব্য-

যা বলি তা কর নিজমূর্ত্তি ধর

ব'স অন্নপূর্ণা হয়ে।

কৈলাস-শিখর অন্নে পূর্ণ কর

জগতের অন্ন লয়ে।।[৬৬]

হঠাৎ এ ধরনের মূর্তি নেওয়ার উপদেশ কেন? যদি সবার অন্ন হরণ করা হয় তাহলে নিরন্ন প্রজাদের অবস্থা কী রকম দাঁড়াবে? ইতিহাসের দিকে লক্ষ করা যাক-'মারাঠা আক্রমণে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। চাষ হল না বেশ কয়েক বছর। ফলে খাদ্য শস্যের দাম বাড়ল।...মারাঠারা গঞ্জ, বাজার ও হাটগুলি লুঠ করার চেষ্টা করত। বাংলার আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।'[৬৭] সিংহাসনে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত রাজা দণ্ডায়মান তাহলে সহজেই ধারণা করা যায় দেশের সামগ্রিক অবস্থা কিরকম।[দ্র.৩] দেবী অন্নদাকে জয়া এর বেশি কিই বা বলবেন, ইঙ্গিতেই কবি তার বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

এই ঘটনার একটি তন্ত্রের দৃষ্টিকোণও আছে। তন্ত্রে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিরূপা নারীশক্তি জগতের নিয়ন্ত্রী শক্তি। এখানে সেই ইঙ্গিতই ব্যক্ত হয়েছে; পুরুষ রূপী শিব এখানে জড় ভূমিকায় অবতীর্ণ, নারী রূপী দেবী অন্নপূর্ণা সারা জগতের অন্ন নিজের কাছে গচ্ছিত রেখে লীলাখেলা দেখাচ্ছেন, প্রকৃত রূপে জগতকে চালনা করছেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় 'অন্নপূর্ণা পূজা' প্রসঙ্গে বলেছেন-'প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ ও প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও প্রকৃতি সক্রিয়। এইভাব ক্রমে পরিবর্জিত হইল। তারপর যখন শক্তিপূজার আধিক্য হইল তখন পুরুষকে খর্ব করিয়া শক্তির প্রাধান্য দেখান হইল। শক্তি সব করিতে পারে।'[৬৮] শিবের এই অন্ন পাওয়া দেবী অন্নপূর্ণার কাছে এটির যেমন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তেমনি তন্ত্র ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতও আছে। শিব এখানে নিমিত্ত মাত্র দেবীই এই জগতের সব, এই ইঙ্গিতই মুখ্য।

'অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য' অংশে কবি দেবী অন্নদাকে 'নিগম-আগম' অনুসারে 'আদ্যাশক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। কবির বক্তব্য-

শিবের শিবত্ব যাঁর উপাসনা-ফলে।

নিগম আগমে যাঁরে আদ্যাশক্তি বলে।।[৬৯]

মহানির্ব্বাণতন্ত্র-এ আদ্যাশক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ।।

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীত্তমোরূপমগোচরম্।

ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া।।

মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।

-'তুমি সৃষ্টির আদিতে তমোরূপে অদৃশ্যভাবে বিরাজিত ছিলে,তোমার সেই অব্যক্ত রূপ বাক্য ও মনের অগোচর। তুমিই পরব্রহ্মের (মূল প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত তুরীয় ব্রহ্মের) সৃষ্টি করিবার ইচ্ছারূপিণী, তোমা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। মহতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টি।'[৭০] সমস্ত কাব্যেই এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে, 'গীতারম্ভ' যতে যেমন কবি বলেছেন-

অন্নপূর্ণা মহামায়া   সংসার যাহার ছায়া

পরাৎপর পরম প্রকৃতি।।

অনিবার্য্য নিরুপমা   আপনি আপন সমা

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি।।[৭১]

আবার 'দেবগণের নিমন্ত্রণ' অংশেও এই বিষয়ের প্রতিধ্বনি ঘটেছে-

ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর।

পরমেশী পরমপুরুষ পরাৎপর।।

এতদিন যাঁর নাম না শুনি শ্রবণে।

নিগম আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন।।[৭২]

'শিবের পঞ্চতপ' অংশে শিব দেবী অন্নদা প্রসঙ্গে বলেছেন-

তুমি মূল-প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।

সেই ধন্য তুমি যাবে হও অনুকূল।।

তুমি সকলের সার অসার সকল।

যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল।।

সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।

সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি।।[৭৩]

মহানির্ব্বাণতন্ত্র-এ এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়-

নিমিত্তমাত্রং তদব্রহ্ম সর্ব্বকারণম্।।

সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্ল্লিপ্তিং সর্ব্ববস্তুষু।।

ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।

সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মানসগোচরম্।।

তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।

করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচম্।।

-'সর্ব্বকারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। ব্রহ্ম সৎরূপ এবং সর্ব্ব ব্যাপী, তিনি সমুদয় জগৎকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত অর্থাৎ তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি, পরিণাম বা রূপান্তর নাই। তিনি চিন্ময় এবং সর্ব্ব বস্তুতে নির্লিপ্ত। তিনি নিষ্ক্রিয়; কিছুই করেন না, ভোজন করেন না, গমন করেন না এবং অবস্থিতি করেন না। তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, আদ্যন্তবর্জ্জিত এবং বাক্যমনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক।'[৭৪] *অন্নদাকল্পতন্ত্র*- গ্রন্থেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়-

সৃজামি পালয়ামীতি সংহরামি পুনঃ পুনঃ।

সচ্চিদানন্দবিভবঃ প্রকৃতি কারণং মম।।

তস্মাত্তু প্রকৃতের্মূলং কারণং নৈব দৃশ্যতে।

নির্গুণা সগুণা দ্বেধা সগুণা সা ত্রিধা মতা।।

-'সচ্চিদানন্দ-বিভূতি আমি ব্রহ্মারূপে যে সৃষ্টি করি, বিষ্ণুরূপে যে পালন করি ও রুদ্ররূপে যে সংহার কার্য্য সম্পাদন করি, মূল প্রকৃতি মহামায়া তাহার প্রেরয়িত্রী জানিবে তিনি নিজেই ঈশ্বরী, তাঁহার প্রেরয়িতা বা ঈশ্বর কেহ নাই। তিনি উপাসকদিগের অধিকার ভেদে জ্ঞানবিজ্ঞান-পথিকজন নির্গুণার উপাসনা করিয়া থাকেন। সগুণা আবার মূর্ত্তি ও মন্ত্র ভেদে ত্রিবিধা হইয়া থাকেন।'[৭৫]

কবি এরই প্রতিধ্বনি করে বারবার উল্লেখ করেছেন-

সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের জননী।

অপার সংসারপারে তুমি নারায়ণী।।[৭৬]

'শিবের অন্নদা-পূজা' অংশে বলিদানের প্রসঙ্গ এসেছে। কবির বর্ণনায়-

মহিষ ছাগ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ

বিবিধ উপাচার যত।।

সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া

মঙ্গল ইতিহাস গানে।[৭৭]

অন্নদাকল্পতন্ত্র- গ্রন্থে বলিদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিন্দত্বা প্রপূজয়েৎ

স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনেহথ জলান্তরে।

যদযৎ প্রমেয়ন্তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থন্নিবেদয়ৎ।।

-'কামরূপছাগ এবং ক্রোধরূপ মহিষ বলি দিয়া বলিপ্রিয়া মায়ের পূজা করিবে।'[৭৮] এই অংশে 'সর্ব্বতোভদ্র' নামক পূজাদির কাজে প্রযুক্ত একটি তান্ত্রিক মণ্ডল বা যন্ত্র অঙ্কনের কথা উল্লেখিত হয়েছে-

সর্ব্বতোভদ্র নাম মঙ্গল চিত্রধাম

লিখিলা আপনি বিধাতা।।[৭৯]

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। 'অথস্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমন্ডলম্' অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

চতুরাস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা দিগেভ্যো দ্বাদশধা সুধীঃ।

পাতয়েত্তত্র সূত্রাণি কোষ্ঠনাং দৃশ্যতে শতম্।[৮০]

শারদাতিলক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এই 'সর্ব্বতোভদ্র' নামক পূজাদির কাজে প্রযুক্ত একটি তান্ত্রিক মণ্ডল বা যন্ত্র অঙ্কনের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

কাব্যের পরবর্তী অংশে ব্যাসের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে ব্যাস একটি শ্রেণি চরিত্র যে ধর্ম জিজ্ঞাসার মীমাংসা করতে ব্যর্থ। ধর্মর সঠিক নির্ণয় তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দী হল 'Age of Interrogation', এই সময়ের প্রেক্ষাপটে কারোরই পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কারোর ধর্মবিশ্বাসে মতি নেই, অপর ধর্মের উপর প্রতি শ্রদ্ধা নেই; একে অপরকে ছোট করতেই ব্যস্ত। ব্যাস চরিত্রের মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টাই কবি দেখাতে চেয়েছেন। একবার সে হরিকে স্মরণ করে, একবার সে শিবনিন্দা করে। কিন্তু ধর্মর ভেদাভেদ না করে ধর্মের সূক্ষ্ম যোগসূত্র কবি ভারতচন্দ্র কালের দ্রষ্টা রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।

অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর।।

বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।

কি ধর্ম বুঝিয়া হরি-হরে কর ভেদ।।[৮১]

কবি যে এই সমন্বয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন তা শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে নয়, যুগে যুগে, কালে-কালে এই সমন্বয়চিতে উজ্জ্বল রূপে কাব্যে প্রজ্বলিত হবে। পরবর্তী অংশে ব্যাস ও গঙ্গার কথোপকথনে উঠে এসেছে ব্যক্তিগত কাদা ছোড়াছুড়ির প্রতিযোগিতা। কবি ভারতচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যুগের অভিপ্রায় কী ? দেবতারা আর স্বস্থানে

বিরাজ করেন না, ব্যক্তিগত দড়ি টানাটানির দ্বন্দ্বে সমকালীন জনসাধারণের মতো তারাও উঠে পড়ে লেগেছেন। এ অবস্থান শুধু সমকালের নয়, বর্তমান সমাজ তথা সময়েরও। ব্যাস যেমন গঙ্গাকে 'বেশ্যাধর্ম্ম' বলে গাল দেয়, তেমনি গঙ্গাও ব্যাসের জন্মপরিচয় ও কর্মবৃত্তান্ত নিয়ে খোটা দিতে পিছপা হয় না। মনে রাখতে হবে, ভারতচন্দ্র নিজের ইচ্ছায় কাব্য লিখছেন না, রাজার ইচ্ছায় লিখছেন; কাহিনীর চটকদারি নির্ভর করবে রাজার মর্জির উপর। তাই সেক্ষেত্রে ব্যাস ও গঙ্গা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল থাকলে চলবে কী করে ? তাই তাদের আসরে নামতে হয় কু-কথার বাক্যস্রোত নিয়ে; তাতে জনসাধারণ অপেক্ষা পোষ্টার মনোরঞ্জন অধিক হয়। 'অন্নদার জরতী-বেশে ছলনা' অংশে তন্ত্র প্রসঙ্গ এসেছে-

বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।

মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়।।

প্রকৃতি পুরুষপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।

কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল।।

বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।

শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব।।

নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।।[৮২]

উদ্ধৃতাংশে কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব এবং পরমাপ্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতি বা পরমাশক্তি থেকেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উদ্ভব এবং প্রকৃতিতেই এঁরা লয় প্রাপ্ত হন।*নির্ব্বাণতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দেবি প্রকৃতি জায়তে ধ্রুবম্।

তথা প্রলয়কালে তু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ।।[৮৩]

তন্ত্রোক্ত ষট্ সাধনায় বলা হয় যে, মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যে সুষুম্না নাড়ি আছে সেই নাড়ির মধ্যে মৃণালতন্তু সদৃশ চিত্রিণী বিদ্যমান। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ষটচক্রভেদ করে সহস্রার পদে পরম শিবের সাথে মিলিত হয়, তখনই ষটচক্রসহ সমস্ত তত্ত্বের সাথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কুলকুণ্ডলিনীতে লয় প্রাপ্ত হন, তখন কুণ্ডলিনী মূলাধারে

প্রত্যাগমনকালে সমস্ত চক্র বা পদস্থিত তত্ত্ব ও দেবতাসমূহও আবির্ভূত হয়ে স্ব স্ব স্থানে বিরাজিত থাকেন। পরমাপ্রকৃতি বা মহাশক্তি সর্বকর্তৃত্বময়ী লীলা সর্বত্র ব্যাপ্ত। পরমশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদ্বিতীয়া প্রকাশ। পরমাশক্তি এই সৃষ্টির মূল, পরমাশক্তিবিহীন এই সৃষ্টি অচল। তন্ত্রে এর উল্লেখ আছে-

শক্তিহীনঃ শবঃ সাক্ষাচ্ছক্তিযুক্তঃ সদাশিবঃ।[৮৪]

বা

শক্ত্যা যুক্তো যদা দেবী তদৈব শিবরূপকঃ।

শক্তিহীনে শবঃ সাক্ষাৎ পুরুষত্বং ন মুঞ্চতি।।[৮৫]

অর্থাৎ শক্তিযুক্ত হলে শিবস্বরূপ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অধিকর্তা। শক্তিবিহীন হলে সাক্ষাৎ শবস্বরূপ, তার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। কবি কাব্যে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কাব্যের প্রথম খণ্ডের শেষাংশে ‘হড়িহোড়ের বৃত্তান্ত’ কবি উপস্থিত করেছেন। বসুন্ধর হরিহোড় নাম নিয়ে মর্ত্যে আসছে। যে হরিহোড় ঘুটে দিয়ে জীবনধারণ করত, দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় স্বর্ণঘুটের অধিকারী হয় সে। টাকা যার কাছে উপস্থিত সমাজে তার উন্নতি হতে বাধ্য। হরিহোড়-এর পূর্বের পরিচয়-

মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।

কত কষ্ট মিলে এঁটে নাহি মিলে থোড়।।

বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।

বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে।।[৮৬]

সে যখন দেবীর কৃপায় ধনবান হয় তখন তার অপবাদ সুবাদে পরিণত হয়। সমাজে সে সুপ্রতিষ্ঠ হয় কড়ি মাহাত্ম্যে; তখন সে অর্জন করে জাতি কৌলিন্য-

কুলীন-মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।

নানা মতে ধন দিয়া সবারে তুষিল।।

ঘটক পাইয়া ধন পাইল ঠাকুর।

বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর।।[৮৭]

অর্থাৎ কড়ি মাহাত্ম্যই হচ্ছে সব যুগের মূল কথা। কবির ভাষায়-

কড়ি ফটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই

কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।

কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া

কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।।[৮৮]

কবি যুগ বিবরণ যেমন পৌরাণিক কাহিনীর আবহে তুলে ধরেছেন তেমনি তুলে ধরেছেন যুগ হতাশা, সাধারণ মানুষের হাহাকার। 'অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা' অংশ দিয়ে কাব্যের প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে। প্রথম খণ্ডে কবি দুটি বিষয় পরিষ্কার করেছেন, তা হল সময়োচিত যুগ পরিবেশ যেটি তাঁর কাব্যে তিনি জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় তুলে ধরেছেন এবং দ্বিতীয়ত উচ্চবিত্ত মানুষদের গালে তীব্র কশাঘাত যা তাঁর কাব্যে ছত্রে ছত্রে তিনি ব্যক্ত করেছেন। এটি শুধু কাব্য নয়, চিরন্তন প্রতিবাদের দলিল যা অমর হয়ে মানুষের মনে বিরাজ করবে।

মানসিংহ খণ্ড

অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় খন্ড 'মানসিংহ' খণ্ড নামে পরিচিত। এই খণ্ডে কবি পৌরাণিকতার অংশ অপেক্ষা ইতিহাসকেই অধিক আশ্রয় দিয়েছেন। ইতিহাসকে আশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরেননি, প্রয়োজনে কাহিনীকে নিজের মত গড়ে নিয়ে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 'মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি' অংশে মানসিংহ ও তার সৈন্যদল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নাস্তানাবুদ হলে ভবানন্দ মজুমদারের স্মরণাপন্ন হন; ভবানন্দ সপ্তাহ ভর তাদের খাদ্যসামগ্রী প্রদান করায়, তারই ফলশ্রুতি রূপে দিল্লি যাত্রা এবং 'বাগুয়ান' পরগণার রাজত্বপ্রাপ্তি। এভাবেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের অগ্রগতির প্রাথমিক পর্যায় শুরু হল। সত্যিই কী এই রকম ঘটনা ঘটেছিল ? ইতিহাসের গর্ভে তলিয়ে দেখা যাক। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র-র বক্তব্য-'তথায় অকস্মাৎ অশ্রুতপূর্ব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই দুর্যোগ সপ্তদিন স্থায়ী হয়। ভবানন্দের আলয়ে গোবিন্দদেব নামে এক দেব-মূর্তি স্থাপিত ছিল। ঐ সময়ে এই ঠাকুরের ঠাকুরাণী প্রতিষ্ঠা করিবার দিন স্থির হয়। প্রতিষ্ঠাকার্য্য অতি সমৃদ্ধিপূর্বক নির্বাহ করণোদ্দেশে ভবানন্দ বিস্তর খাদ্য আহরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ সকল দ্রব্য সৈন্যবর্গকে বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থ অসাধারণ যত্ন ও শ্রম

করিলেন।'[৮৯] অর্থাৎ কবি কাব্যে তা সামান্য পরিবর্তন করে রাজবংশের মহিমাকীর্তনের সূত্রে তাকে দেবীগন্ধে অভিষিক্ত করলেন। তাতে কারোর কোনো সমস্যা রইল না; ইতিহাসের অংশ বিশেষও কাব্যে থাকল আবার রাজবংশের দৈবীপ্রভাবও থাকল। সমালোচক নন্দিতা বসু-র ভাষায়-'...ভারতচন্দ্র সরাসরিভাবে সমসাময়িক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের শাসকের নাম এবং ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন সত্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে সেই ইতিহাসকে বাস্তব ঐতিহাসিকতা থেকে সরিয়ে নিয়ে ভারতচন্দ্র এক ধরনের পৌরাণিকতায় পর্যবসিত করেছেন। পৌরাণিকতা বলতে বুঝব যেখানে ঘটনার বর্ণনার মধ্যে কল্পনার মাত্রাধিক স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে গৌণ করা হয়েছে।'[৯০] উপরিউক্ত বক্তব্যের পুরোটাই যে ভারতচন্দ্রর *অন্নদামঙ্গল* কাব্য সর্ম্পকে খাটে, আশা করি এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কাব্যের আরো নানা অংশে এর প্রয়োগ ঘটেছে।

কাব্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গ এসেছে। বারোভূইয়া-র মধ্যে অন্যতম রাজা, কিন্তু রাজা প্রতাপাদিত্য এখানে যুদ্ধ হেরে গেছেন। মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদার-এর সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় রাজা প্রতাপাদিত্য-র অন্তিম পরিণতি-

প্রতাপাদিত্য রাজা মৈল অনাহারে

ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে।[৯১]

অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য-র মত রাজাকে ঘৃতে ভাজা যায়, এ রকম অসাধ্য সাধন কবি করেছেন; আর করবেন না কেন? দেবী অন্নদা যার প্রতি বিমুখ এবং যেহেতু পোষ্টার রাজবংশকে খেতাব পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রাখতে হবে সেই জন্য তাঁর মতো রাজাকে ঘিয়ে ভাজা সম্ভব, এতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নেই।

'মানসিংহের ভবানন্দ-বাটী আগমন' অংশে দেবী অন্নপূর্ণাকে দুর্গা দেবীর সাথে একত্র করে দেখানো হয়েছে-

মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।

মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী।।[৯২]

মুণ্ডমালাতন্ত্র [৯৩]-র চতুর্থ পটলে 'দুর্গাশতনামস্তোত্রম্' অংশে দুর্গার এই নামগুলির কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায়- মাহেশী, মহেশশক্তি, মহিষাসুরমর্দ্দিনী প্রভৃতি। স্পষ্টতই দেবী অন্নপূর্ণাকে দুর্গার সাথে অভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। *মায়াতন্ত্র*-এও এর উল্লেখ আছে-

যা দুর্গা সা মহাকালী তারিণী চ মহেশ্বরী।

অন্নপূর্ণা চ সা মায়া গহিণাং কল্পশাখিনী।।

-'যিনি দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই তারিণী, তিনিই মহেশ্বরী [গণেশ্বরী] এবং তিনিই অন্নপূর্ণা।'[৯৪]

'পাতশাহের দেবতানিন্দা' অংশে সমাজচিত্রের একটি রূপ ফুটে উঠেছে। মানসিংহ জাহাঙ্গীরের কাছে ভবানন্দের কীর্তি প্রকাশ করলে 'পাতশা' দেবতা নিন্দা শুরু করেন।

আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।

কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম।।

সয়তানে বাজি দিল না পেয়ে কোরাণ।

ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ।।[৯৫]

অপরদিকে জাহাঙ্গীরের প্রতি মজুমদারের উত্তর-

ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।

সয়তানবাজী সেই এ যদি প্রমাণ।।

সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।

সেই সয়তানবাজী কহিতে কি ভয়।।

হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।

কানে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ।।[৯৬]

এখানে জাহাঙ্গীরের ধর্ম বাক্য শুনে বোঝা যায় পরধর্মের প্রতি তৎকালীন অন্য ধর্মের মানুষজন শ্রদ্ধাশীল নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রীতি ইতিহাস স্বীকৃত, কিন্তু চৈতন্য বিদ্বেষ অত্যন্ত ছিল। বিদ্বেষের সাক্ষ্য ইতিহাসেও পাওয়া যায়, শ্রীহরিদাস দাসের বক্তব্য অনুসারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর দোর্দণ্ডপ্রতাপে নবদ্বীপের 'শ্রীগৌরমূর্তিকে ছয়মাস যাবৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কাইত রাখা হয়েছিল।'[৯৭] অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বর মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থেকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন, তাহলে পরধর্ম সহিষ্ণুতা যে কত নগণ্য পরিমাণে সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল তা সহজেই অনুমেয়। একথাও

আমাদের মাথায় রাখতে হবে কবি সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা রাজার আদেশ পালনার্থ এই কাব্য লিখছেন, সেক্ষেত্রে রাজাদেশ শিরোধার্য।

'অন্নপূর্ণার সৈন্যবর্ণন' অংশে 'ডাকিনী', 'যোগিনী', 'শাখিনী', 'পেতিনী' ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে তা পূর্বে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছি। প্রসঙ্গত দেবী অন্নপূর্ণাও কিন্তু পৌরাণিকতার আধারে স্থিত দেবী নন, সেও কিন্তু প্রতিশোধ পরায়ণা দেবী।

মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই

দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই।[৯৮]

অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ রাজনীতি ও সমাজজীবনে কতখানি সত্য ছিল তা ভারতচন্দ্র লক্ষ করেছিলেন; সে কারণে যুগবৈশিষ্ট্য দেবী অন্নদার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্ষমতার নিদর্শন দেখাতে দিল্লির বাদশাহও মানতে বাধ্য হয়েছে। জাহাঙ্গীর বলতে বাধ্য হয়েছে-

জাহাঙ্গীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।

ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা।।

জাহাঙ্গীর ঢেঁড়া দিল সকল সহরে।

অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে।।[৯৯]

'অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ' অংশে পুরাণের পাশাপাশি তন্ত্রের ব্যবহার কবি সুকৌশলে করেছেন। কবির বর্ণনায়-

ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।

নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহূতী।।

আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন।

শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজ্জন।।[১০০]

সমালোচক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য-র ভাষায়-'মার্কণ্ডেয়পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভবধ উপাখ্যানে চন্ডমুন্ডবধের পর দৈত্যপতি শুম্ভের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে দেবীকে সাহায্যের জন্য ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী এই সপ্তমাতৃকা বা ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কুমার কার্তিকেয়, বিষ্ণুর বরাহাবতার ও নৃসিংহাবতারের শক্তি দেবীকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে দৌত্য করার জন্যে দেবীর দেহ নিষ্ক্রান্তা শক্তি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন।'[১০১]

অপরদিকে এই অংশে অন্নদাদেবীর সঙ্গীগণের মধ্যে 'হাকিনী'-র উল্লেখ আছে। তন্ত্রে 'হাকিনী' সম্পর্কে বলা হয়েছে-

হাকিনী ঋক্ষবদনা নীলনীরদসন্নিভা।

কপালশূলহস্তা চ খেটকৈরুপশোভিতা।

একদ্বত্রিচতুঃপঞ্চষন্মুখী সরভাভয়া।।

-'হাকিনী ভল্লুকবদনা, নীলনীরদসন্নিভা, তাঁর হস্তে কপাল ও শূল এবং তিনি খেটকশোভিতা। তিনি একমুখী, দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, চতুর্মুখী, পঞ্চমুখী, ষন্মুখী, সরভা এবং অভয়া।'[১০২]

খণ্ডের পরবর্তী অধ্যায়ে যেমন সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে তেমনি তার সাথে সাথে কাহিনী পরিণতির দিকেও অগ্রসর হয়েছে। ভবানন্দের দুই পত্নী নিয়ে কোন্দল তৎকালীন সমাজের দ্বন্দ্বমুখর দিকই প্রকাশিত। কবির বর্ণনায়-

দু' সতীনের ঘর   পতিরে ঘুচে ডর

কোন্দলের হয় বাড়াবাড়ি।[১০৩]

'অন্নদার এয়োজাত' অংশে কবি পুরাণ ও তন্ত্র উভয়েরই মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। *মুণ্ডমালাতন্ত্র*-র 'দুর্গাশতনামস্তোত্রম্'-এ নামের বহুল ব্যবহার এখানে উল্লেখিত। কাহিনীর শেষাংশে 'রাজার অন্নদার সহিত কথা' অংশে দেবী অন্নদার নানা রূপের অবতারণা করেছেন-

অম্বিক অন্নদা   শঙ্করী সারদা

জয়ন্তী জয়কারিণী।

চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা

ত্রিপুরা ত্রিশূলধারিণী।।

মহিষমর্দ্দিনী মহেশমোহিনী

দুর্গা-দৈত্যবিনাশিনী।

ভৈরবী ভবানী সর্ব্বাণী রুদ্রাণী

ভয়ার্ত্ত-চিত্তচারিণী।।[১০৪]

যেহেতু রাজা তাই দেবীর সাথে সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভব। কবি দেবী অন্নপূর্ণাকে মহামায়া, চণ্ডী, কালিকা সমস্ত শক্তির সাথে অভেদ্যরূপে কল্পনা করেছেন। 'মানসিংহ' খণ্ডে কবি কাহিনীকে তন্ত্র অপেক্ষা ইতিহাস ও কল্পনার মেলবন্ধনে নবরূপে উপস্থাপন করেছেন। কাহিনীর নবমাত্রা সংযোজনে কবি ভারতচন্দ্র যেমন পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি ঐতিহাসিক কাহিনী স্থান-কাল-পাত্রকে সামান্য সংযোজন-বিয়োজনে মঙ্গলকাব্যের আধারে 'নূতনমঙ্গল' রচনা করেছেন যা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে এক ও অদ্বিতীয়।

দ্রষ্টব্য

১. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *পৌরাণিকা*-র, ২য় খণ্ডে পীঠস্থান প্রসঙ্গে 'কুব্জিকা তন্ত্রে ৪২-টি, জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে ৫০টি, তন্ত্রসারে ৫১-টি পীঠের নাম পাওয়া যায়' বলে উল্লেখ করেছেন।

২. *মহানির্ব্বাণতন্ত্র*-এর পঞ্চম উল্লাসে 'বীরাসন ও বিজয়া শোধন' অংশে শোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'অঞ্জলিপুটের অগ্রদেশ অধোমুখ করিলে তাহাকে আবাহনী মুদ্রা কহে। এই মুদ্রার বিপরীত করিলে অর্থাৎ পুটভাব হস্ততলযুগল উপুড় করিয়া অধোমুখ করিলে তাহাকে স্থাপনীমুদ্রা কহে। করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধকরতঃ বদ্ধমুষ্টি সংযুকত করিলে তাহার নাম সন্নিধাপনীমুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠযুগল মধ্যে রাখিয়া ঐ প্রকার হস্তযুগলের মুষ্টিবন্ধন করতঃ সংযোগ করিলে তাহাকে সন্নিরোধিনীমুদ্রা কহে। উত্তান মুষ্টিযুগল যদি সংযুক্ত করা যায় তাহার নাম সম্মুখীকরণীমুদ্রা।'

৩. মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কেমন ধরনের অবস্থা ছিল, তা বোঝাবার জন্য আমি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত *অমাবস্যার গান* থেকে একটি অংশ তুলে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করলাম-'আগে যাঁরা প্রজাপালন করতেন, এখন তাঁরা আখ-মাড়াইয়ের জাঁতাকেই রাজ্য চালাবার একমাত্র উপায় বলে জেনেছেন; বাইরে থেকে শত্রু কিংবা দস্যুতে আক্রমণ করলে যাঁরা তলোয়ার হাতে আগে বেরিয়ে পড়তেন, এখন তাঁরা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলে বর্গী ভেবে সকলের আগে পালাবার রাস্তা খোঁজেন। বিলাস-ভোগ আগেও ছিল, কিন্তু এখন সেইটেই শেষ কথা।' (পৃ. ৬৪)

এই উক্তির যথার্থ সমর্থন পাওয়া যায় *ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত* গ্রন্থে। গ্রন্থকার জানিয়েছেন-'যৎকালে তাঁহার জমিদারির মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের উপদ্রব সংঘটিত হয়, তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষাকৃত কোন নিরাপদস্থানে বাস করিবার মানস করেন।...নগর পত্তন করিলেন।...নগরের নাম শিবনিবাস দিলেন।' (পৃ. ৬১-৬২)

অর্থাৎ প্রজারা যখন বিপদগ্রস্ত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পরিবারকে নিয়ে সামলাতে ব্যস্ত। প্রজাদের কী ক্ষতি বা বিপদ হল, তা দেখবার সময় তাঁর নেই। এর থেকেই বোঝা যায় তৎকালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য,* বিশ্বভারতী, ১৪১৯ বৈশাখ, পৃ. ৭৭ ।

২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, নবম সংস্করণ ১৯৯৭ অক্টোবর, পৃ. ১০৯।

৩. তদেব,পৃ. ১৩৪।

৪. তদেব,পৃ. ১৫৫।

৫. তদেব,পৃ. ১৩৭।

৬. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল,* মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ৬১-৬২।

৭. তদেব,পৃ. ৬২।

৮. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮১।

৯. তদেব,পৃ. ৭৯।

১০. তদেব,পৃ. ৮৭।

১১. দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় রচিত *ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত* ; কাঞ্চন বসু সম্পা., *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩,* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ২০০২ জানুয়ারি, পৃ. ৬১-৬২।

১২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮০।

১৩. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *শাক্তপদাবলি ও শক্তিসাধনা,* ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ২৩২।

১৪. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮০।

১৫. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ২৩৮।

১৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৭৫।

১৭. উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পা., *কুলার্ণবতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা; ১৪০৭, পৃ. ২১৯-২২০।

১৮. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৭৮।

১৯. *অন্নদাকল্পতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৩, পৃ. ৩৯।

২০. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮২।

২১. *অন্নদাকল্পতন্ত্র,* ঐ, পৃ. ৩।

২২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮২।

২৩. রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত *প্রাণতোষণীতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা; ১৩৮৩।

২৪. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা. , *বৃহদ্ধর্মপুরাণ,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ১৪৮।

২৫. পঞ্চানন শাস্ত্রিণা অনূ., *মুণ্ডমালাতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৩৫।

২৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮২।

২৭. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ।

২৮. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮২।

২৯. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ২৩৫।

৩০. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮২।

৩১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৪০৬।

৩২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৩।

৩৩. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৯১৩।

৩৪. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৩।

৩৫. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ।

৩৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৩।

৩৭. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব* ,ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩০২।

৩৮. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৩।

৩৯. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৬৫।

৪০. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৩।

৪১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৭৬।

৪২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৩।

৪৩. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৬২।

৪৪. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৩।

৪৫. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৪৪।

৪৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৫।

৪৭. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৩৪২।

৪৮. উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পা., *কুলার্ণবতন্ত্র*, ঐ, পৃ. ২৬২।

৪৯. তদেব, পৃ. ২৬২।

৫০. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৩৪৬।

৫১. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮৬।

৫২. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা*, ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮, পৃ. ৫৩।

৫৩. তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, *সাধনজীবন ও দশমহাবিদ্যা*, দে'জ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১৮ মে।

৫৪. দীনেশচন্দ্র সরকার, *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃ. ৬১।

৫৫. মদনমোহন গোস্বামী, *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র*, নালন্দা প্রেস, কলিকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ২৫৮।

৫৬. তদেব, পৃ. ২৫৯-২৬১।

৫৭. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৯৪।

৫৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, পৃ. ৬১৮-৬১৯।

৫৯. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৯৬।

৬০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূ., *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৭, পঞ্চম উল্লাস, পৃ. ৬৫।

৬১. তদেব, পৃ. ৬৬।

৬২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৯৭।

৬৩. তদেব, পৃ. ৯৭।

৬৪. তদেব, পৃ. ৯৯।

৬৫. তদেব, পৃ. ১০০।

৬৬. তদেব, পৃ. ১০১।

৬৭. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়,*প্রাক্-পলাশী বাংলা(সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭),* কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৬৫।

৬৮. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা,* দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ১০৩।

৬৯. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১০৩।

৭০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূ., *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্,* ঐ, চতুর্থ উল্লাস, পৃ. ৪২।

৭১. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৮১।

৭২. তদেব, পৃ. ১০৭।

৭৩. তদেব, পৃ. ১০৭।

৭৪. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূ., *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্,* ঐ, চতুর্থ উল্লাস, পৃ. ৪৩।

৭৫. *অন্নদাকল্পতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা; ১৩৮৩, পৃ. ৩।

৭৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১১১।

৭৭. তদেব, পৃ. ১১০।

৭৮. *অন্নদাকল্পতন্ত্র*, ঐ, পৃ. ৪১।

৭৯. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১১০।

৮০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খন্ড, ঐ, পৃ. ৭৫।

৮১. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১১৯।

৮২. তদেব, পৃ. ১২৭।

৮৩. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা., *নির্ব্বাণতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৭।

৮৪. পঞ্চানন শাস্ত্রিণা অনূ., *মুণ্ডমালাতন্ত্রম্*, ঐ, পৃ. ৭৩।

৮৫. পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পা., *তোড়লতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪২৫, পৃ. ৬।

৮৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১২৯।

৮৭. তদেব, পৃ. ১৩২।

৮৮. তদেব, পৃ. ১৭।

৮৯. দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় রচিত *ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত*; কাঞ্চন বসু সম্পা., *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩*, ঐ, পৃ. ৫০।

৯০. জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় ও নবেন্দু সেন সম্পা., *অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ২০০৬, পৃ. ১২৫।

৯১. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১৩৮।

৯২. তদেব, পৃ. ১৩৮।

৯৩. পঞ্চানন শাস্ত্রিণা অনূ., *মুণ্ডমালাতন্ত্রম্*, ঐ, পৃ. ৬৯।

৯৪. জ্যোতির্লাল দাস সম্পা., *মায়াতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৬।

৯৫. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১৪১।

৯৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১৪২।

৯৭. সুধীর চক্রবর্তী, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও উপসম্প্রদায়*, অবন্তীকুমার সান্যাল, অশোক ভট্টাচার্য সম্পা., *চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান*, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২২৯।

৯৮. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ।

৯৯. তদেব, পৃ. ১৪৮।

১০০. তদেব, পৃ. ১৪৭।

১০১. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৩৪৩।

১০২. উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত, *কুলার্ণবতন্ত্র*, ঐ, পৃ. ২৬৩।

১০৩. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১৫৪।

১০৪. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১৬০।

কালিকামঙ্গল

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের একটি শাখা হল *কালিকামঙ্গল* কাব্য। সাধারণত মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীদের মহিমা কীর্তন মূল উদ্দেশ্য থাকে এবং তার পাশাপাশি যেখানে দেবীর পূজা প্রচারের সাথে সম্পর্কিত একটি কাহিনী বা আখ্যান গড়ে তোলা হয়। *চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* কাব্যের ক্ষেত্রে সেই ভাবেই কাব্য শরীর কবিরা নির্মাণ করেছেন। *কালিকামঙ্গল* কাব্যর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে দেবী কালিকার গুণ কীর্তন কম বিদ্যাসুন্দর-এর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের উপরে কবিরা বেশি জোর প্রদান করেছেন। এখানে দেবী কালিকা কাব্যে হয়ে গেছেন গৌণ, তাঁর ভূমিকা কিছুটা সহায়ককারীর মতো, প্রয়োজন ভিন্ন তাঁর দেখা মেলে না।

কালিকামঙ্গল কাব্যের ধারাকে কবিরা নানান শতাব্দীতে নানা ভাবে পুষ্ট করেছেন। কবিরা বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীকে নব রূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সঙ্গে রাজাদেশে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী সংযোজন করেন। তাঁকেই এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অন্যান্য কবিদের মধ্যে প্রাণরাম কবিবল্লভ, বলরাম চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ সেন উল্লেখযোগ্য হলেও কবি ভারতচন্দ্রের মতো কেউ অনন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেননি; সময়োচিত যুগ পরিবেশ দিয়ে কবি তাঁর কাব্যকে নির্মাণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন রঙ্গ-ব্যঙ্গের দৃষ্টি। অন্যান্য কবিদের কাব্যের ক্ষেত্রে সেই উপাদান অনুপস্থিত ছিল অনেকাংশে সেজন্য তাঁদের কাব্য জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌঁছায়নি।

দেবী কালিকার স্বরূপ পুরাণ, তন্ত্রে নানা ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নানা সমালোচক নানাভাবে দেবী কালিকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দেবী কালিকা শক্তিতত্ত্বেরই অংশ বিশেষ, স্বয়ং দশমহাবিদ্যার রূপ। পরম ভৈরবী রূপে জগৎ সংসারকে তিনি চালনা করছেন। মহাকাল অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলেই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই জন্য তিনি আদ্যা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বলেই দেবী কালী, তাঁর মধ্যেই সব কিছু লীন হয়ে যায়। এই ধরনের নানা ব্যাখ্যা দেবী সম্বন্ধে চলে।

কাব্যে যেমন কবিরা সমাজের নানা দিক, অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন তেমনি তন্ত্রের নানা অনুষঙ্গ, সাধন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। কবিরা সমসাময়িকতা থেকে এই উপাদান হয়তো গ্রহণ করেছিলেন কিংবা তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের প্রভাব কাব্যে পড়ে থাকতে পারে। রামপ্রসাদ নিজে তন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন তাই তাঁর কাব্যে তন্ত্রের নানা উপাদান উল্লেখিত হয়েছে। আবার কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে রাজধর্মের ছায়া। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে শাক্ত মত পোষণ করতেন, তাই তার ইঙ্গিত কাব্যে ধরা পড়েছে। সুন্দরের দেবী আরাধনা, চৌতিশা স্তব, মশানে দেবী কালিকার আরাধনা ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে তন্ত্রের ভাবধারা লক্ষণীয়। তাই তন্ত্রের উপাদানগুলি আলোচনার পাশাপাশি সমাজের কোন স্তরে এর প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান তাও আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হবে।

কৃষ্ণরাম দাস

কবি কৃষ্ণরাম দাস *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারার একজন বিশিষ্ট কবি। কবি *কালিকামঙ্গল* কাব্য ছাড়াও আরো অনেক অপ্রধান মঙ্গলকাব্য লিখেছিলেন কিন্তু অন্যান্য কাব্যের তুলনায় *কালিকামঙ্গল* কাব্যের পরিধি একটু বড়। তাঁর এই কাব্যটির পুঁথি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি শেষের দিকে খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। যেটুকু অবস্থায় পাওয়া গেছে তাতে তাঁর কবিত্বের ছাপ স্পষ্ট। কবির আবির্ভাবকাল নিয়ে সমালোচক মহলে যথেষ্ট দ্বিমতের অবকাশ আছে। কবি তাঁর নিজের কাব্য রচনাকাল নিয়ে একটি সূত্র কাব্যে উল্লেখ করেছেন-

বলে কবি কৃষ্ণরাম নিমিতা তাহার গ্রাম

যথা হৈল কালির মঙ্গল।।

বসু নব বাণ ইন্দু সক এই গুণসিন্ধু

বিচারিয়া বুঝহ সকল।।[১]

সূত্র অনুযায়ী কবির কাব্যরচনাকাল দাঁড়ায় ১৫৯৮ শক এবং কবি একদম কাব্যের শুরুতে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

সেই গ্রাম মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস

কায়েস্থ কুলেতে উতপতি।

তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই

বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি।।[২]

বাংলা রীতি অনুযায়ী কবির বয়স এই গ্রন্থ লেখার সময় কুড়ি বছর হলে ১৫৭৮ শকাব্দ নাগাদ কবির সম্ভাব্য জন্মকাল হতে পারে। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মতে-'...অবশ্য তিনি ১৫৭৮ শকাব্দের (১৬৫৬-৫৭ খ্রীঃ) শেষ দিকেও জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারেন; তা করলে তাঁর বিংশ বর্ষের শেষাংশ ১৫৯৮ শকাব্দের গোড়ায় পড়ে। মোটের উপর, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়েছিল মনে করলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম।'[৩] এছাড়াও কবির আবির্ভাবকাল নিয়ে আরো মতামত পোষণ করেন সমালোচকরা।দ্র.১ সেই তুলনায় কবির নিজের লেখা সময়কাল অধিক গ্রহণযোগ্য বলে আমার মনে হয়।

কবি কৃষ্ণরাম দাস কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করেছেন-

দুর্গততারিণী আসি দরশন দিলা বাসি (বসি)

এই নাম সফল কারণে।।

বলে কৃপামই দেবী শুন কৃষ্ণরাম কবি

গীত কর আমার মঙ্গল।[৪]

কবিও অন্যান্য কবিদের মতো প্রথমে পুরাণের অবতারণা করে তারপর বিদ্যা সুন্দরের আখ্যানে প্রবেশ করেছেন। কবি দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়েছেন এভাবে-

তিন লোকে পূজা করে পরম পীরিতি।।

আদ্যাশক্তি মহামায়া সকলের সার।

তার ঘরে জনম লভিলা অবতার।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি দেবতা সকল।

ধেয়ানে না পায় জার চরণ কমল।।[৫]

দেবী কালিকা মহামায়ার আরেক অংশ। শুধুমাত্র রূপের ভেদ। তিনিই একাধারে মহাশক্তি আবার একাধারে জগতের নিয়ন্ত্রকও বটে। সমালোচক সনৎকুমার নস্কর-এর মতে-'...শক্তিদেবীর অজস্র রূপভেদ থাকলেও স্বরূপত তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এই শক্তি মহাশক্তি নামে পরিগণিত, যিনি জলস্থল অন্তরীক্ষ চরাচরে ব্রহ্মের মতো সর্বত্র বিরাজিতা। ইনিই সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিরূপে বন্দিতা।'[৬]

দেবী কালিকা ও আদ্যাশক্তির সঙ্গে কোন ভেদ নেই। একে অপরের পরিপূরক। সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আদ্যাশক্তি' সম্পর্কে বলেছেন-'আদি শক্তি বা প্রকৃতি। দুর্গা, কালী, নারায়ণী, মহামায়া। দার্শনিক বিচারে মূল আদি শক্তি।'[৭] সেই হিসাবে দেবী কালিকার সঙ্গে আদ্যাশক্তি একাত্ম। তাঁর মধ্যেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের ঐকান্তিক সমাবেশ ঘটেছেই বলে তিনি জগতকে ধারণ করে চালিকা শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সমালোচক সুখময় ভট্টাচার্য-র মতে- 'প্রকৃতি শব্দ চিত্তকে বুঝাইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতিই বুদ্ধি প্রভৃতির মূল কারণ।'[৮] কবি এই মূল প্রকৃতির আবাহন এই কাব্যে করেছেন-

রজগুণে আপনি অখিল সির জিয়া।

সত্ত্বগুণে পালন করহ মন দিয়া।।

তমগুণে নিদারুণ সংহার কারণ।।[৯]

দেবীর বর্ণনায় কবি আরো বিষয় স্পষ্ট করেছেন-

বুদ্ধিরূপে সবলোক হৃদয়বাসিনী।

স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়িনী নম নারায়ণী।।

সর্ব্বমঙ্গলাযুক্তা সর্ব্বার্থসাধিনী।

গুণাশ্রয় গুণময় নম নারায়ণী।।

শরণাগতের পরিত্রাণ পরায়ণী।দ্র.২

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কারিণী সনাতনী।

ঘোররূপা মহারাব নম নারায়ণী।।

লক্ষ্মী লজ্জা বিদ্যা শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধানিদ্যা।

নম নারায়ণী মহারাত্রি মহাবিদ্যা।।

মেধা তুমি সরস্বতী ত্রিজগত সারা।[১০]

এখানে দেবী কালিকাকে নানা নামে নানা রূপে সম্বোধন করেছেন। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাসের মতে- ‘পরাশক্তির বিভিন্ন নাম ও রূপ। তিনি মূলা প্রকৃতি। যাঁর প্রকৃতি নাই তাঁকেই মূলা প্রকৃতি বলা হয়।’[১১] দেবীর এই পরিচয়কেই কবি সামনে আনতে চেয়েছেন। আবার দেবী কালিকার যে রূপ কবি অঙ্কন করেছেন সেটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ-

নরমালা বিভূষিতা অসিপাশ মুঠি।

বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটি।।

শুষ্ক মাংস ঘোর অতি বিস্তার বদনা।

লহ লহ করে লোল লোহিত রসনা।।[১২]

দেবীর এই ভয়াল রূপের একটি তাৎপর্য বিদ্যমান। দেবীর পরনে ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে আছেন। এই চর্ম পুরুষ ও প্রকৃতির একাত্মতার প্রতীক। দেবীর জিহ্বা লোল জিহ্বা অর্থাৎ 'রসনার সংযম। অর্থাৎ বাক সংযম ও লোভ জয়।'[১৩] এছাড়া দেবীর গলে মুণ্ডমালা ধারণ করে আছেন। 'দেবীর সাধনা তন্ত্র-তনু, মন্ত্র ও যন্ত্র-চক্রের সাধনা। পঞ্চাশৎ বর্ণই হল পঞ্চাশৎ মুণ্ডের মালা। এই পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারাই সকল মন্ত্র গ্রথিত হয়েছে।'[১৪] তন্ত্রেও এই রূপের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। *বিশ্বসারতন্ত্র*-এ বলা হয়েছে 'দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও মুণ্ডমালাশোভিতা। তাঁর দুই দক্ষিণ হাতে রয়েছে খড়্গ ও নীলপদ্ম, বাম হাতদুটিতে কর্তরি ও খর্পর। গলায় ও মাথায় ঝুলছে মুণ্ডমালা, বক্ষে সর্পহার, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্মযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ।'[১৫] তন্ত্রের এই ছায়া কবির কাব্যেও লক্ষণীয়।

এছাড়াও কবি তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের প্রতিফলন কাব্যে ঘটিয়েছেন। কবির বর্ণনায়-

হরগৌরী এক অঙ্গ বেদের প্রমাণ।

ইহা ভেদ করিলে নরকে হয় স্থান।।[১৬]

তন্ত্রে শক্তি ছাড়া সৃষ্টি অচল। এমনকি দেবাদিদেব শিবও শক্তি ব্যতীত এক পাও এগোতে পারেন না। তন্ত্রে উল্লেখিত-

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,

নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

-অর্থাৎ '(জননি!) যদি শিব শক্তির সহিত মিলিত হন, তাহা হইলেই সমগ্র সংসার অধিকার করতে সমর্থ হইয়া থাকেন; নতুবা তিনি স্বয়ংও স্পন্দিত হইতে সমর্থ হন না।'[১৭] দেবীর সঙ্গে জগতের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই বার বার করে কবি উল্লেখ করেছেন তিনি সমস্ত দেবতার ভজনার সূত্র। তাকে ভজনা করলে সমস্ত জ্ঞানের চর্চাও সম্পন্ন হয়-

জত বিদ্যা আর বেদ   সকলি তোমায় ভেদ

তুমি দেবী জগত-জননী।। [১৮]

বা

জগতজননী এই মহামায়া দেবী।

ব্রহ্মা নারায়ণ সব জার পদ সেবি।। [১৯]

এছাড়া কবি দেবীর দেহের অংশ স্বরূপ সিদ্ধ পীঠস্থানের কথা বলতে গিয়ে কামরূপের উল্লেখ করেছেন-

জথা জথা পড়িল সতীর কলেবর।

সিদ্ধপীঠ মহাস্থান হইল সকল।

কামরূপ আদি করি অষ্ট পীঠ গণি।

জাহার কারণে ধন্য হইল ধরণী।।[২০]

তন্ত্রশাস্ত্রে এর নিদান পাওয়া যায়, তন্ত্রে উল্লেখিত-

কামাখ্যা সৈব বিখ্যাতা সত্যং দেবি ন সংশয়ঃ।

সৈব ব্রহ্মেতি জানীহি যজ্ঞার্থং দর্শনানি চ।।

বিচরন্তি চোৎসুকানি যথা চন্দ্রে হি বামনঃ।

তস্যাং হি জায়তে সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্।।

লীয়তে পুনরস্যাঞ্চ সন্দেহং মা কুরু প্রিয়ে।

-অর্থাৎ 'আদ্যাশক্তি কামাখ্যা হইতেই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। হে প্রিয়ে ! পুনরায় সেই মহাশক্তিতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে।'[২১] কবি সেই কামরূপ কামাখ্যাকেই উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছেন সমস্ত পীঠের মধ্যে 'কামরূপ' সর্বশ্রেষ্ঠ।দ্র.৩

দেবী কালিকার মাহাত্ম্য ছাড়াও দেবীর নানান অংশের কথা কবি এখানে বলেছেন যারা দেবীর সহায়ক শক্তি হিসাবে পরিচিত। এঁরাও দেবীর প্রত্যক্ষ অংশ, তন্ত্রে দেবী আদ্যাশক্তির অংশ রূপে পরিচিত। শাস্ত্রে এঁরা দেবীর সহচরী, দেবীর প্রয়োজনবোধে এঁদের উৎপত্তি ঘটে। দেবী আসুরিক শক্তি বিনাশে যেমন কাব্যে কবি তাঁদের উপস্থিত করেছেন-

মাহেশ্বরী বৃষরাজে শিরে চন্দ্রকলা সাজে

সাপের বলয়া শূল হাতে।।

আইলা কৌমারী দেবী ভুবনমোহন ছবি

শিখী পিঠে করেতে শকতি।

অম্বিকা পরম রঙ্গে   যুঝিতে অসুর সঙ্গে

ষড়ানন রূপ শীঘ্র গতি।।[২২]

আবার কাব্যের অন্যত্র তাঁরা সরাসরি পূজাও পেয়েছে-

ষোড়শ মাতৃকা পূজি বসুধারা দিল।।

নান্দীমুখ করিয়া আনন্দ বড় মনে।[২৩]

সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[২৪] এই 'ষোড়শ মাতৃকা'-র নাম উল্লেখ করেছেন- গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বাহা, স্বধা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা, আত্মদেবতা। গ্রন্থভেদে আবার এই তালিকা অন্য রকমের হয়।

কাব্যে কবি এই রকম নানা ধরনের তন্ত্রের উপাদান ব্যবহার করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সুন্দরের বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেও কবি সরাসরি তন্ত্রশিক্ষার কথা বলেছেন শাস্ত্রশিক্ষার পাশাপাশি-

মুণ্ডমালাতন্ত্র আর রহস্যযামল।

কুমারী বারাহীকল্প পুরাণ সকল।।

পঠিয়া সকল শাস্ত্র অস্ত্র শিক্ষা কৈল।

ধনুকে অর্জুন সম বিচক্ষণ হৈল।।

ব্যাসের সমান কবি শশি জিনে যশে।[২৫]

কাব্যে এর পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের উপাদানও লক্ষ করা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে যৌতুক প্রথা যেটা সেই সময়ে বিয়ের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল-

কৌতুকে যৌতুক দিল মেনকা আনিয়া।

অমূল্য নানান দ্রব্য জানিয়া জানিয়া।।[২৬]

মেয়েদের খুব কম বয়সে বিবাহ হত; তাদের পছন্দের কোনো মূল্য দেওয়া হত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুড়ো বা বয়স্ক বর জুটত। কন্যার মায়ের সেই কারণে মনে দুঃখ থাকলেও কিছু করার থাকত না। কন্যার বিয়ের প্রসঙ্গে মেনকার খেদোক্তি-

মেনকার সাধ ছিল বিধি তাহা পুরাইল
যেন কন্যা তেমন জামাই।
ভাল বরে দিল বিয়া তবে দুঃখ পায় গিয়া
বাপ-মার হাত কিছু নাই।।
না বুঝি কেমন সে পুরুবে কহিল জে
যোগী দিগম্বর বর বুঢ়া।[২৭]

সমাজের এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে কারোর কিছু করার ছিল না, এই অমানবিক প্রথার সম্মুখীন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ভবিতব্য ছিল। মেয়েদের ললাট লিখন ছিল স্বামী যেমনই হোক তাকে কোনোভাবেই ত্যাগ করা যাবে না; সমাজের রীতি ছিল স্বামীকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করতে হবে তা নইলে সমাজের চোখে সে নারী বর্জিতা রূপে গণ্য হবে-

বলে সতী বিনে গতি আর কি।
মরি গিয়া বল মোরে পাষাণের ঝি।।[২৮]

বা

পতি বিনে গতি নাঞি জনক জননী ভাই
অপত্য সম্পদ কিছু নয়।[২৮]

কবির আমলে সমাজের সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল ছিল তার ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন-

ওরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্ব্বলোকে বলে।
নবাব সাহেস্থা খাঁ আদি করি সাত গাঁ

বহু সরকার করতলে।। ৩০

নবাব ঔরঙ্গজেবের সময় শাসনকাল কেমন ছিল এটি কারোর অজানা নয়। সুতরাং কবির সময়ে যে খুব সুস্থির পরিবেশ ছিল তা অনুমান করা যায় না। কবির কাব্য পুরো অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়নি; যতখানি পাওয়া গেছে তাতে *বিদ্যাসুন্দর*-এর আখ্যান পুরোটা শেষ হয়নি। যতখানি কাব্যের বিবরণ পাওয়া যায় তাতে কবি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্রষ্টব্য

১. সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থে একটি মত উল্লেখ করেছেন কাব্যের রচনাকাল *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*-এ প্রাপ্ত একটি পুঁথির ভিত্তিতে-

সারসাসানের (সারসাসনের) নেত্র ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র

তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।

বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম

বুঝ সকল (শক) বিচারিয়া তবে। (পৃ. ১৮৯)

এই শ্লোকের ভিত্তিতে সমালোচক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শকাব্দ গণনা করেছেন অর্থাৎ ১৬৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দ। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই মতকে মান্যতা দিলেও কবির কাব্যে লিখিত কালজ্ঞাপক শ্লোককেই অধিক গ্রহণ করেছেন।

২. সমালোচক সনৎকুমার নস্কর কাব্যের ওই অংশের সঙ্গে চণ্ডীস্তবের এই অংশের মিল দেখিয়েছেন-

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে।। (পৃ. ৬৯)

দেবীর রূপ ভিন্ন হলেও দেবী শক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ সেটি বোঝাতে এখানে এই শ্লোক ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস 'কামরূপ' সম্পর্কে বলেছেন- 'গৌহাটী শহরের অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে পাহাড়ের উপর কামাখ্যা মহাপীঠ। এইটিই প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম কামরূপপীঠ। একাধিক তন্ত্রে এবং পুরাণে এই মহাপীঠের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে। একে কামরূপ-কামাখ্যাও বলা হয়। পীঠনির্ণয়ে এই পীঠের নাম দেওয়া হয়েছে কামগিরি। এখানে পড়েছিল দেবীর মহামুদ্রা বা যোনি।' (পৃ. ১৬৬)

তথ্যসূত্র

১. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , *কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল* , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ. ১৮৩।

২. তদেব, পৃ. ৮৩।

৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,* ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ১৯১।

৪. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , ঐ, পৃ. ৮৩।

৫. তদেব, পৃ. ৮৫।

৬. তদেব, পৃ. ২৪।

৭. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা,* ১ম খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ. ১৫১।

৮. সুখময় ভট্টাচার্য, *তন্ত্রপরিচয়,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ৮৪।

৯. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , ঐ, পৃ. ১০৯।

১০. তদেব, পৃ. ১৭৮।

১১. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৪৯।

১২. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৬২।

১৩. তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী সম্পা. , *সাধনজীবন ও দশমহাবিদ্যা,* দে'জ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ১৬৫

১৪. তদেব, পৃ. ১৬৫।

১৫. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , ঐ, পৃ. ২৭-২৮।

১৬. তদেব, পৃ. ১৮৫।

১৭. শঙ্করাচার্য, *আনন্দলহরী* , নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ৩।

১৮. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৭৭।

১৯. তদেব, পৃ. ১৮২।

২০. তদেব, পৃ. ১১০।

২১. জ্যোতিলাল দাস ও সৌম্যানন্দ দাস সম্পা. , *কামাখ্যাতন্ত্রম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৮, পৃ. ৭৭-৭৮।

২২. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৬৮।

২৩. তদেব, পৃ. ১৯৫।

২৪. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা,* ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮, পৃ. ৬৫৫।

২৫. সনৎকুমার নস্কর সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৯৮।

২৬. তদেব, পৃ. ১৪১।

২৭. তদেব, পৃ. ১৩২।

২৮. তদেব, পৃ. ১৯২।

২৯. তদেব, পৃ. ১৫৪।

৩০. তদেব, পৃ. ৮৪।

দ্বিজ রাধাকান্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ লগ্নে *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারার যে স্রোত কবি ভারতচন্দ্রের হাত ধরে পুষ্ট হয়েছিল সেই ধারার ক্ষীণ প্রবাহ পরবর্তী সময়ে কিছু কবি বজায় রেখেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই রাজসভার ধারার ব্যতিরেকে বহু কবি এই কাব্যধারার চর্চাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কবি ভারতচন্দ্র-এর কাব্যের অভিঘাত নাগরিক সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাই বহু কলিকাতা নিবাসী মানুষজন এই কাব্যধারা অনুশীলনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কবি দ্বিজ রাধাকান্ত তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কবি নিজে কলকাতা থাকাকালীন এই কাব্য রচনায় সচেষ্ট হন। কবি নিজের রচনাকাল সম্বন্ধে বলেছেন-

শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে।

এই হেতু হইলা গীত প্রকাশ ভুবনে।।[১]

'গ্রন্থকারের পরিচয়' অংশে বিবৃতি অনুযায়ী কবি ১৬৮৯ শকে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭৬৮-১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কাব্য রচনা করেন। পরিচয় অনুযায়ী কবি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। কবির কাব্যের অভিনবত্ব তার এই পরিচয় অংশে পাওয়া যায়, সেটি হল কাব্য রচনা করার অভিপ্রায়। কাব্যে উল্লেখিত-

কেহ কহে মায়ের হয়াছে প্রত্যাদেশ।

কেহ কহে দিলা দেখা ধরি নিজ বেশ।।

কেহ বলে জিহবাতে কবিতা দিল লিখি।

কেহ কেহ বলে আমি সপনেতে দেখি।।[২]

অর্থাৎ কবি অন্যান্য কবিদের মতো স্বপ্নাদেশ কিংবা দেব-দেবীর প্রত্যাদেশের মতো বিষয়কে কাব্য রচনার উপজীব্য করে তোলেননি, নিজ ইচ্ছায় কবি দেবীর শক্তি বর্ণনা করেছেন, কবির মতে-

বেদে বলে ভগতবৎসলা মহামায়া।

কে জানিবে কেমন কাহার তরে দয়া।।

আপন সম্বাদ বলি সপুট বিনয়।

ভজিলে তাহার নাম অতি উপজয়।।[৩]

নিজের কাব্যকে কবি 'নৌতন মঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের কাব্যের তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি এটিও আমাদের বিবেচ্য বিষয় যে কোন কোন দিক থেকে এটি 'নূতন মঙ্গল' রূপে গৃহীত।

কাব্যের কাহিনীর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় অন্যান্য কবিদের মতোই কবি রাধাকান্ত পৌরাণিক আখ্যান শোনানোর পর বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী শুরু করেছেন। কাহিনীর শুরু করেছেন কবি এইভাবে-

শ্যামার সংগীত সপ্তা করি সমাপন।

আরম্ভিল রসের সাগর জাগরণ।।[৪]

দেবী কালিকাকে কবি 'শ্যামা' নামে অভিহিত করেছেন। দেবী কালিকার অপর নাম শ্যামা। কবি দেবী কালিকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

আধার রূপিণীশ্বরী মুণ্ডমালা দিগম্বরী

শবাসনা শ্মশানবাসিনী।

তুমি জগতের হেতু সংসার-সমুদ্র সেতু

তুমি শ্যামা স্বভাবকারিণী।।

চরাচর বিধায়িনী দিগম্বরী নিতম্বিনী

স্বভাবিনী ভাবে ত্রিভুবনে।।

উদয় প্রলয় ক্ষিতি ইচ্ছাময়ী ভগবতী

আদি শক্তি অখিল জননী।।[৫]

দেবী শ্যামা সম্পর্কে *তন্ত্রসার* গ্রন্থে এই বিষয়ে একই ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে-

প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ, সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।

অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো, মহেশোপি প্রায়ঃ সকলপি কিং স্তৌমি ভবতীম্।।

-অর্থাৎ 'মাতঃ, তুমিই এ সংসার প্রসব করিতেছ, এই জগৎ পালন করিতেছ, প্রলয়সমরে সমস্ত ভূমণ্ডলাদি সংহার করিতেছ ; অতএব তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তুমিই ত্রিলোকপালনকর্ত্তা শ্রীপতি, তুমিই সংহর্ত্তা মহেশ্বর, অধিক কি, তুমিই নিখিল চরাচর জগৎ, তোমার আর কি স্তব করিব।।'[৬]

কবি দেবীকে 'শবাসনা শ্মশানবাসিনী' বলে উল্লেখ করেছেন আলোচ্য অংশে। কবির এই বক্তব্যের সমর্থনও তন্ত্রে পাওয়া যায়। সমালোচক অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী-র মতে-'মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী দেবী হইলেন কঙ্কালমালিনী শ্মশানবাসিনী শ্যামা। জাগ্রতা কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথ দ্বারাই যাতায়াত করেন। সুষুম্না হইল শ্মশান এবং সুষুম্নার মূলে অবস্থান করেন বলিয়া কুণ্ডলিনী হইলেন শ্মশানবাসিনী শ্যামা।'[৭] কবির কাব্যের বর্ণনায় কবির এই সূক্ষ্ম বিষয় ফুটে উঠেছে।

কাব্যের অন্যান্য অংশেও তন্ত্রোক্ত উপাদানের খোঁজ মেলে। 'বিদ্যার সহিত সুন্দরের দর্শন বিচার' অংশে উল্লেখিত-

অনাদি অদ্ভূত আছে ঈশ্বরের মায়া।।

পরমাত্মা তুল্য কিবা অতিরিক্ত হয়।

আমি কি কইব বেদে নাহিক নিশ্চয়।।

ঈশ্বর ইৎশায় সৃষ্টি করে সেই জন।

ব্রহ্ম ভোগাভোগ সিদ্ধি নাহিক কখন।।

পরমাত্ম বিনে দেখ জীব ভিন্ন নয়।[৮]

সারা জগতের নিয়ন্তা শক্তি এই ব্রহ্ম। তিনিই এই জগৎকে চালাচ্ছেন। আর এই ব্রহ্মশক্তির ধারক হল আদ্যাশক্তি, দেবী সনাতনী। তিনি ভিন্ন জগতের কোনো কিছুর প্রকাশ সম্ভব নয়। কাব্যে উল্লেখিত-

এক ভিন্ন দুই নাইএ তিন ভুবনে।।

যত দেখ জগতে সকলি তার মায়া।[৯]

তন্ত্রে এই জগতের ধারণ শক্তি দেবী কালিকাকেই বলা হয়েছে-

ধরিত্রী কীললাং শুচিরপি সমীরোহপি গগনং, ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।

-অর্থাৎ ' হে কালি! ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ-এই সমস্তই একা তুমি, তুমি কল্যাণময়ী গিরিশরমণী।'[১০]

কবি কাব্যের একটি অংশে দেবী কালিকাকে 'ত্রিপুরসুন্দরী' বলে উল্লেখ করেছেন। 'দেবী কালিকার মায়ায় সুন্দরের নদী পার' অংশে বর্ণিত-

অধীর নদীর নীর হইয়া কাণ্ডারী।

তাপীতে করহ ত্রাণ ত্রিপুরসুন্দরী।।[১১]

এই 'ত্রিপুরসুন্দরী' দেবী কালিকার আরেক রূপ।দ্র.১ সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীর বর্ণনা দিয়েছেন- 'কালিকা পুরাণে দেবী। রক্তবর্ণ, চার হাত, বিবসনা, হাতে আয়ুধ ও পুস্তক ইত্যাদি। কুণপের উপর দণ্ডায়মান। রক্ত-বসন-পরিহিতা ধ্যানও আছে। হাতে কোনো আয়ুধ নাই এবং গলায় আপাদ মুণ্ডমালা।'[১২] দেবী কালিকার চিন্তাই বিবরণ অনুযায়ী আমাদের মনে করায়। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস দেবীর বিষয়ে তন্ত্রোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি *প্রপঞ্চসার* গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন-'দেবী অম্বিকা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তি সৃষ্টি করেছেন বলে, এই ত্রিমূর্তির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন বলে, সৃষ্টির পূর্বে ত্রয়ীময়ী বলে এবং প্রলয়কালে ত্রিলোক পূর্ণ করে অবস্থান করেন বলে তাঁর নাম হয়েছে ত্রিপুরা।'[১৩]

'চৌতিশায় কালীর স্তব' অংশে দেবী কালিকার নানা নামের উল্লেখ করা হয়েছে।দ্র.২ নানা নামের মধ্যে দিয়ে দেবীর স্তব করা হয়েছে। সমালোচক স্মৃতিকণা চক্রবর্তী-র মতে-'নারীগণের পতিনিন্দার মতোই চৌতিশা রচনাও মঙ্গলকবিদের কাছে প্রায় অবশ্য কর্তব্য ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপদকালে দেবতার স্মরণ ও স্তুতি করা হত চৌতিশার স্তবের মাধ্যমে। বর্ণমালার ৩৪ টি অক্ষরকে ক্রমানুসারে পদের আদিতে বসিয়ে রচনা করা হত চৌতিশা।'[১৪] কাব্যের এই অংশেও লক্ষ করলে দেখা যাবে সুন্দর বিপদে পড়ার দরুন দেবীর স্তব করেছে এবং দেবী তার সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। দেবী 'অষ্টনায়িকা' সহযোগে সুন্দরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তন্ত্রে এই নায়িকা দেবীর সহচরী বা অংশ রূপে স্বীকৃত। দেবীভেদে এই নায়িকার নামের পার্থক্য হয়। কালী পূজার সময় এঁদেরও পূজা করতে হয়। দেবী কালিকার সহচরীদের নাম হল যথাক্রমে- 'ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হর্ত্রী, বিধায়িনী, করালা, শূলিনী।'[১৫] এঁরা প্রত্যেকে দেবীর রূপভেদ মাত্র বা বলা যেতে পারে দেবীর সহায়ক শক্তি।

দেবী কালিকা শুধু সুন্দরকে জীবনদান করার জন্য এগিয়ে এসেছে তা নয়, তাকে মায়া কাজল দান করেছে যাতে করে সে অদৃশ্য হবার শক্তি পেয়েছে ; এছাড়া দেবী নিজে তাকে মায়ানদী পার করতে সাহায্য করেছে। অন্যান্য কাব্যের মত সুড়ঙ্গ খননে দেবী সাহায্য প্রদান করেছে-

মায়া নিদ্রা দিয়া দেবী ঈষদ হাসিঞা।

করিল সুড়ঙ্গপথ ফুতকার দিঞা।।[১৬]

এছাড়া আরেকটি বিষয় নতুনত্বের ইঙ্গিত বহন করে। বিদ্যার গর্ভ যাতে নষ্ট নাহয় সেজন্য মন্ত্রবলে তা রক্ষা করা হয়েছে-

ললাটে অঙ্গুরী রাখি রাজার নন্দন।
উদর বন্ধন মন্ত্র করে উচ্চারণ।।
ভূত প্রেত আদি দেবঘাত অপঘাত।
যে জন বিদ্যার গর্ভের করে উৎপাত।।[১৭]

এই ঘটনা কিছুটা তন্ত্রের কিছু বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে ; তন্ত্রের গাত্র বন্ধনের সঙ্গে এই ঘটনার মিল পাওয়া যায়। দৈব বিষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করা হত। এখানেও সেটাই করা হয়েছে।

কাব্যের শেষের দিকে তন্ত্রোক্ত শবসাধনার উল্লেখ করা হয়েছে। এক ডাকিনীসিদ্ধ রাক্ষসী নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য সুন্দরের পুত্রকে হত্যা করে। পুত্রকে বাঁচাতে সুন্দর শবসাধনা শুরু করে-

বেদবিধিমত মৃত করিয়া স্থাপন।
শবের উপরে রায় করয়ে সাধন।।
তনয় জীবন পায় কামনা অন্তর।
সিদ্ধি বিদ্যা কালীমন্ত্র জপয়ে সুন্দর।।[১৮]

এখানে শবসাধনার বিস্তারিত বর্ণনা কবি দেননি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা কবি শুধু এখানে বিবৃত করেছেন। কবি অন্যান্য কবিদের মতোই এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র, নতুন বিষয়কে এখানে তুলে ধরেননি।

অন্যান্য কবিদের কাব্যের মতো কবি রাধাকান্ত-র কবিতায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বলা হলেও সমাজের গূঢ় বিষয়গুলি কাব্যে অনুপস্থিত। 'নারীগণের পতিনিন্দা'-র মতো বিষয় কাব্যে অনুপস্থিত। এছাড়াও সমাজের বৃহত্তর বিষয়গুলি কাব্যে দেখা যায়নি।

কবি তাঁর কাব্যকে 'নৌতন মঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু কোনো সেই রকম বিষয় কাব্যে দেখা যায়নি; বরঞ্চ কবি 'গতানুগতিকতার স্রোতে'[১৯] নিজেকে নিমজ্জমান রেখেছেন। সুন্দরকে দেবীর মায়া কাজল দান, মায়ানদী পার ইত্যাদি বিষয় কাব্যে নতুন কিন্তু বেশিরভাগ অংশই কবি রাধাকান্ত পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ করেই কাব্যে রূপদান করেছেন। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে-'...অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যাঁহারা সেই

বাঁধাপথের পথিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিভার পাথেয় ছিল না। তাই তাঁহাদের স্থান পাঠকের সজীব মন নহে, বিবর্ণ পুঁথির তালিকা তাঁহাদের শেষ আশ্রয়।'[২০]

দ্রষ্টব্য

১. *মুণ্ডমালাতন্ত্র*-এ দেবী কালিকাকে 'ত্রিপুরা' বলে উল্লেখিত হয়েছে-

যথা কালী তথা তারা তথা ত্রিপুরসুন্দরী।

-অর্থাৎ 'কালী যেরূপ, তারাও সেইরূপ, ত্রিপুর-সুন্দরীও সেইরূপ; ইহাঁদের মধ্যে কোনই তারতম্য নাই।' (পৃ. ৩৫) ; এছাড়া অন্যান্য তন্ত্রে দেবী কালিকাকে 'ত্রিপুরা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *যোনিতন্ত্রম্*-এ উল্লেখিত-

সা এব ত্রিপুরা কালী ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ছিন্না তারা মহালক্ষ্মী মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।।

সুন্দরী ভৈরবী বিদ্যা প্রকারান্যাপি বিদ্যতে।

-অর্থাৎ ' যিনি কালী, তিনিই ত্রিপুরা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, তারা, মহালক্ষ্মী [মহামায়া], মাতঙ্গী, কমলা, সুন্দরী, ভৈরবী প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যারূপে প্রকাশিতা।' (পৃ.৪১) এবং *কালিকাপুরাণ* অনুসারে দেবী –কালিকাকে 'ত্রৈপুরী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে-

আদ্যা মধ্যা ভাবিনী নীতিযুক্তা, সম্যগজ্ঞানজ্ঞেয়রূপাপরা যা।

আদাবন্তে মধ্যভাগে চ তারা, পায়াদ্দেবী ত্রৈপুরী ভৈরবী যা।। (পৃ. ৭৬৭)

২. *মুণ্ডমালাতন্ত্র*-এর অষ্টম পটলে দেবী কালিকার অনেক নামের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তালিকা দীর্ঘ। সেই জন্য এখানে উল্লেখিত হল না। (পৃ. ১৪১-১৪৪)

তথ্যসূত্র

১. দ্বিজ রাধাকান্ত বিরচিত *কালিকামঙ্গল* ; চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , *বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪।

২. তদেব, পৃ. ৫৪।

৩. তদেব, পৃ. ৫৪।

৪. তদেব, পৃ. ৩।

৫. তদেব, পৃ. ১০।

৬. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ৫৩৪।

৭. অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী, *কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৯, পৃ. ৮।

৮. দ্বিজ রাধাকান্ত বিরচিত *কালিকামঙ্গল*, ঐ, পৃ. ১৭।

৯. তদেব, পৃ. ১৭।

১০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ২য় খণ্ড, ঐ, পৃ. ৫৩৪।

১১. দ্বিজ রাধাকান্ত বিরচিত *কালিকামঙ্গল*, ঐ, পৃ. ৫।

১২. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা*, ১ম খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ. ৬৫৪।

১৩. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*, প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৫০৩।

১৪. স্মৃতিকণা চক্রবর্তী, *মঙ্গলকাব্য: পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* , বিদ্যা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৬৫।

১৫. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা*, ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮, পৃ. ৪৯০।

১৬. দ্বিজ রাধাকান্ত বিরচিত *কালিকামঙ্গল*, ঐ, পৃ. ১৬।

১৭. তদেব, পৃ. ৩২।

১৮. তদেব, পৃ. ৫০।

১৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯-২০২০, পৃ. ২১৬।

২০. তদেব, পৃ. ২২১।

প্রাণরাম চক্রবর্তী

সতেরো শতকের *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারায় প্রাণরাম কবিবল্লভ-এর কাব্য এক নতুন মাত্রা যোগ করে। কবি শুধুমাত্র বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর উপর জোর প্রদান করেননি, তার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজের ধর্ম, রীতিনীতি সবকিছুই দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ব্যক্ত করেছেন। সেক্ষেত্রে কাব্যের বক্তব্য শুধু দুই চরিত্র নির্ভর আখ্যানে পর্যবসিত হয়নি, দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাও এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। কাহিনীতে পুরাণের সাথে সাথে লোকাচার, তন্ত্রের অনুষঙ্গ পাশাপাশি লক্ষণীয়। কবি প্রাণরাম কবিবল্লভ-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না, তাঁর কাব্যের কালজ্ঞাপক শ্লোক লক্ষ করলে দেখা যায় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কাব্য রচনা সমাপ্ত করেছিলেন-

শকে বসু বসু বাণ চন্দ্র সমন্বিত।

কালিকামঙ্গল তথি হইল বিদিত।।[১]

কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ সাল, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কেই সম্ভবত ধরা যেতে পারে কবির কাব্যের রচনাকাল হিসেবে। কাব্যের শুরুতে কবি দেব-দেবীর বন্দনা অংশ রেখেছেন; গণেশ, চৈতন্য, সরস্বতী, শিব, কালীর বন্দনার পাশাপাশি কবি রাম বন্দনাও যুক্ত করেছেন। কাব্যে এই প্রয়াস এক অভিনবত্বের দিক সূচিত করে। কবি সেজন্য কাব্যে উল্লেখ করেছেন-

সঙ্গীত নৌতন করে নিবেদন

প্রাণরাম চক্রবর্তী।।[২]

বেশিরভাগ *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারার কবিরা বিদ্যা-সুন্দরের আখ্যানে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এর ফলে দেবী কালিকা হয়ে যান গৌণ কিন্তু কবি প্রাণরাম কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে দেবী কালিকার বিবরণ দিতে কার্পণ্য করেননি। দেবী কালিকার নানা রূপের কথা আমরা জানতে পারি। সম্পাদক অক্ষয়কুমার কয়াল উল্লেখ করেছেন-‘তন্ত্রে আট প্রকার কালীমূর্তির উল্লেখ দেখা যায়-উগ্রকালী, গুহ্যকালী, চামুণ্ডাকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী এবং সিদ্ধকালী। স্থানভেদে এই সব রূপের পূজা হয়।’[৩] কবি দেবীর এই নানা রূপকেই কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। কাহিনীর আকারে সমগ্র কাব্যের বিষয় তিনি ব্যক্ত করেছেন। কাব্যের শুরুতে ‘রাণীকে কালীর স্বপ্নদান’ অংশে দেবী কালিকার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য-

নরমুণ্ডাবলিকণ্ঠা শ্মশানবাসিনী।

স্বপ্ন দিতে অচিরাত গেলা নারায়ণী।।

দিব্য তল্পে রাজকান্তা পতিসব্যপাশে।

সুখে নিদ্রা যায় মনসিজ অভিলাষে।।

জটিল ধূর্জটিকান্তা ভীমাক্ষি দন্তুরা।

দ্বীপিচর্ম্মাম্বরা ঘোরা খড়গ মুণ্ডধরা।।

মুক্তকেশা বিলোল রসনা ভীমমুখা।[৪]

কাব্যে এই বর্ণনার সাথে *তন্ত্রসার*-এ দেবী শ্মশানকালী-র ধ্যানের সাথে মিল পাওয়া যায়-

অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।

রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম্।।

পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্।

সদ্যঃকৃত্তশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্।

স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচর্ব্বণতৎপরাম্।

নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ।।

-অর্থাৎ ‘শ্মশানকালী দেবী গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, ইনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন। ইঁহার নেত্র রক্ত পিঙ্গলবর্ণ, কেশসকল আলুলায়িত, দেহ শুষ্ক ও ভয়ঙ্কর, বামহস্তে মাংসযুক্ত মদ্যপূর্ণ পানপাত্র, দক্ষিণহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। দেবী সর্ব্বদা হাস্যবদনা ও আমমাংস চর্ব্বণ করিতেছেন। দেবী বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, নগ্না ও আসবপানে প্রমত্তা।’[৫]

কাব্যের পরবর্তী অংশে ‘সুন্দরের প্রতি কালীর কৃপা’-তে দেবী কালিকার যে রূপ ফুটে ওঠে তাতেও দেবী কালিকার শ্মশানবাসিনী প্রতিচ্ছবিকেই তুলে ধরে-

আবির্ভূতা হৈলা কালী সুন্দরের তপে।।

বিলোল রসনা ঘোরা আকুল কুন্তলা।

খলখল হাসে গলে নরমুণ্ডমালা।।[৬]

এই অংশে দেবী কালিকা-কে সুন্দর যেভাবে অর্চনা করেছে তাতে তন্ত্রসাধনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়-

রাত্রিযোগে সুন্দর আনিয়া নানা বলি।

বিবিধ বিধানে পূজে দেবী মহাকালী।।

একেলা বসিয়া শবে মহামন্ত্র জপে।[৭]

পরবর্তীকালে 'সুন্দরের কালীপূজা' অংশে যেভাবে দেবী কালিকাকে আবাহন করা হয়েছে তাতে তন্ত্রের ভাবধারা স্পষ্টই প্রকাশ পায়-

কৈল ভূতশুদ্ধি তদনু সুসিদ্ধি

ন্যাস যত সাবধানে।

প্রাণায়াম আদি কৈল যথাবিধি

ধ্যান করে হৃষ্টমনে।।

করাল বদনা শুভদ দক্ষিণা

কালিকা পরমেশ্বরী।[৮]

'ভূতশুদ্ধি', 'ন্যাস', 'প্রাণায়াম' এসবই তন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান; উক্ত অনুষ্ঠানগুলি যথাবিধি পালন করে দেহকে শুদ্ধ করে দেবীর ধ্যান করা স্বতঃসিদ্ধ। সুন্দর দেবীর ধ্যানের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়াকেই অনুসরণ করেছে। কাব্যের শুরুতে দেবী কালিকার শ্মশানবাসিনী রূপকে তুলে ধরা হলেও কাব্যের পরবর্তী ধারায় অন্য রূপকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে-

কপালিনী কালরাত্রি নম দেবী জগদ্ধাত্রী

জয় জয় ভূতাপহারিণী।

জয় শিবে ভীমরূপে নম বিশ্বমূর্তি শুভে

বিরূপাক্ষজয় ত্রিলোচনী।।

জয় সর্বগতি কালী করালী নৃমুণ্ডমালি

পাশহস্তে পাপবিনাশিনী।[৯]

এখানে দেবী 'জগদ্ধাত্রী', 'কপালিনী কালরাত্রি'-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দেবীর এখানে রূপ সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে। তন্ত্রেও এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়-

মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি।।

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।।

কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।

কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে।।

-অর্থাৎ 'জগৎ সংহারকারক মহাকাল তোমার একটি রূপমাত্র, সেই মহাকাল মহাপ্রলয়ে সমুদয় পদার্থকে গ্রাস করিবেন। সর্ব্বভূতকে গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল, তুমি মহাকালকে গ্রাস কর বলিয়া কালিকা নামে পরিচিতা। তুমি কালকে গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম কালী, সকলের আদিকালত্ব ও আদিভূতত্ব নিবন্ধন লোকে তোমাকে আদ্যাকালী বলিয়া থাকে।'[১০] সুন্দর এই দেবীরই পূজা করেছে-

জগত জননী আদ্যা সনাতনী

চতুবর্গ প্রদাইনি।।[১১]

সুন্দর কালীস্তবের বিষয়ে 'বারাহী তন্ত্রের'$_{দ্র.১}$ মতকে স্বীকৃতি দিয়ে দেবীর স্তব করেছে। কাব্যের পরবর্তী অংশে দেবী কালিকার আরেকটি রূপ লক্ষণীয়-

চামুণ্ডে প্রচণ্ড কায় দেবী মহামাএ।

বিচিত্রাঙ্গী শুভপ্রিয়ে নৃতগীত-প্রিয়ে।।

বিরূপাক্ষী ত্রিলোচনী জয় ভীমারূপা।

ভীমাক্ষ করালমুখী শবারূঢ়া শিবা।।[১২]

সমালোচক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য *সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র* থেকে উল্লেখিত ধ্যানমন্ত্র থেকে দেবীর এই রূপটিকে ব্যক্ত করেছেন-'কালী শবারূঢ়া, হাতে নর-কপাল ও কর্তৃকা, অপর দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা, দেবী মুহুর্মুহু রক্তপানে নিরতা।'[১৩] আবার 'মশানে নৃপতির কালিকাদর্শন' অংশে দেবী কালিকার আরেকটি রূপ চোখে পড়ে-

চৌষট্টি যুগিনী সঙ্গে ত্রিজগত মাতা।

চণ্ড দানা সঙ্গে মশানে উপনীতা।।

জটিল উন্মত্ত বেশে ভীমাক্ষি দন্তুরা।

নরমুণ্ডাবলি কণ্ঠা দ্বীপিচর্ম ঘোরা।।

ভৈরব বেতাল ভূত সংহতি তাহার।[১৪]

স্কন্দপুরাণ-এ দেবী চামুণ্ডা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

আরাধয়ামাস তদা চামুণ্ডাং মুণ্ডমণ্ডিতাম্।

শ্মশানবাসিনীং দেবীং বহুভূতসমন্বিতাম্।।

যোগিনীং যোগসংসিদ্ধাং বসামাংসাসবপ্রিয়াম্।।[১৫]

অর্থাৎ দেবীর শ্মশানবাসিনী রূপ এবং যোগিনী দলের সাথে উপস্থিতি দেবীর রুদ্র রূপকেই ইঙ্গিত করে। কবি এই রুদ্র রূপকেই কাব্যে উপস্থাপন করেছেন কাহিনীর নিরিখে।

আবার 'রাজাকে বিদ্যার গর্ভসংবাদ' অংশে কবি দেবী কালিকার আরেকটি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি হল ভদ্রকালী। তন্ত্রে দেবীর এই রূপও দেখা যায়। শ্মশানকালী, দক্ষিণাকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী-র ক্ষেত্রে তন্ত্রে একই ধরনের যন্ত্রেই পূজা করা হয়। এখানে কবি বিশেষ প্রেক্ষাপটে দেবী কালিকার বিশেষ এই রূপের কথা স্মরণ করেছেন। বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শুনে রাজা কোতোয়াল কালারায়-কে নিয়োগ করে। যে এই দুষ্কর্মের ক্রিয়াকর্তা তাকে ধরাই এই কোতোয়ালের কাজ। পারতপক্ষে এই কাজ যে করেছে সে এই রাজবাড়ির শত্রু রূপেই গণ্য হবে। তন্ত্রে দেবী ভদ্রকালীকে আশু শত্রু দমনের জন্যই অর্চনা করা হয়। তন্ত্রে উল্লেখিত-

প্রয়োগমাত্রং কর্ত্তব্যং বৈরিনিগ্রহকারকম্।

ইয়ং দেবী মহাদেবী শত্রুনিগ্রহকারিণী।

যথেষ্টচিন্তয়া চিন্ত্যা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদা।

-অর্থাৎ 'এই দেবীর উপাসনা দ্বারা আশু শত্রুদমন হয়। যে ব্যক্তি যেরূপ কামনা করিয়া এই শত্রুদমনকারিণী ভদ্রকালী দেবীকে উপাসনা করে, তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হয়।[১৬] সেইজন্যই কবি এই অনুষঙ্গ ব্যবহারের জন্য দেবী ভদ্রকালীর কথা স্মরণ করেছেন।

মূলত কবি দেবী কালিকার শ্মশানচারী রূপকেই মুখ্য করে তুলেছেন। দেবীর ভয়াল, ভয়ঙ্কর রূপ কাহিনীর প্রেক্ষাপটে কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী তুলে ধরেছেন। দেবী কালিকা একাধারে প্রলয়ের দেবী তেমনি অপরদিকে সৃষ্টি-স্থিতির সংগঠনকারীও বটে। সমালোচক অণিমা মুখোপাধ্যায়-এর মতে-'চণ্ডীর মতো কালীরও প্রকৃতির জটিলতা রয়েছে। কালক্রমে অনার্য সমাজের অনেক ভয়ংকরী দেবীও কালী নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একীভূতা হয়ে গেছেন। রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, মহাকালী ইত্যাদি অনেক দেবীরই উদ্ভব যেমন স্বতন্ত্র ধর্ম প্রবৃত্তি থেকে, তেমনি তাঁদের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র।'[১৭] কবির কাব্যের ক্ষেত্রেও সেই বিষয় উঠে এসেছে। কাব্যে দেবী কালিকার ভয়াল রূপই বেশি প্রত্যক্ষ আমরা করি।

শক্তিরূপের নানা অনুষঙ্গ দেবী কালিকার মধ্যে আমরা লক্ষ করি। দেবী নানা রূপের মাধ্যমে জগতকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, একার্থে তিনি জগত সংসারের চালিকা শক্তি এবং সমস্ত দেবতাদের ধী শক্তি; দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং অন্যতমা। সমস্ত দেবীর মূল ক্রিয়া যেন দেবী কালিকার মধ্যেই সমাহিত। তাঁর থেকেই সবার উৎপত্তি এবং তাতেই সব কিছু বিলীন। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস *শক্তিরহস্য* সম্পর্কে বলেছেন-'...দেবি! তুমি অচিন্ত্যা, অমিতাকারা অর্থাৎ তোমার পরিমাপ করা যায় না, তুমি শক্তিস্বরূপিণী, প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তুর তুমি অধিষ্ঠানসত্তা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তু তোমাতেই অধিষ্ঠিত। তুমি গুণাতীতা, দ্বন্দ্বাতীতা, অদ্বিতীয়া, পরব্রহ্মস্বরূপিণী।'[১৮] 'বীরসিংহের কালিকার্চন' অংশে দেবীর এই রূপকেই আবাহন করা হয়েছে-

শক্তিরূপা সনাতনী অনন্তরূপিণী।।

অপার মহিমা সৃষ্টি স্থিতি সংহারিণী।

ত্রিগুণধারিণী আদ্যা ত্রিদেব জননী।।

মহামায়া মহাবিদ্যা দেবী মহাকালী।[১৯]

কাব্যের আরো কিছু কিছু বিষয়ে তন্ত্রের ছায়া লক্ষণীয়। 'রাক্ষসীকর্তৃক বিদ্যাসুন্দরের পুত্রহত্যা' অংশে যেভাবে দেবী কালিকার পূজা দিয়েছে তাতে স্পষ্টতই তন্ত্রের অনুষঙ্গ ফুটে ওঠে-

বিল্বদল জবাপুষ্প নব শিশু-রজে।

সাধিতে ডাকিনীমন্ত্র মহাকালী পূজে।।

পূজা করি কালিকা রাক্ষসী অতি বেগে।[২০]

ডাকিনী বিদ্যা বা মন্ত্র যোগে কালীপূজার কথা এখানে বলা হয়েছে তাতে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' বা কালাযাদুর প্রভাব থাকা কোনো কঠিন কল্পনা নয় এবং পরবর্তী সময়ে নিজের পুত্র সদানন্দকে বাঁচাতে সুন্দর শবসাধনার আশ্রয় নিয়েছে।

এই শবসাধনা সুন্দর আগেও করেছে। শবসাধনা তন্ত্রসাধনার একটি অঙ্গ, তন্ত্রের গ্রন্থগুলিতে এর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। হিন্দু কোষগ্রন্থ এবং তন্ত্রাদি গ্রন্থে ডাকিনী প্রসঙ্গ আছে। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* অনুসারে ডাকিনীকে দেবী কালিকার অংশ রূপে বা গণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী-র মতে-'হিন্দু তন্ত্রে ডাকিনীর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু তিনি প্রধান দেবতার স্থান লাভ করেন নি। মূল শক্তির অংশ বা কলারূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। মূল শক্তি নাদব্রহ্মরূপে সৃষ্টিতে বিরাজ করেন। এই নাদের স্থূল রূপ অ-ক্ষাদি মাতৃকা বর্ণ। ডাকিনী এই মাতৃকা শক্তির একটি প্রকাশ।'[২১] এদের কাজ ও প্রকৃতি দুটোই ভয়ংকর। সাধারণত শিশুর অনিষ্টসাধন, স্তম্ভন, উচাটন, কামসাধন ইত্যাদি কাজে এদের জুড়ি মেলা ভার।দ্র.২ কবি বিস্তৃতভাবে এই শবসাধনার বিবরণ প্রদান করেননি; শুধুমাত্র প্রয়োজন সাপেক্ষে এর উল্লেখ করেছেন মাত্র। সুন্দরের চৌতিশা স্তব অংশে দেবী কালিকার নানা রূপের কথা বলা হয়েছে। এখানেও তন্ত্রোক্ত *স্তবকবচমালা*-র ছায়া লক্ষণীয়।

কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী সংস্কৃত কাহিনীর আকারে তাঁর কাব্যের আখ্যান বর্ণনা করেছেন এবং তার পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজের চিত্রও তুলে ধরেছেন। পুরুষ প্রধান সমাজে সব নিয়মই নারীদের জন্য, তাই তাদের কাছে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সবকিছুই মুখ বুজে মেনে নিতে হত; নারীগণের পতিনিন্দা অংশে কবি সমাজের সব থেকে বড় জীবনদর্শন তুলে ধরেছেন। উঠে এসেছে সব থেকে বড় সমস্যা সতীন প্রসঙ্গ-

সাত সতিনীর মাঝে আছি একাকিনী।

বাঘের নিকট যেন থাকয়ে হরিণী।।

আড়ালে-গোড়ালে স্বামী যদি চান আড়ে।

বাঘের সমান তার পড়ে আসি ঘাড়ে।।[২২]

সতীন থাকতে সংসারে সুখ নেই, যার ঘরে সতীনের বাস তার জীবন বিধবা বা 'রাঁড়ি' তুল্য। আবার অনেকক্ষেত্রে নারীর পতিরা থাকত দৈহিক প্রতিবন্ধী, অঙ্গের বিশেষ খুঁত নিয়েই তাদের জীবনভর স্বামীর সেবা করে যেতে হত; বৃদ্ধ স্বামীর সাথে বহু তরুণীকেই বিবাহ দিয়ে দেওয়া হত। একবারও ভাবা হত না তাদের করুণ অবস্থা এবং সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোনো অবকাশ ছিল না। কাব্যে উল্লেখিত-

কি কব আমার দুঃখ পতি মোর কালা।।

দিবসে কিঞ্চিৎ ভাল ঠারে-ঠোরে কই।

আঁধারে বিষম দায় চুপে-চাপে রই।।

কেহ বলে বৃদ্ধ পতি দেখে মরি পুড়ে।

কেবল হাব্যাস মাত্র থাকে অঙ্গ জুড়ে।।[২৩]

আবার অনেক সময় মেয়েদের বিবাহ হলেও তাদের স্থান পতিগৃহে হত না, সারাটা জীবন তাদের বাপের বাড়িতেই কাটাতে হত। সমাজের গঞ্জনার পাশাপাশি সারাজীবন ধরে এই বঞ্চনার কষ্ট এবং একাকিত্বের যন্ত্রণা তাদের বয়ে যেতে হত নীরবে। কেউ তাদের পাশে থাকার প্রয়োজনবোধ পর্যন্ত করত না, কাব্যে উল্লেখিত-

বিবাহ সময়ে মাত্র হয়েছিল দেখা।

বাপঘরে চিরদিন করিলাম বাস।

স্বামীর বিষয়ে বিধি করেছে নৈরাশ।।[২৪]

এত কষ্ট, যন্ত্রণার পাশাপাশি মেয়েদের প্রতি ছিল সামাজিক বিধান, তা উল্লঙ্ঘন করা মানে সমাজ থেকেই চ্যুত হওয়া। স্বামী যেমনই হোক তাকে মাথায় করে রাখাই মেয়েদের ধর্ম।

নারীর পরম ধর্ম পতির সেবন কর্ম

বনিতার পতি সে দেবতা।।[২৫]

'পতিগৃহ যাত্রাকালে কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ' অংশে সমাজ নির্ধারিত নিয়মগুলিই যেন একজন চিন্তাকুল মায়ের জবানিতে বর্ণিত হয়েছে-

গুরুজন প্রতি ত্রপা সদা শাশুড়ীর সেবা

করিয় অবশ্য দিয়া মন।

গৃহকর্মে দিয় মতি কদাচিত পতি প্রতি

না বলিয় অপ্রিয় বচন।।

বাড়িব তোমার যশ পতিরে করিবে বশ

প্রিয় বাক্য পরম ঔষধ।[২৬]

এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার কোনো রাস্তাই নেই। আমরা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নারীমুক্তির কথা বলি কিন্তু কাজে ফলপ্রসূ করতে কতখানি পারি তা নিয়ে তর্কের জায়গা থাকে; কিন্তু কবি সেই সময়ে উপস্থিত থেকে রক্ষণশীল সমাজের উপর সোচ্চারে বলতে সক্ষম হয়েছেন-

ধিক ধিক নারীজাতি সদা পরাধীন।

ভাড়া ভান্যে যোগাই আনিয়া চিরদিন।।[২৭]

এইজন্যই কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এতটা আধুনিক। মঙ্গলকাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা' সমাজের বাস্তব রূপকেই আমাদের সামনে তুলে এনে দেখায়। মূলত কবি প্রাণরাম চক্রবর্তীর কাব্যের এই অংশের দ্বারা সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। সেইজন্য তিনিও তুলে ধরতে সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি নারীদের দুঃখ, কষ্ট এবং খেদের মাধ্যমে এবং নগ্ন করতে চেয়েছেন নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথাকে।

প্রাণরাম চক্রবর্তী দেবী কালিকাকে কেন্দ্র করে যে কাব্য লিখেছেন তা সময়ের দিক থেকে এক নতুন ভূমিকা নিয়েছে কারণ রাঢ় বাংলায় এই বিষয়বস্তুকে নিয়ে কাব্য লেখার চল আগে ছিল না, সমালোচক অণিমা মুখোপাধ্যায়-এর মতে- 'ষোলো শতক থেকে পূর্ববঙ্গে এই দেবীকে কেন্দ্র করে 'কালিকামঙ্গল' শ্রেণীর কাব্যধারার সূত্রপাত হলেও, রাঢ়ে এই শ্রেণীর কাব্য রচনার সূচনা হয় সতেরো শতকে।'[২৮] কবির কাব্য সম্ভবত সেই ধারারই সূচনা করে।

রাঢ় বাংলায় লৌকিক দেব-দেবীর চর্চা সুদূরকাল থেকেই চলে আসছে৷ বৈদিক ধর্ম বা ক্রিয়াকলাপ সেক্ষেত্রে অনেকটাই ব্রাত্য। এই লৌকিক দেবতারা একাধারে বীভৎস রূপের অধিকারী অপরদিকে ভক্তদের বিপদে তাঁরা পরম ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রাণরাম চক্রবর্তী-র কাব্যে তার অন্যথা হয়নি। দেবী কালিকা আবির্ভূতা হয়েছেন ভয়াল মূর্তিতে আবার যখন ভক্ত বিপদে পড়েছে তখনই পরম কল্যাণের প্রতিমূর্তি স্বরূপ তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; এমনকি সুড়ঙ্গ খনন কার্যের মত গর্হিত কাজেও দেবী সহায়তা করেছেন। দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্তির পাশাপাশি বরাভয়দাত্রীর রূপ রাঢ় বাংলায় সমান জনপ্রিয়; তাই সেই রূপকেই কবি কাব্যে মুখ্য করে তুলেছেন। বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর পাশাপাশি দেবীর এই রূপকে সাধারণ জনমানসে পরিচিত করা কবির কাব্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

দ্রষ্টব্য

১. কাব্যে কবি 'বারাহী তন্ত্রের' উল্লেখ কথা প্রসঙ্গে বলেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিকতার বিষয়কে তিনটি কেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে বিষ্ণুক্রান্তা ভাগের মধ্যে *বারাহী তন্ত্র* প্রচলিত। বিষ্ণুক্রান্তা হল বিন্ধ্য থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তার মধ্যে রাঢ় বাংলার স্থান অগ্রগণ্য।

২. সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ডাকিনী বিষয়ে *তন্ত্রে ডাকিনী ও ডাকিনী-বিদ্যা* প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সেখানে পুরাণ এবং তন্ত্র গ্রন্থের সূত্র ধরে তিনি দেখিয়েছেন ডাকিনীর কার্যকারিতা এবং উৎপত্তি কোথায়।

তথ্যসূত্র

১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা. ,*প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৯।

২. তদেব, পৃ. ৫।

৩. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ১৪।

৪. তদেব, পৃ. ৯।

৫. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ১ম খণ্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭৪।

৬. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা. , ঐ, পৃ. ২২।

৭. তদেব, পৃ. ২২।

৮. তদেব, পৃ. ৪৭।

৯. তদেব, পৃ. ৪৯।

১০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূ., *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৭, চতুর্থ উল্লাস, পৃ. ৪৩।

১১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪৮।

১২. তদেব, পৃ. ৪৯।

১৩. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব*,ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৬৭।

১৪. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা. , ঐ, পৃ. ১০৯।

১৫. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব*, ঐ, ২০১৫, পৃ. ২৭৮।

১৬. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৬৭।

১৭. অণিমা মুখোপাধ্যায়, *সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৬, পৃ. ৫৬।

১৮. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৩৫।

১৯. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৩৩।

২০. তদেব, পৃ. ১২৭।

২১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *তন্ত্রে ডাকিনী ও ডাকিনী-বিদ্যা*; সনৎকুমার মিত্র সম্পা., *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* কার্ত্তিক-পৌষ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৩৯৫, পৃ. ১১-১৭।

২২. তদেব, পৃ. ৯৬।

২৩. তদেব, পৃ. ৯৬-৯৭।

২৪. তদেব, পৃ. ৯৬।

২৫. তদেব, পৃ. ১১৯।

২৬. তদেব, পৃ. ১১৯।

২৭. তদেব, পৃ. ৯৬।

২৮. অণিমা মুখোপাধ্যায়, *সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য,* ঐ, পৃ. ৫৬।

বলরাম চক্রবর্তী

কবি বলরাম চক্রবর্তী *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারার এক অন্যতম কবি। কবির সময়কাল নিয়ে সমালোচক মহলে যথেষ্ট দ্বিমত রয়েছে, নির্দিষ্ট করে সেভাবে কিছু বলা যায় না। সমালোচক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কবির সময়কাল উল্লেখ করেছেন কবির রচনাশৈলী দেখে; তিনি মতামত দিয়েছেন কবি রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র-এর পূর্ববর্তী ছিলেন। সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলেও সম্ভবত কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

সাধারণত *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যায় সেখানে কাব্যের সিংহভাগ জুড়ে থাকে বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয় কাহিনী। কাহিনীর মূল কেন্দ্রবিন্দু বিদ্যা-সুন্দর থাকলেও দেবী কালিকার মাহাত্ম্য গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু কবি বলরাম চক্রবর্তী-র কাব্যের ক্ষেত্রে সেকথা খাটে না। এখানে কাব্যে আখ্যান ভাগের পাশাপাশি দেবী কালিকার গুণকীর্তন কবির কাছে মুখ্য বিষয়। কবি কাব্যে পুরাণ ও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতার সাথে বর্ণনা করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে কবি তন্ত্রশাস্ত্রের বহু বিষয় কাব্যে ব্যাখ্যা করেছেন; এর থেকে বোঝা যায় তিনি তন্ত্রের এই রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠানের সাথে যথেষ্ট অবহিত। সমালোচক ও সম্পাদক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-র মতে- '...তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার গ্রন্থে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দেখিয়া মনে হয়, তিনিও রামপ্রসাদের মত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।'[১]

কাব্যের শুরুর দিকে কবি নানা দেব-দেবীর বর্ণনার পাশে 'দিগবন্দনা' অংশে দেবীর নানারূপের কথা কবি উল্লেখ করেছেন।' 'সুন্দর কর্ত্তৃক কালিকার পূজা' অংশে দেবী পূজার ক্ষেত্রে তান্ত্রিক রীতির বর্ণনা করেছেন-

শীঘ্র খড়ি পাতি বলহ যুবতি
কে মোরে করয়ে স্মরণ।
কিসের কারণ চঞ্চল হয় মন
ঠেকয়ে দশনে দশন।।
সর্ব্বতোভদ্র পাতি বিমলা যুবতী
জানিঞা তারে কিছু বলে।[২]

'সর্ব্বতোভদ্র' এটি একটি তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান। এই বিষয়ে *তন্ত্রসার*[৩] গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। *শারদাতিলক*[৪] গ্রন্থের তৃতীয় পটলে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, কিভাবে এই আচার পদ্ধতি পালিত হবে।

কবির কাব্যে দেবী কালিকা মূলত দুই ভাবে বিষয়িত হয়েছে। কবি দেবী কালিকা-কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'ভদ্রকালী', 'কঙ্কালমালিনী' বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও কবি দেবীকে নানা নামে ভূষিত করেছেন-

কুমারের শুনি বাণী কৃপাময়ী নারায়ণী

ভদ্রকালী কঙ্কালমালিনী।[৫]

সাধারণত যখন কবিরা কোনো দেবীর গুণকীর্তন করেন তখন দেবীকে সারা জগত সংসারের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। কবির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়, 'সুন্দরের কালীস্তব' অংশে দেবীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেবী কালিকার সর্বরূপের একটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু দেবী কালিকার যে রুদ্র রূপ সেই রূপের সঙ্গে সাধারণত আমরা পরিচিত-

করালবদনা ঘোরা গলে নরশির হারা

বিকটদশনা মুক্তকেশী।

ঘোর ঘোর নাদিনী শিবকূর্ম প্রবাহিণী

আজ্ঞা মাত্র ধাইল খেচরা।।

গলে শোভে মুণ্ডমালা বিকট দশনজ্বালা

কর্ণের ভূষণ যোগ্য সব।[৬]

দেবীর এই রূপের সঙ্গে *তন্ত্রসার*-এ 'শ্যামাপ্রকরণ'-এ উল্লেখিত ধ্যানে মিল পাওয়া যায়-

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বর প্রদাম্।

হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।

মুক্তকেশীং ললজ্জিহবাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।

চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

-অর্থাৎ 'দেবি শবারূঢ়া, মহাভীমাকৃতি, ভীমদশনা, বরদানরতা, হাস্যমুখী ও ত্রিলোচনা। উঁহার হস্তে কপাল ও কর্ত্তৃকা শোভমান; উঁহার কেশদাম আলুলায়িত ও জিহবা লোল। ইনি পুনঃ পুনঃ

রুধির পান করিতেছেন। উঁহার চারি হস্তে নরমুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান।'[৭] দেবীর এই রূপকেই আমরা কাব্যে দেখতে পাই।

এছাড়াও দেবীর এই রূপের সঙ্গে ভদ্রকালীর তন্ত্রোক্ত এই ধ্যানের সাথে খুব মিল পাওয়া যায়-

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী

নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।

হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং পাসগযুগ্মং

দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী।

প্রয়োগমাত্রং কর্ত্তব্যং বৈরিনিগ্রহকারকম্।

ইয়ং দেবী মহাদেবী শত্রুনিগ্রহকারিণী।

যথেষ্টচিন্তয়া চিন্ত্যা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদা।

-অর্থাৎ 'ভদ্রকালী দেবী ক্ষুধাতে ক্ষীণাঙ্গী, তাঁহার নয়নযুগল কোটরমধ্যগত, বদন মসীর ন্যায় মলিন, কেশগুচ্ছ আলুলায়িত। ইনি সর্ব্বদা রোদন করিতে করিতে বলিয়া থাকেন, কোনরূপে আমার তৃপ্তি হইতেছে না, ইচ্ছা হয়, সমস্ত জগৎ একগ্রাসে ভক্ষণ করি। দেবী উভয়হস্তে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত পাশযুগল ধারণ করিয়া আছেন। দেবীর দন্তগুলি জম্বুফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ইনি সাধকের ভয় হরণ করেন। এইপ্রকার রূপ বিশিষ্টা ভদ্রকালী দেবী আমাকে রক্ষা করুন।

এই দেবীর উপাসনা দ্বারা আশু শত্রুদমন হয়। যে ব্যক্তি যেরূপ কামনা করিয়া এই শত্রুদমনকারিণী ভদ্রকালী দেবীকে উপাসনা করে, তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হয়।।'[৮] কবিও এই প্রেক্ষাপটে দেবীকে উপস্থাপন করেছেন। দেবী সুন্দরকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য এই রূপ গ্রহণ করেছেন এবং দেবী ভদ্রকালীকে আশু শত্রু দমনের জন্য তন্ত্রে যে বিধান দেওয়া হয়েছে কবি তাঁর কাব্যে সেই সূত্রে দেবীকে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

দেবীর এই রূপের সঙ্গে সঙ্গে কবি কৌশলে তন্ত্রের অনুষঙ্গ এনেছেন-

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা ধায় সমরবিহলা।

চরণ চলয়ে গাছ গলে মুণ্ডমালা।।[৯]

দেবীর এই রূপের সঙ্গে ইড়া-পিঙ্গলার নাড়ি দ্বয়ের প্রসঙ্গ স্পষ্টতই তন্ত্রের উপাদানকেই নির্দেশিত করে। আরো অনেক জায়গায় তন্ত্রের অনুষঙ্গ দেখা যায়। সুন্দরের পুত্র সদানন্দকে পুনরায় উজ্জীবিত করার জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে তাতে স্পষ্টতই তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ পরিলক্ষিত হয়-

শ্মশানমণ্ডপে গিয়া বসিল কুমার।

জিয়াইতে নিজপুত্র প্রতিজ্ঞা রাজার।।

কূর্ম্মচক্র নিরমিঞা তাহে সব থুয়্যা।

তাহার উপরে বৈসে সুসজ্জিত হৈয়া।।

একে একে ন্যাস করে যার যত বীজ।

শোষণ দহন বৃষ্টি উৎপাতন নিজ।।

করিলেক ভূতশুদ্ধি একান্ত হইয়া।

পঞ্চদশ দলে পূজে মাতৃ আরোপিয়া।।[১০]

সদানন্দকে বাঁচাতে সুন্দর যে প্রক্রিয়াগুলি করেছে সেগুলি সবই তান্ত্রিক অভিচার। 'ভূতশুদ্ধি', 'ন্যাস' উক্ত অনুষ্ঠানগুলি যথাবিধি পালন করে দেহকে শুদ্ধ করে দেবীর ধ্যান করা স্বতঃসিদ্ধ। সুন্দর এখানে সেই ভূমিকাই পালন করেছে। কূর্ম্মচক্রনির্ম্মাণের বিধি এবং তার উপর উপবিষ্ট হয়ে কার্য করার ফল তন্ত্রে উল্লেখিত। *তন্ত্রসার*[১১] গ্রন্থে এই চক্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। কূর্ম্মচক্র-এর শুরুতে বলা হয়েছে-

দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃত্যং কর্ম্ম ফলপ্রদম্।

পুরুষো দীপ্যতে যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে।।

-অর্থাৎ 'যে স্থানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহার নাম দীপস্থান। দীপস্থানকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়।'[১২] সুন্দর এখানে সেই দীপ্যমান পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নাহলে সে তার পুত্রকে বাঁচাতে পারত না।

আবার দেবী কালিকার এই প্রেক্ষাপটে শ্মশানে উপস্থিত হওয়া সেই ক্ষেত্রেও তন্ত্রের বিষয় ফুটে ওঠে। দেবী কালিকাকে এখানে 'কঙ্কালমালিনী' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। কাব্যে উল্লেখিত-

কিঙ্কিনী মনুজপাণি জটাজুট মাথে।

কাতি কর্পর শোভা করে বাম হাতে।।

অভয় বরদ শোভা করে দুই কর।

শ্রবণযুগে শোভা করে নরসর।

দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান শবে আরোহণ।

ঢল ঢল করে অঙ্গ জলদবরণ।।[১৩]

দেবীর এই শ্মশানে আগমন এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। 'কঙ্কালমালিনী' শব্দের অর্থ মুণ্ডমালিনী কালী। তন্ত্রে উল্লেখিত 'কঙ্কালমালিনী' মূলাধার নিবাসিনী ভগবতী কুণ্ডলিনী শক্তি। তন্ত্রানুযায়ী '...মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী দেবী হইলেন কঙ্কালমালিনী শ্মশানবাসিনী শ্যামা। জাগ্রতা কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথ দ্বারাই যাতায়াত করেন। সুষুম্না হইল শ্মশান এবং সুষুম্নার মূলে অবস্থান করেন বলিয়া কুণ্ডলিনী হইলেন শ্মশানবাসিনী শ্যামা।'[১৪] তাই বারে বারে আমরা দেবীকে এই স্থানে দেখতে পাই এবং ভক্তের ঐকান্তিক ইচ্ছাও তিনি পূর্ণ করেন।

এছাড়াও দেবীর পূজা উপলক্ষে আছে বলিদান প্রসঙ্গ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ছাগ বলির প্রসঙ্গ এসেছে; গুণসাগর রাজা ছাগ, মেষ, মহিষ, গণ্ডক বলি দিয়ে দেবীর পূজা করেছেন-

ছাগ মেষ দিয়া বলি পূজা করে ভদ্রকালী

মহিষ গণ্ডক বলি দানে।[১৫]

তন্ত্রে বলা হয়-

ছাগে দত্তে ভবেদ্ বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।

মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ মৃগে মোক্ষফলং ভবেৎ।।

-অর্থাৎ 'ছাগকে বলি দিলে বাগ্মী হয়, মেষকে বলি দিলে কবি হয়। মহিষকে বলি দিলে ধনবৃদ্ধি হয়। হরিণকে বলি দিলে মোক্ষফল লাভ হয়।'[১৬] এখানে প্রয়োজন সূত্রে বলির প্রেক্ষাপটও দেখার মত, সুন্দরের বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় রাজার সামনে এবং রাজা যে উদ্দেশ্য বলিদান কাজ সমাপ্ত করেছে সমৃদ্ধির জন্য তা সহজেই অনুমেয়।

পশুবলির পাশাপাশি অঙ্গ বলিদানের বিষয় উঠে এসেছে-

অষ্টাঙ্গে জ্বালিয়া দীপ দিল অঙ্গবলি।

একান্তে হইয়া বিদ্যা পূজে ভদ্রকালী।।[১৭]

কালিকাপুরাণ অনুসারে বর্ণিত-

যঃ স্বহৃদয়সঞ্জাতমাংসং মাষপ্রমাণতঃ।

তিলমুদগপ্রমাণাদ্বা দেব্যৈ দদ্যাত্তু ভক্তিতঃ।।

ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্মাৎ কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।

-অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আপনার হৃদয়জাত মাষপ্রমাণ অথবা তিল বা মুদ্গপ্রমাণ মাংস দেবীকে অর্পণ করে, তাহার ছয় মাসের মধ্যে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়।'[১৮] বিদ্যা নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য যে এই অঙ্গবলি দিচ্ছে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

কাব্যে কবি সমাজের কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়ে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিবাহ হত, বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ঘরে রাখা যেত না। পুরাণে উল্লেখিত নিয়মকেই কবি এখানে তুলে ধরেছেন-

অষ্টমে নবমে নাহি কৈলে কন্যাদান।

অষ্টম বরিষে গৌরী নবমে রোহিণী।

দশমেতে কন্যাকাল শুন নৃপমণি।।

একাদশে রজস্বলা সর্ব্বলোকে জানে।

পঞ্চদশ হৈল কন্যা না করিলে মনে।।[১৯]

এই নিয়ম সমাজে বসবাসকারী সবার জন্য, এর অন্যথা হবার জো ছিল না। অন্যান্য কবিদের মত কবির কাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা', 'নারীগণের খেদ' এই রকম বিষয়গুলি অনুপস্থিত। এই বিষয়গুলি যেমন একদিকে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করে আবার মধ্যযুগীয় দৃষ্টিতে অশ্লীল ভাবকেও ফুটিয়ে তোলে। কবির কাব্য এজন্য বহু সমালোচকের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সমালোচক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র মতে-'...অশ্লীলতার অংশ প্রায়ই নাই, যদি বা আছে বেশ ভদ্রয়ানাভাবে লেখা আছে। বইখানি সুপাঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ছেলেপুলে লইয়া একত্রে পড়া যায়।'[২০] এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'বিদ্যাসুন্দরের বিহার'[২১] অংশে। অন্যান্য কবিদের কাব্যের এই অংশ আর কবি বলরাম চক্রবর্তী-র কাব্যের এই অংশের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। কবি যেন এখানে অশ্লীলতাকে শিষ্টতার মোড়ক পড়িয়ে পাঠক দরবারে উপস্থিত করেছেন। কবি হয়ত সেই সময়ে তাঁর কাব্যকে এই অশ্লীলতার বৃত্তের বাইরে রেখে এক নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছেন। সমালোচক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-র মতে- 'আর কোনও বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা বলরামের মত সংযতভাবে বিদ্যাসুন্দরের সম্ভোগ বর্ণনা করেন নাই।'[২২]

কবি সমাজের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে না দিলেও কলিকালে কী অবস্থা হতে চলেছে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়েছেন; তার থেকে ধারণা করা যায় তাঁর সমসাময়িক সময়ে এই বীজ কোথাও না কোথাও লুকিয়ে ছিল-

দ্বিজ না মানিব শূদ্র নাহি দিব দান।

লুব্ধ হইয়া দ্বিজ ছাড়িব নিজ জ্ঞান।।

বেদ বিদ্যা ছাড়িব যতেক দ্বিজগণ।

এই হেতু কলিকালে অকাল মরণ।।

যার ধন হব সেই হব কুলবতী।

পতিনিন্দা করিবেক যতেক যুবতী।।

কূলবধূ ছাড়িব যতেক কুলধর্ম্ম।

নারীর বচন পুরুষের হব ব্রহ্ম।।[২৩]

তথ্যসূত্র

১. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. *বলরাম কবিশেখর বিরচিত কালিকামঙ্গল* , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯২৮।

২. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৩।

৩. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৭৩।

৪. পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পা. ও অনূ. , *শারদাতিলকতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৫।

৫. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৮২।

৬. তদেব, পৃ. ১৩৫।

৭. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., ঐ, পৃ. ৩১৮।

৮. তদেব, পৃ. ৩৬৭।

৯. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৩৮।

১০. তদেব, পৃ. ১৬১।

১১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৫২।

১২. তদেব, পৃ. ৫২।

১৩. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৬২।

১৪. অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী অনূ. , *কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১২, পৃ. ৮।

১৫. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, পৃ. ১৬২।

১৬. পঞ্চানন শাস্ত্রিণা অনূদিত, *মুণ্ডমালাতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ২০।

১৭. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, পৃ. ১২২।

১৮. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা. , *মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিতম্ কালিকাপুরাণম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১২, পৃ. ৬৮৮।

১৯. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, পৃ. ১০৩।

২০. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , ঐ, ভূমিকা অংশ।

২১. তদেব, পৃ. ৯০।

২২. তদেব, পৃ. ৯০।

২৩. তদেব, পৃ. ১৭২।

ভারতচন্দ্র রায়

'নুন খাই যার, গুণ গাই তার' এই কথার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় মধ্যযুগের অধিকাংশ সভাকবিদের রচনাগুলির মধ্যে। বর্তমান সময়ের মতো পাবলিশার্স-এর ভূমিকা পালন করতেন নবাব বা রাজারা। বিনিময়ে সভাকবি বা ওই ধরনের গুণসম্পন্ন মানুষেরা পোষ্টার গুণকীর্তন করতেন। গুণকীর্তন যদি পোষ্টার মনোমত হত তাহলে জুটে যেত রাজকৃপা; এখনকার ভাষায় নামকরা পুরস্কার, খেতাব তো তার উপর উপরিপাওনা। পাঠকরা যেমন(সব পাঠক নন) কোন গ্রন্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে বা না হয়েছে তার মূল্য বিচার করে বই কিনবেন কিনা স্থির করেন, সেটি সাহিত্য পদবাচ্য হোক আর নাই হোক, সেই রকমই মধ্যযুগে কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত কীভাবে পোষ্টা কর্তৃক অনুগ্রহের সিকিভাগ আদায় করা যায়, যাতে করে ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথ মসৃণ হবে; এক্ষেত্রে সাহিত্যের গুণমান গৌণ হলেও আপত্তি নেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পোষ্টার গুণকীর্তন করতে গিয়ে অনেক কবিরা যেমন নিজের প্রতিভার অপচয় করেছেন, তেমনি অনেকে গড়ে ফেলেছেন অনন্য সাহিত্য কীর্তি। সাহিত্যের ইতিহাসে এর বহু নজির আছে। মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে *বিদ্যাসুন্দর* বা *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ভারতচন্দ্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি ভারতচন্দ্রকে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সাথে বিদ্যা ও সুন্দর-এর আখ্যান জুড়তে হয়েছিল। পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্রকে না বলার সাহস তিনি দেখাতে পারেননি। সেইসময়ে চল্লিশ টাকার চাকরি ও রাজানুগ্রহ কেই বা তাঁকে দেবে? তাই কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর অনন্য কাব্যধারার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন আদিরসাত্মক *বিদ্যাসুন্দর*-এর কাহিনীকে।সমালোচক বিনয় ঘোষ-এর ভাষায়-'পেট্রনযুগের এই নিয়ম।পেট্রন দেবতা,পেট্রনই হর্তাকর্তাবিধাতা। পেট্রনই সাহিত্যের উৎসাহদাতা, অন্যতম শ্রোতা ও পাঠক।বাইরের সবকিছুর সম্রাট যিনি, সবকিছুর পেট্রন যিনি,তিনি সাহিত্যেরও সম্রাট, সাহিত্যেরও পেট্রন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে কবি-পণ্ডিতদের একপাও চলবার উপায় নেই, একটি কবিতা বা একটি শ্লোক পর্যন্ত রচনা করার শক্তি নেই।'[১]

কবি ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির সময়কে কবি ভোলেননি। একদিকে বর্গী আক্রমণের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার চিত্র, অন্যদিকে সামন্ত রাজা-জমিদারদের অত্যাচার, ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সবকিছুই কবি ভারতচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কবি নিজেও এই পরিবেশ সম্পর্কে অবগত ও ভুক্তভোগী ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা রাখতে তিনি যেমন *বিদ্যাসুন্দর* -এর কাহিনী সংযোজন করলেন তেমনই সমাজের অবক্ষয়ের টুকরো টুকরো চিত্রও তুলে ধরলেন কাহিনীর চরিত্রগুলির মাধ্যমে। সেখানে আদিরসের প্রাবল্য থাকলেও কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও গভীর মনস্তত্ত্বের জ্ঞান কাব্যের মধ্যে কুশলতা লাভ করেছে। সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র ভাষায়-'ভোগবিকৃতির বিরুদ্ধে কবির যথেষ্ট বিরাগ থাকলেও তাকেই গাঢ়রক্তিম করতে বাধ্য ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বসে। আবার তাঁরই ফাঁকে যেখানে সুযোগ

পেয়েছেন(কিংবা কৌশলে সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন),সেখানেই কামক্লেদের উপরে ঘৃণার থুতু ছিটিয়েছেন।'[২] *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের ক্ষেত্রে এর অন্যথা হয় না। *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য রাজার ইচ্ছায় লিখিত হলেও তার মধ্যে সমাজের যে যে দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্তের মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী সংযোজন করেছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছায়। কাহিনী কবি ভারতচন্দ্র সংযোজন করতেই পারতেন রাজাজ্ঞায় কিন্তু তাতে আদিরসের প্রাধান্য থাকবে এটিই হবে এই কাব্যের মূল ঐশ্বর্য। কাহিনীর বর্ণনায় কবি মঙ্গলকাব্যের রীতিকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন। শাপভ্রষ্ট যোগানন্দ ও যোগবতী মর্ত্যলোকে সুন্দর ও বিদ্যা নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। উভয়ই রাজপরিবারে জন্ম নিয়েছে। গুণসিন্ধু নামধারী কাঞ্চীপুরের রাজার গৃহে জন্ম নিয়েছে সুন্দর ও বর্ধমানে বীরসিংহ নামে রাজার গৃহে জন্ম নিয়েছে কন্যারূপী বিদ্যা। এরপর কাহিনী স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

এখানে *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনীর বর্ণনার সাথে সাথে কবি সমাজের ক্ষয়িষ্ণু চিত্রগুলিও ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সুন্দর-দর্শনে নারীগণের খেদ' অংশে সুন্দরকে দেখে নারীদের একটি অভাব-অভিযোগের পর্যায়কে দাঁড় করিয়েছেন কবি। কবির বর্ণনায়-

' ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার

মিছার সংসার ভাতার জরা।

সতিনী বাঘিনী শাশুরী রাগিণী

ননদী নাগিনী বিষের ভরা।।'[৩]

-অর্থাৎ নারীর জীবনে সুখ নেই।পারিবারিক সুখ কলহ ও হিংসায় পরিপূর্ণ।কেউ কারোর ভালো দেখবার প্রচেষ্টায় নেই। এছাড়াও উল্লেখিত সতীনের প্রসঙ্গ। সতীনপূর্ণ সংসার ও শাশুড়ির বিষতুল্য দৃষ্টি সংসারের পক্ষে কতটা মারাত্মক সেটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি নারীর বক্তব্য নয়, সমকালীন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় সব গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। সতীনবিহীন ঘর ও পরিপূর্ণ পারিবারিক গৃহস্থ জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির ছবি এই সময়ের প্রেক্ষিতে প্রায় দুর্লভ। সমালোচক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় কবি ভারতচন্দ্র-র মতকেই উল্লেখ করে বলেছেন- 'ভারতচন্দ্র লিখেছেন একজন সতীনারীর পৃথিবীতে একমাত্র অবলম্বন তার পতি। বাংলার নারীজাতির জীবন বড় দুঃখের বলে কবি উল্লেখ করেছেন। নারীজাতি সর্বদাই অন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সংসারের বহু মানুষ ও বহু কাজের ভার তাদের বইতে হত।'[৪]

সমাজে অর্থই একমাত্র নিয়ন্ত্রক শক্তি। অর্থ থাকলে সবকিছুই হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব। অর্থের বিনিময়ে দেশ-কাল-সমাজের নিরিখে সবকিছুর প্রাপ্তি ঘটে। হীরা মালিনী সুন্দরকে সেই অমোঘ বাক্যই শুনিয়েছে। কবির ভাষায়-

'কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই বন্ধু নাই কড়ি বই

কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।

কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি-লোভে মরে গিয়া

কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।।'[৫]

সমাজের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থেকে কড়ির প্রতি দায়বদ্ধতা অনেক। কবি ভারতচন্দ্র সমাজে থাকা মানুষের অভাব, দারিদ্র্য যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তেমনি নীতি-শৃঙ্খলার স্বাভাবিক পতনকেও অবলোকন করেছিলেন। ঠিক একইভাবে কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও শুনিয়েছেন সমাজের বিশৃঙ্খলার কথা, কড়ি মাহাত্ম্যের গুণগান-

'শিব শক্তি যুক্তি জীব সবে মুক্তি

কলিকালে হেন পদে।

না বুঝিয়া তত্ত্ব পরদারে মত্ত

মজাইবে মাংস মদে।।

মহতের দায় মিছা দিবে রায়

দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।

কানে দিয়া মন্ত্র করে কত তন্ত্র

কেবল কড়ির উদ্দেশ।।'[৬]

কাঞ্চনের প্রতি যেমন স্বাভাবিক আগ্রহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের, তেমনি কামিনীর প্রতি আগ্রহও কম নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগবৈশিষ্ট্যিই যেন অস্থিরতা-সহিষ্ণুতা, সহানুভূতির রেশ কোথাও নেই। প্রথাসর্বস্বতা, ছুঁৎমার্গ, আত্মকেন্দ্রিকতা যেন সর্বত্র গ্রাস করে ফেলেছে। নারীর রূপবর্ণনা উপভোগ বা সৌন্দর্যের বিষয় আর নেই, অশ্লীল কামের ইঙ্গিত সর্বত্রই চর্চিত। রাজসভায় কাব্যের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে এবং স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর শ্রোতা, তখন আর কমতি থাকার কথা নয়-

'কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।

দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়।।

মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।

অদ্যপি কাঁদিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।।

কবিবর রামরম্ভা দেখি তার উরু।

সুচলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু।।'[৭]

যত আদিরসের বর্ণনা গাঢ় হবে ততই রাজা তথা পোষ্টার মন খুশি হবে। নিজের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে কবি এই কাব্য তথা বর্ণনার মাহাত্ম্যকে আদিরসে নিমজ্জিত করেছিলেন। সমালোচক বিনয় ঘোষ-এর ভাষায়-'সিনেমার যেমন প্রডিউসারের কথা বা আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন, কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত অথবা কোন আধ্যাত্মিক ও পৌরাণিক কাহিনীর সিনেমার মধ্যে যেমন প্রডিউসারের খেয়াল ও রুচির জন্য হঠাৎ খেস্টাওয়ালীর "বিবিজান" গোছের নাচের দৃশ্য সংযোজন ক'রে দিতে বাধ্য হন, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রও তেমনি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে পেট্রন কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যোগ ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।'[৮]

কাহিনীর অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি সুন্দর বিদ্যার কাছে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছে। 'সন্ধি-খনন' অংশে স্বয়ং জগন্মাতা সুন্দরকে সাহায্য করেছেন সুড়ঙ্গ খনন কার্যে। এখানে লক্ষণীয় ব্যভিচার কার্যে আরাধ্যা দেবীও সহায়তা প্রদান করেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এও কি সম্ভব? মনে রাখতে হবে দেবী কালিকাকে কবি স্থাপন করছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য-র *শিবায়ন*-এ দেবাদিদেব শিব পেটের দায়ে কৃষিকাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। স্বর্গের দেবতার গৌরব এখানে ভূলুণ্ঠিত, স্বর্গের আসন ছেড়ে মর্ত্যের সাধারণ মানুষে পর্যবসিত হয়েছে দেব-দেবীরা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ও যৌন মিথুনাচার তাদের প্রধান সঙ্গী, সেক্ষেত্রে দেবী কালিকা যে নিজের আসন ছেড়ে সুন্দরকে অনৈতিক কার্যে উৎসাহ দেবেন এতে আর আশ্চর্য কী! সময়ের সাথে সাথে দেব-দেবীদের অবস্থানের পরিবর্তন কবি ভারতচন্দ্র খুব সুন্দর করে কাব্যে পরিবেশন করেছেন।

কাহিনীর পরবর্তী ধারায় 'রাজার বিদ্যার গর্ভ শ্রবণ', 'চোর ধরা', 'মালিনী নিগ্রহ' প্রভৃতি কাহিনীর পর কবি ভারতচন্দ্র যে অংশটি সবথেকে গুরুত্বের সাথে পাঠককুলের সামনে পেশ করেছেন সেটি হল-'নারীগণের পতি-নিন্দা'। সুন্দরকে যখন বন্দী করে কোটাল নিয়ে যাচ্ছে তখনই নগরের নারীগণের খেদ বর্ষিত হয়েছে নিজের জীবনের প্রতি। সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র মতে, 'এমন কথা শোনা যায়,ভারতচন্দ্র এই পতিনিন্দার মধ্যে নাকি অনেক কৃষ্ণচন্দ্র সভাসদদের শয়নঘর বেআব্রু করেছিলেন।...পতিনিন্দার শেষে তিনি নিজ পত্নীকে এনেছিলেন-তাঁর মুখে পতিনিন্দা বসিয়ে নিরপেক্ষতা দেখাতে।'[৯]

‘নারীগণের পতি-নিন্দা’ অংশে কবি ভারতচন্দ্র তিন ধরনের স্বামীর কথা বলেছেন। প্রথম শাখায় আছে পাঁচজন দৈহিকভাবে অক্ষম স্বামী। দ্বিতীয় শাখায় চোদ্দজন পুরুষ, যারা কোনো না কোনো রাজকার্যে নিযুক্ত এবং যৌন কার্যে কোনো না কোনোভাবে সমস্যাগ্রস্ত; তৃতীয় শাখায় রয়েছে ‘কুলীন স্বামী’। দ্বিতীয় শাখার কয়েকটি পেশার মানুষের সাথে বিস্ময়করভাবে মিল পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ‘কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন’[১০] অংশ লক্ষণীয়। অধ্যাপক নির্মাল্যকুমার ঘোষ[১১] সুন্দর করে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন-

‘নারীগণের পতি-নিন্দা’ অনুযায়ী স্বামীদের পেশা	‘কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন’
‘ব্রাহ্মণপন্ডিত’	‘কালিদাস সিদ্ধান্ত পন্ডিত সভাসদ।’
‘রাজগণক	‘গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি।’
‘রাজবৈদ্য’	‘বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।’
‘বখশী’	‘রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি।’
‘মুনশী’	‘কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনশী প্রধান।’
‘ঘড়েল’	‘ঘড়ীয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন।’

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা কাকতালীয় না সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা অসম্ভব। এছাড়াও কবি আরো পেশার বর্ণনা দিয়েছেন-‘উকীল’, ‘আরজবেগী’, ‘খাজাঞ্চী’, ‘পোদ্দার’, ‘দপ্তরী’ ইত্যাদি। প্রত্যেকের বিবরণ শুনে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ে বহু মানুষেরই সুস্থ জীবনযাপন ছিল না, মানসিক দিক দিয়ে তারা হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র ভাষায়-‘...পুরুষতান্ত্রিক এদেশের সমাজ-পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ এবং নারীর ক্ষেত্রে একবিবাহ, (বৈধব্য ঘটলেও), এবং প্রায়শ বাল্য বিবাহের বিধান দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নিপীড়িত কামনার যে-রুদ্ধ ক্রন্দনকে প্রতিক্ষণে নারীরা বহন করে, তাকেই কিছুটা মুক্তির সুযোগ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র।’[১২]

‘নারীগণের পতি-নিন্দা’ অংশে কবি নিজেকেও বাদ রাখেননি। সাধারণত স্ত্রীর দাবি যে কী কী হতে পারে তা তিনি দেখিয়েছেন। তেমনি সেগুলি না পূরণ করার দরুন নিজের অক্ষমতাকেও সর্বসমক্ষে হাজির করেছেন। কবি নিজে কাব্য রচনা করলেও সমাজের বাইরে যে তিনি অবস্থান করেন না,তার বর্ণনাও তিনি করেছেন। অস্থির সময়ে চল্লিশ টাকার বিনিময়ে চাটুকারিতা করে সবকিছুর স্বাদ পূর্ণ করা যায় না, একথা তিনি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করেছেন-

‘পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।

চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে।।

কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।

কত মতে কত রাত্রি বলি হারি তার।।

শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।

কেবল বাক্যের গুণে বিহারের প্রভু।।'[১৩]

কবির জীবন যে প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। অনেক কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও পুরোপরি সফল তিনি কোনোদিনই হননি। সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এ বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন-'...চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিয়ে করা কবির শিশু পত্নী ছাব্বিশ বৎসর পরেও হৃদয়েশ্বরী। ভারতচন্দ্রের সন্ন্যাস ত্যাগ, গৃহজীবনে প্রর্ত্যাবর্তন, ব্যক্তিজীবনের শুচিতা, আজীবন সংগ্রাম-সবকিছুর মূলে যেন এই প্রেমময়ী গৃহলক্ষী। উভয়ের প্রেমের এমন নিত্যস্বাদের অবস্থা যে, প্রৌঢ় বয়সেও গৃহিণীকে চটিয়ে রোষ-রাগ উপভোগের লোভ কবির যায়নি।'[১৪]

কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি, সুন্দরকে শাস্তিদানের জন্য প্রস্তুত করলে সুন্দর পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে দেবী কালিকার স্তুতি করেছে। কবি ভারতচন্দ্র সুন্দরের মুখে যে পঞ্চাশ অক্ষরে কালীস্তুতি করেছেন তাতে তন্ত্রের অনুষঙ্গ স্পষ্ট। কবির এই তন্ত্রের অনুষঙ্গ আনার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করেছে। প্রথমত, রাজপরিবার তথা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন, সেক্ষেত্রে তন্ত্রর অনুষঙ্গে কাব্য রচনা খুব একটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়ত যে সময়ে কবি এই কাব্যরচনা করেন, তখন সমাজে বিশুদ্ধ ধর্মাচরণ অপেক্ষা ধর্মের স্খলন মূল আলোচ্য। কবি যে বিশুদ্ধ ধর্মাচরণের নিদর্শন দেখিয়েছেন তাও নয়, সূক্ষ্ম রসিকতা ও পরিহাসকে এর সাথে যুক্ত করেছেন। সমালোচক রমাকান্ত চক্রবর্তী-র ভাষায়-' 'অন্নদামঙ্গল'-এর দ্বিতীয় খন্ডকে "তান্ত্রিক" কাব্য বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এখানে অন্নদা গৌণ, কালী মুখ্য, রিরংসা এই কাব্যের মূল সুর।'[১৫]

রুদ্রযামলম্ গ্রন্থের দশম পটলে 'কুমার্য্যাঃ সহস্রনামানি' অংশে উল্লেখিত এইরকম আক্ষরিক স্তোত্র:

'ওঁ কুমারী কৌশিকী কালী কুরুকুল্লা কুলেশ্বরী।

কনকাভা কাঞ্চনাভা কমলা কালকামিনী।।'...[১৬]

ভারতচন্দ্রের ভাষায় সেটি কিছুটা পরিহাসযুক্ত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে-

'টঙ্কিনী টমক টাঙ্গি টানিয়া টঙ্কার।

টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার।।

ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।

ঠেঁটায় করিয়া ঠেঁটা ঠক কৈলা ঠকে।।'[১৭]

কিন্তু ভারতচন্দ্র 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে সুন্দর কর্তৃক দেবী কালিকার স্তুতি করেছেন তাতে তন্ত্রের স্বীকৃতি স্পষ্ট:

'পঞ্চাশস্মাতৃকাদেবীং নানাসুখবিলাসিনীম্।

নানাবিদ্যাময়ীং দেবীং মহাবিদ্যাময়ীং তথা।।'[১৮]

এছাড়াও 'দেবীর সুন্দরে অভয় দান' অংশেও তন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়,কাব্যে বর্ণিত-

'বরপুত্র চোর হৈল   কোটাল মশানে লৈল

কালীর অন্তরে হৈল রোষ।।

সাজ বলি কৈলা রব   ধাইল যোগিনী সব

অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ।।

ডাকিনী হাকিনী ভূত   শাঁখিনী পেতিনী দূত

ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।'[১৯]

যোগিনী, ডাকিনী, হাকিনী, শাঁখিনী, পেতিনী এরা প্রত্যেকেই দেবীর সহচরী। দেবী প্রয়োজন সাপেক্ষে এঁদেরকে প্রেরণ করেন, যেমন-শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের সময় দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শিব চণ্ডীকে নির্দেশ দেন দৈত্য নিধন করতে, ফলে দেবী চণ্ডী দেহ থেকে এই দেবীদের উৎপন্ন করেন-ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী। এই সপ্তমাতৃকা দেবীর সহচরী রূপেই স্বীকৃত।*স্কন্দপুরাণ*-এর *কাশীখণ্ড*-এ দেবীর আবার অন্যান্য নামে সহচরীদের নাম পাওয়া যায়। *কালিকাপুরাণ*-এও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমালোচক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য-র মতে-'শিবানুচরদের যেমন ভূত প্রেত ইত্যাদি বলা হয়েছে তেমনি দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গদের ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি বলা হয় । এরা শক্তিদেহসমুৎপন্না। তন্ত্রশাস্ত্রে এদের বিচিত্র রূপের বিবরণ আছে। ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি শক্তিদেবতার সহচরী।'[২০] *যোগিনীতন্ত্র*-এ যোগিনীদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে দেবী কালী দানবেশ্বরকে পরব্রহ্মের রূপ প্রদর্শনের জন্য নিজ দেহ থেকে কোটি কোটি যোগিনীদের উৎপন্ন করেন এবং তাদের সূর্যসম দীপ্তি চারিদিকে প্রকাশিত হতে লাগল।

'মহারাবৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু যতো ঘোরপরাক্রমৈঃ।

রশ্মিবৃন্দসমুদ্ভূতা যোগিন্যঃ কোটিকাটিশঃ।।

সমন্তাদ্ ঘোররূপস্থা মহাযুদ্ধবমহোৎসুকাঃ।

প্রতিলোমকূপমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডং কোটিকাটিশঃ।

ভাসন্তে সততং দেবি সর্ব্বাঃ সূর্য্যময়াঃ পুনঃ।।'[২১]

এঁরা দেবীরই অঙ্গ এবং দেবীরূপেরই নানা রূপান্তরমাত্র। *কুলার্ণবতন্ত্র*-এ ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য সেটি হল হীরা মালিনী চরিত্র। কবি সমাজের বাস্তব ও জীবন্ত উপাদানে তাকে গড়ে তুলেছেন। সে যেমন কোন্দল পরায়ণা, তেমনি বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্না। হীরা সম্পর্কে কাব্যে বর্ণিত:

'কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।

দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।।

গাল ভরা গুয়া পান নাকি মালা গলে।

কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে।।

চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।

ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।।'[২২]

অর্থাৎ হীরা মালিনী সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের অংশ।তাঁর মধ্যে যেমন বাক্যের স্রোত অফুরন্ত তেমনি স্নেহ, মায়া-মমতার অংশবিশেষও অবশিষ্ট আছে। বাস্তবজ্ঞান অপেক্ষা সমাজের কশাঘাত তাকে আরো প্রখর করে তুলছে। অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা হীরা মালিনীর চরিত্র এই কাব্যে স্বতন্ত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তী যেমন তাঁর কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল-এর মতো অনন্য চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন যা সর্বকালের বাস্তব চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। তেমনি ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী সমাজের সেই নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা চরিত্র, যাঁর মধ্যে দিয়ে কবি সমাজের রূঢ় বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন। প্রমথনাথ বিশী-র মতে-'হীরা মালিনী তাঁহার বিশিষ্ট গুণের ফল নহে, নিতান্তই tour

de force, সেকালের কৃষ্ণনগরের রাজপথে পড়িয়া পাওয়া রত্ন।...অন্নদামঙ্গল-কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি আজ সম্পূর্ণ প্রাণহীন; কেবল ঐ কোন্দল পরায়ণা মালিনীটা আজও জীবিত, এতই সজীব যে কাছে যাইতে সাহস হয় না, পাছে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়; কিংবা সর্বনাশ, সুন্দরের মতো নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে লইয়া যায়।'[২৩]

ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য একদিক থেকে যেমন টুকরো টুকরো ছবির কোলাজ তেমনি কবির তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ব ও সমাজবাস্তবতার দলিল। সমগ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। কবি সুগভীর অধ্যয়নে বুঝেছেন:

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।।'[২৪]

জীবনে সুসময় ক্ষণস্থায়ী। 'বড়র পিরীতি' অর্থাৎ রাজানুগ্রহ 'বালির বাঁধ' আজ আছে কাল নেই, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো দূরে ফেলে দেবেন-একথা কবি জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন।জীবনে ষড়যন্ত্রের বলিও হয়েছেন তিনি। কারাবাসের অভিজ্ঞতাও ওঁনার ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হুকুম যেমন তিনি পালন করেছিলেন তেমনি শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকেও দূরে সরে আসেননি। সাধারণ মানুষের চাহিদা ছিল খুব সামান্যই-*অন্নদামঙ্গল*-এর ঈশ্বরী পাটনীর মতো, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকে এবং *শিবায়ন* কাব্যের মা মেনকার করুণ প্রার্থনা জামাতার কাছে সদ্য বিবাহিতা মেয়ের জন্য-

'আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।

প্রীত কর্য় যেমন জানকী রঘুনাথ।।'[২৫]

এটুকুই ছিল বেঁচে থাকার চাহিদা; সেজন্য পুরানো ও নতুনের সংযোগস্থলে কবি ভারতচন্দ্র স্থাপন করেছেন নিজের কাব্যকে,স্থাপন করেছেন নতুন আদর্শ তথা পরিশীলিত ভক্তিবাদ। সমালোচক স্মৃতিকণা চক্রবর্তী-র মতে-' "দেশের মন হইতে তখন আত্মবিশ্বাস মুছিয়া গিয়াছে, চারিদিকে শাঠ্য ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু হইয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র অঙ্কিত দেবদেবীর চরিত্রে ধূলাবালি লাগিলে কবিকে দোষ দেওয়া যায় না।" বরং 'ধূলাবালি' লাগা ভারতচন্দ্রের ভক্তিবাদ এভাবেই সংশয়ের আশ্রয়ে লালিত হয়ে গড়ে তুলেছে এক একান্ত মৌলিক অস্তিত্ব, মধ্যযুগের অপরাপর কবি ব্যক্তিত্বের থেকে যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করেছে রায়গুণাকরকে।'[২৬]

পরিশেষে বলা যায় ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যকে নিয়ে বহু সময় অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। সাহিত্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেকক্ষেত্রে এই কাব্যকে সাহিত্যের পদমর্যাদা দিতে চাননি। অভিযোগের উত্তরে বলা যায়, 'কবিকে ভক্তিকাব্য লিখে ফেলার পরও আবার রাজার ফরমায়েশে কাব্যে যোগ করতে হয় কাম-মঙ্গল আখ্যান,এ কি তবে সেই রাজার ও রাজদরবারের প্রতি কবির তির্যক সুকৌশলী প্রতিবাদ?'[২৭] অথবা সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর

ভাষায় বলা যেতে পারে-'ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এ রসের নাম আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের এ রসের বিশেষ স্থান নেই।...ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।'[২৮] রসিক পাঠক এ দু'পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষে নিজের অবস্থান বজায় রাখবেন তা পাঠকই ঠিক করবেন, নাকি দু'পক্ষেই মতামত দেবেন তা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের মতামত সাপেক্ষ।

তথ্যসূত্র

১. বিনয় ঘোষ, *জনসভার সাহিত্য*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৮ ।

২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *কবি ভারতচন্দ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৪১।

৩. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা,১৯৯৭,পৃ. ১৫।

৪. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়,*প্রাক্-পলাশী বাংলা(সামাজিক ও আর্থিক জীবন,১৭০০-১৭৫৭)*, কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৩৮।

৫. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৬. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পা., *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭০৬-৭০৭।

৭. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত,পূর্বোক্ত,পৃ. ১৯।

৮. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

৯. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

১০. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

১১. নির্মাল্যকুমার ঘোষ, *অন্নদামঙ্গল পাঠের রূপ রেখা* ; তাপস ভৌমিক সম্পা., *কোরক* , মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা সংখ্যা, শারদীয় ২০১৬,পৃ. ১৩৩।

১২.শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৩০।

১৩. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত,পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৬-৫৭।

১৪. শঙ্করীপ্রসাদ বসু,পূর্বোক্ত,পৃ. ১৩৩।

১৫. রমাকান্ত চক্রবর্তী,*ভারতচন্দ্রের ধর্ম;* সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর সম্পা., *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা,* বিশেষ সংখ্যা ভারতচন্দ্র-১, ভাদ্র-মাঘ, ১৪০৯:প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৯।

১৬. সৌমানন্দ নাথ ও বিজন বিহারী গোস্বামী সম্পা., *রুদ্রযামলম্(উত্তরতন্ত্রম্),* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৪, পৃ. ৪১।

১৭. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

১৮.*কামধেনুতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

১৯. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত, পূর্বোক্ত,পৃ. ৬৭-৬৮।

২০. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব* ,ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৪,পৃ. ৩৪২।

২১. স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী সম্পা., *যোগিনীতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫,পৃ. ৯১।

২২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

২৩. প্রমথনাথ বিশী, *বাংলা সাহিত্যের নরনারী,* মৈত্রী, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ১৮।

২৪. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত,পূর্বোক্ত,পৃ. ২২।

২৫. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পা., *রামেশ্বর রচনাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৩৭৬।

২৬. স্মৃতিকণা চক্রবর্তী, *মঙ্গলকাব্য:পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* , বিদ্যা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪২২।

২৭. নির্মাল্যকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

২৮. সুমিতা চক্রবর্তী সম্পা., প্রমথ চৌধুরী *প্রবন্ধসংগ্রহ,* প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৩,পৃ. ২৫৩।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী

বাংলা *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারার একজন কবি হলেন কবি মধুসূদন চক্রবর্ত্তী । এই কবির নাম বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে উল্লেখ থাকলেও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারার অন্যান্য কবিদের কাব্য প্রতিভা এতটাই সুবিস্তৃত হয়েছিল যে বহু কবি এই কাব্যধারায় তার রচনা সৃষ্টি করলেও তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। বিশেষত ভারতচন্দ্রের কাব্য এতটাই জনমানসে গৃহীত হয়েছিল বহু কবিরই কাব্যপ্রতিভা ম্লান হয়ে যায়। কবি মধুসূদন চক্রবর্ত্তী তাঁদের মধ্যেই একজন।

কবি মধুসূদন চক্রবর্ত্তী-র সময়কাল নিয়ে কিছুটা দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। সমালোচক প্রফুল্ল পাল কবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে বলেছেন-'মধুসূদন কবীন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের ভাষা ও বিষয়বস্তু লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, ইহা রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র পূর্ববর্ত্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচনা।'[১] কবির আবির্ভাবকাল নিয়ে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতও একটু ভিন্ন। তাঁর মতে- 'কিন্তু ইহার ভাষার মধ্যে এমন কোন প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই যাহাতে উহাকে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী বলিতে হইবে। এই অপরিণত ও দুর্বল রচনা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে।'[২] সমালোচকদের মূল্যায়ন থেকে বোঝাই যায় কবির কাব্য জনসাধারণের কাছে বৃহত্তর সমাজ দর্শন বা কাব্যরস উত্থাপন করতে পারেনি।

কাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গতানুগতিকভাবেই কাহিনীকে পাঠককুলের সামনে হাজির করা হয়েছে। অন্যান্য কবিরা যেভাবে কাব্যের সূত্রপাত করেছেন তেমন ভাবেই কাব্যের সূচনা ঘটেছে। কবি কালীর বন্দনা করেছেন এভাবে-

গলে দোলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল

শ্রুতিযুগে দনুজকুণ্ডল।

কিঙ্কিণীদনুজকরে ক্ষিতি কাঁপে পদভরে

ভয়ানক মস্তক কুণ্ডল।।

দেখি সুখে মহামায় উরিল্যা সুন্দর রায়

ভূমিতলে করে দণ্ডবৎ।[৩]

এখানে কবি দেবীর ভয়ানক রূপকে তুলে ধরার পাশাপাশি দেবীকে ‘মহামায়’ বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে দেবীর গলায় মুণ্ডমালা বিদ্যমান।দ্র.১ জগৎ সংসারের সৃষ্টিকর্ত্রী রূপে এখানে কবি ইঙ্গিত করেছেন। *কালিকাপুরাণ* অনুসারে দেবী কালিকা জগৎময়ী; সেখানে বলা হয়েছে-

বিদ্যা বিদ্যাভাবিনী কামরূপা, স্থূলা সূক্ষ্মা মায়য়া যাদিমায়া।

ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যৈরর্চিতা ভূতিদাত্রী, রক্ষাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতো ভৈরবী মাম্।।

-অর্থাৎ ‘বিদ্যা ও অবিদ্যার ভাবিনী, কামরূপা, আদিমায়া এবং মায়াবশে স্থূল ও সূক্ষ্মাকারে অনুভূয়মানা ব্রহ্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক অর্চিতা এবং ভূতিদাত্রী ভৈরবী সর্ব্বত্র আমায় রক্ষা করুন।’[৪] দেবী কালিকার সঙ্গে জগৎ একাত্ম, বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে। আবার দেবী ‘বাঘছাল’ পরিহিতা। এই পোশাকের রীতি দেবী তারার সঙ্গে অভিন্ন। দেবী তারা ও দেবী কালিকা ভিন্ন নয়, শুধুমাত্র নামের তফাৎ; উভয়ই দেবী শক্তির রূপ। ‘সুন্দরের কালী সাধন’ অংশেও দেবীর এই রূপই দেখা যায়-

খড়্গ চক্র কৃপাণ খর্পর শোভে কিঙ্কিনী।

মুণ্ডমালা গলে দোলে গগনবসনা।

পরিধান বাঘছাল বিস্তারবদনা।।[৫]

তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখিত-

মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে, প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।

ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে, খড়্গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে।।

খর্ব্বে গর্ব্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে, ব্যাঘ্রত্বকপরিবীতসুন্দরকটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে।

সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃপরিমল-ন্মুণ্ডদ্বয়ী-মূর্দ্ধজগ্রন্থিশ্রেণি-নৃমুণ্ডদামললতি ভীমে ভয়ং নাশয়।।

-অর্থাৎ ‘হে জননি, নীলসরস্বতি, যাহারা তোমাকে প্রণাম করে, তাহাদিগকে সৌভাগ্য-সম্পদ প্রদান করিয়া থাক; শবরূপী হরের হৃদয়ে প্রত্যালীঢ়পদে সহাস্য বদনে রহিয়াছে-

প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় তোমার তিনটি নয়ন; চারিহস্তে কর্ত্রিকা, নরকপাল, উৎপল ও খড়গ ধারণ করিতেছ, তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্রী ঈশ্বরী তোমাকে আশ্রয় করি।।...

তুমি খর্ব্বদেহ হইলেও গর্ব্বভরে উন্নতাঙ্গী, ভুজঙ্গাদি বেশ ধারণপূর্ব্বক উজ্জ্বলকান্তি হইয়াছ। তোমার কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাহাতে ঘণ্টা বিলম্বিত রহিয়াছে। তোমার গলে নৃমুণ্ডের মালা, মুণ্ডগুলি চুলেচুলে বাঁধা, সদ্যশ্ছিন্ন গলে গলে গলিতরক্তে জুড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মালা গাঁথিতে রজ্জু বা সূত্রের প্রয়োজন হয় নাই। এরূপে তুমি ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ-তোমাকে দেখিয়া আমাদের ভয় জন্মিতেছে; মা আমাদের ভয় দূর কর।'[৬] কবির কাব্যের বর্ণনার সাথে সাথে তন্ত্রের এই গূঢ় বিষয়ও এর মধ্যে নিহিত।

কবির কাব্যের অন্য অংশে দেবী কালিকাকে অন্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'সুন্দর কর্ত্তৃক চৌতিশা স্তব' অংশে বর্ণিত-

পতিতপাবনী শ্যামা বলিএ তোমারে।

এ সময় এমতি উচিত নহে তোরে।।

তোমার চরণ বলে পাষাণ বান্ধিছি গলে।

কাল জনে হেলে উর তরায়।।

জগতজননী শ্যামা নাম তোমার।

শুনিঞা ভরসা বড় হইঞাছে আমার।।[৭]

এখানে দেবী কালিকা 'শ্যামা' নামে উল্লেখিত হয়েছে। দেবী শ্যামা সম্পর্কে তন্ত্রে উল্লেখিত-'...সদাকারা অর্থাৎ সৎস্বরূপিণী, পরানন্দা অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপিণী, সংসার-উচ্ছেদকারিণী অর্থাৎ মুক্তিদাত্রী সেই পরমা দেবী শিবা। তিনি শিব থেকে অভিন্না, শিবঙ্করী।'[৮] সুন্দর চৌতিশা স্তবে এই দেবীরই কৃপা প্রার্থনা করেছে। সেইজন্য কবি 'পতিতপাবনী শ্যামা' বলে সম্বোধন করেছেন। দেবীই যে জগতের মূল চালিকা শক্তি তা কবির বক্তব্যে প্রমাণিত-

সত্ত্বগুণে দেহ ভরাভর।

পালই জগত পরাপর।।

ত্রিভুবনে তুমি মহামায়া।

প্রণত জনেরে কর দয়া।।[৯]

দেবী হতেই সমস্ত কিছুর উৎপত্তি, তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের এই গূঢ় বিষয় এখানে প্রতিফলিত। কাব্যে বর্ণিত-

তুমি স্রষ্টা তুমি স্থিতি তুমি সুভাষে ভগবতী

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র অবতার।

কেবা ত্রিভুবন মাঝে তোমার অধিক আছে

অধমেরে করহ উদ্ধার।।[১০]

সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস তন্ত্রের মত উদ্ধৃত দেবী কালী সম্পর্কে বলেছেন- ' ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা কালিকার থেকেই উদ্ভূত আবার কালিকার মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হন। নির্বাণতন্ত্রের অভিমত-বৃক্ষ যেমন মাটিতে জন্মে মাটিতে মিশে যায়, বুদ্বুদ যেমন জলে জন্মে জলে মিশে যায়, তড়িৎ যেমন মেঘে উৎপন্ন হয়ে মেঘে বিলীন হয়, তেমনই ব্রহ্মাদি দেবতারা সৃষ্টিকালে কালিকার থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার প্রলয়কালে তাঁর মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হন।'[১১] তন্ত্রের এই প্রতিধ্বনি কবির উপরিউক্ত ছত্রে লক্ষণীয়।

কালিকামঙ্গল কাব্যে দেবী কালিকাই কাব্যের যেমন আধার তেমনি জগতের। শক্তি ছাড়া শিব নিষ্ক্রিয়, তার কোনো গুরুত্বই নেই। শক্তি ব্যতিরেকে কখনো শিব একা থাকতে পারে না; দেবী শিবকে চালনা করেন বলেই জগতের ক্রিয়া শক্তি সজীব থাকে। কাব্যের 'দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন' অংশে লিখিত-

শঙ্কর বলেন শুন ত্রিদশ-ঈশ্বরী।

দিগম্বর যোগধর্ম্ম যোগবলে করি।।

যোগবলে মোর কিবা অন্তর বাহির।

যতেক জনম তুমি তেজিলে শরীর।।

সেই অস্থি মালা করে পড়িলাঙ গলে।

সেই শ্মশানে মায়াবিনী তথি শোকজলে।।[১২]

মহাদেব যখন নিজের নিত্যতা প্রকাশ করেন তখন দেবী নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেন-

ঈষৎ হাঁসিয়া কহে অনন্তরূপিণী।

শুনহ কারণ এর রক্ত তরঙ্গিণী।।

যত জন্ম প্রসবিল বিধিহরিহর।

অদ্যাপি তাহার রক্ত বহে নিরন্তর।।

নদী হৈয়া বহে বেগে অতি তরঙ্গিণী।

শুনিয়া এ সব কথা হর চমকিত।।

বিধি হরি হর তাহা নাহি জানে।

আর কে জানিতে পারে কাহার শকতি।।[১৩]

অর্থাৎ তুমি শুধু ওই মুণ্ডমালা ধারণ করতে পারো তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে কিন্তু এই রক্ত বহমান নদী যা আদি অনন্তকাল ধরে বহমান যার পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব তার সৃষ্টিকর্ত্রী আমি। দেবাদিদেব মহাদেবেরও এর তল বা সূত্র খুঁজতে অপারগ। দেবী কালিকা হলেন- '...জননি ! তুমি জগতের প্রসূতি, পালয়িত্রী এবং প্রলয়কালে ক্ষিত্যাদি সমস্তের সংহারকারিণী। অতএব তুমি ব্রহ্মা ত্রিভুবনপতি-বিষ্ণু এবং মহেশও তুমি। সমস্তই তুমি অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণ তুমি, উপাদানকারণও তুমি।'[১৪]

কাব্যের শেষের দিকে 'কালিকার নিকট যম প্রভৃতি দেবতাদিগের পরাভব' অংশে তন্ত্রের সূক্ষ্ম ছায়া লক্ষণীয়। কাব্যে লিখিত-

শুনিয়া চলিল বিধি যম সঙ্গে করি।

হংসপিঠে চারিমুখে দেখে দিগাম্বরী।।

সেইরূপে কত বিধি সৃজিল শরীরে।

তেমতি হংসের পিঠে চারি মুখ ধরে।।[১৫]

দেবী এখানে 'দিগাম্বরী' নামে সূচিত হয়েছেন। এই শব্দের একটি অন্য ব্যঞ্জনা বহন করে। সমালোচক অশোক রায়-এর মতে-' দেবী (কালিকা) উলঙ্গিনী কখনওই নন। তিনি দিগম্বরী; অর্থাৎ দিগ্ ব্যাপিয়া অম্বর যাঁর বা দিগ্ বস্ত্রী। আবার পৃথিবীতে সবচেয়ে সূক্ষ্ম আবরণ হল মায়া। তিনি পূর্ণব্রহ্মময়ী বলে মায়াতীতা।'[১৬]

কাব্যে এই তন্ত্রোক্ত বিষয়গুলি নানাভাবে উঠে এসেছে। এছাড়া কাব্যে কোনো নতুনতত্ত্ব নেই। অন্যান্য কাব্যের মতোই এখানেও দেবী কালিকা সুন্দরকে সুড়ঙ্গ খননে সাহায্য করেছেন। কাব্যের অন্যান্য অংশ পর্যবেক্ষণে রাখলে দেখা

যায় কাব্যের বিষয়ে কোনো অভিনবত্ব কবি অনুসরণ করেননি শুধু কাহিনীর ঘটনাগুলিকে শুধু সাজিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে গেছেন মাত্র।

অন্যান্য কাব্যের মত 'নারীগণের পতিনিন্দা' এখানে অনুপস্থিত। মঙ্গলকাব্যে যে সমাজের বৃহত্তর দিকগুলি উপস্থিত থাকে তা কাব্যের সমগ্র অংশে কোথাও দেখা মেলে না। নিতান্তই সাধারণ বিবৃতির আকারে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এক্ষেত্রে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মত প্রণিধানযোগ্য-' কালিকামঙ্গলের লোভনীয় বিষয়বস্তু, যাহাতে ভক্তিরস ও আদিরস মিশিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি কবিযশঃপ্রার্থীদের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য কালিকামঙ্গলে ভক্তিরসের শর্করামণ্ডন থাকিলেও ভিতরে আছে আদিরসের তিক্ত বটিকা-একথা সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় ও শ্রোতারা জানিতেন। তাঁহারা আরও জানিতেন –এই তিক্ত বটিকা যতই তিক্ত হউক, ইহার প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না-তাই সেই আকর্ষণকে কবিরা ভক্তিরসের গঙ্গোদক ছিটাইয়া পবিত্র করিতে চাহিয়াছিলেন-কালিকামঙ্গলের ইহাই দস্তুর।'[১৭] কবি মধুসূদন চক্রবর্ত্তী যে সেই পথেই হেঁটে ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্রষ্টব্য

১. দেবীর গলায় মুণ্ডমালা থাকার একটি অর্থ আছে। সমালোচক অশোক রায় তাঁর *মাতৃকাশক্তি* গ্রন্থে দেবীর গলায় মুণ্ডমালার অর্থ জানিয়েছেন-'কালীর গলায় পঞ্চাশৎ (মতান্তরে এক পঞ্চাশ) মুণ্ডমালা। কারণ তিনি শব্দব্রহ্মময়ী, পঞ্চাশদ্ মাতৃকা বর্ণরূপিণী। এই মাতৃকা বর্ণগুলোও আবার নামরূপাত্মক শব্দার্থময় জগতের প্রতিনিধি। সৃষ্টিকালে দেবীর থেকেই শব্দ-শব্দার্থময় জগতের উদ্ভব; আবার প্রলয়কালে-তাঁতেই বিলয়। এই মাতৃকা বর্ণগুলোর প্রত্যেকটাই-বীজমন্ত্র। অর্থাৎ কোনও দেবতার সূক্ষ্মরূপ। তা হলে সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায়-দেবী কালিকাই মহাদেবী বা মহামায়া; আর অন্য সব দেবীরাই তাঁর রূপভেদ মাত্র। তিনিই সব দেবীদের উদ্ভব ও বিলয় স্থল-জগৎজননী স্বরূপা।' (পৃ. ২২৪)

তথ্যসূত্র

১. মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ; চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. , *বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* , তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯-২০২০, পৃ.২২০।

৩. মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ; ঐ, পৃ. ১০।

৪. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা. , *মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিতম্ কালিকাপুরাণম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৯, পৃ. ৭৬৭।

৫. মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ; ঐ, পৃ. ৪১।

৬. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ৫৩৯।

৭. মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ; ঐ, পৃ. ৩৩।

৮. উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পা. , *পরশুরামকল্পসূত্রম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪১২, পৃ. ৩৫৪।

৯. মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ; ঐ, পৃ. ৩৫।

১০. তদেব, পৃ. ৪১।

১১. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪৬৫।

১২. মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ; ঐ, পৃ. ৪২।

১৩. তদেব, পৃ. ৪২।

১৪. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৪৬৬।

১৫. মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ; ঐ, পৃ. ৪৫।

১৬. অশোক রায়, *মাতৃকাশক্তি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২০, পৃ. ২২৩।

১৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ২২১।

রামপ্রসাদ সেন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে দু'জন বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারার কবির নাম আমরা পাই তাঁরা হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ সেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন এবং রাজাদেশে *বিদ্যাসুন্দর* পালা তিনি কাব্যে সংযোজন করেন। এখানে কবির অভিপ্রায় অপেক্ষা রাজার ইচ্ছা বেশি কাজ করেছিল; তাই কাব্যে কালিকার গুণগান অপেক্ষা সমাজের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি কবির লেখনিতে অধিক পরিস্ফুট হয়। কালিকা সেখানে কিঞ্চিৎ গৌণ, মুখ্য ভাগ অধিকার করে আছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, অপ্রাপ্তি এবং কড়ি মাহাত্ম্যের বিচিত্র লীলা। অপরদিকে কবি রামপ্রসাদ একাধারে সাধক এবং অপরদিকে সৃজনশীল শাক্ত সঙ্গীতের রচয়িতা। কবির রচনায় সমাজের ক্রূর দৃষ্টি নেই এমন কথা বলা যাবে না কিন্তু তাতে মিশে আছে তন্ত্রদর্শনের গূঢ় অভিব্যক্তি এবং উপাসকের অন্তরের ভালোবাসা। কবি রামপ্রসাদের শাক্তসঙ্গীতগুলি সমাজ, সংসার এবং কালের দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি উল্লেখযোগ্য কবির অন্যান্য রচনাগুলি। সেই রচনাগুলির মধ্যে কবির *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য অন্যতম।

কবির আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সাল, তারিখ যথাযথভাবে বলা যায় না। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে কবির আবির্ভাবের কাল গণনা করেছেন ১৬৪২ শকাব্দ বা ১৭২০-২১ সাল এবং মৃত্যুর সময়কাল ১৭৫৯-১৭৯৫ সালের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে।[দ্র.১] কবির জন্ম কুমারহট্ট গ্রামে এবং সেখানে তাঁর সাধনার ক্ষেত্রও বটে। *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যে তন্ত্রসাধনা বিষয়ে তিনি একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন-

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।

তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম।।

শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।

নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।।

শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।

শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা।।[১][দ্র.২]

যে সময়ে কবি জন্মেছিলেন এবং সময় অতিবাহিত করেছিলেন তা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরো ও মধ্যভাগ। এই সময়পর্বের যুগবৈশিষ্ট্য কবির এই কাব্যে উঠে এসেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে উল্লেখিত কবির সাধনধর্মের লক্ষণ এবং তন্ত্রচর্চার বিশিষ্ট পদ্ধতি। এই সবই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

কবি কাব্যের শুরুতে গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী বন্দনা করেছেন তারপর দেবী কালিকার বন্দনা করেছেন। দেবী সরস্বতীকে কবি 'মহাবিদ্যা'-র অংশ রূপে বর্ণনা করেছেন-

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি,　　　বন্দে মাতা সরস্বতী

মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।

কুচভর-নমিতাঙ্গী,　　　ভুবনমোহন ভঙ্গী,

বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী।।[২]

তন্ত্রে সমস্ত দেবীই শক্তি দেবীর আধার। দেবী সরস্বতী শক্তি দেবীরই পরিণত রূপ। তন্ত্রের দেবীমাহাত্ম্যে সমস্ত দেবীই দশমহাবিদ্যার নানান রূপের এক একটি অংশ। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস দশমহাবিদ্যার অধিক সংখ্যক মহাবিদ্যার উদাহরণ দিতে গিয়ে নানা তন্ত্রের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন।দ্র.৩ *নিরুত্তরতন্ত্র*-এ আঠারোজন দেবীকে মহাবিদ্যার অংশ বলা হয়েছে, তার মধ্যে দেবী সরস্বতী যে মহাবিদ্যার অংশ তার স্বপক্ষে প্রমাণ মেলে। পরবর্তী অংশে কবি দেবী কালিকার বন্দনা করেছেন। দেবী কালিকার যে বন্দনা কবি করেছেন তাতে দেবীর ভয়াল রূপই ফুটে ওঠে-

কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো। কলেবর-কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো।।

কটিতটে করাল লম্বিত মুণ্ডমাল। লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল।।

হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পমান্। বামে অসি মুণ্ড যামে বরাভয় দান।।

অপরূপ শবযুগ শ্রবণ যুগলে। বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে।।

বিবস্ত্র যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে। বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে।।[৩]

দেবীর এই রূপের সাথে *তন্ত্রসার*-এ 'শ্যামাপ্রকরণ'-এ উল্লেখিত ধ্যানে মিল পাওয়া যায়-

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বর প্রদাম্।

হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।

মুক্তকেশীং ললজ্জিহবাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।

চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

-অর্থাৎ 'দেবি শবারূঢ়া, মহাভীমাকৃতি, ভীমদশনা, বরদানরতা, হাস্যমুখী ও ত্রিলোচনা। উঁহার হস্তে কপাল ও কর্ত্তৃকা শোভমান; উঁহার কেশদাম আলুলায়িত ও জিহবা লোল। ইনি পুনঃ পুনঃ রুধির পান করিতেছেন। উঁহার চারি হস্তে নরমুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান।'[৪] দেবী একাধারে যেমন বিনাশকারী তেমনি পালনকারীও বটে। দুই রূপের সমাবেশ আমরা এখানে দেখতে পাই।

কবির এই রূপ বন্দনা শুধু কবির কল্পনা নয়, এর পিছনে রয়েছে সামাজিক প্রণোদনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেবী কালিকার রূপ ও আঙ্গিকের বিশেষ তাৎপর্য আছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সব স্তরেই যখন বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান তখন দেবী কালিকার শুধু বরাভয় মূর্তি সাধারণ মানুষের কাছে উপাস্য নয়, এই বিপদকে সমূলে নির্মূল করাও জনমানসের অভিপ্রেয়। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাষায় বলা যায়- '...বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কটের সময় বিশ্ববিধায়িনী শক্তির সংহাররূপিণী মূর্তিটিই তাহার মানস অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে; মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, বিপর্যয়ের ভূমিকম্পে থরথর কম্পমান্ ধরিত্রীর উপর দাঁড়াইয়া সর্বনাশিনী শ্যামার ভয়ঙ্কর কালো রূপটিই চারিদিক হইতে চোখে পড়ে। বাঙ্গালা ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে শ্যামাপূজার প্রাধান্য এক বিপদসঙ্কুল, অনিশ্চয়াত্মক অবস্থার পটভূমিকার উপর নির্ভরশীল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপ্লবের ঘনকৃষ্ণ মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কালী উপাসনা তাহারই অনিবার্য, চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎবিলাস।'[৫]

কাব্যের পরবর্তী 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা' অংশে কবি শক্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গ এনেছেন। দেবী সুন্দরকে 'কালীমন্ত্র' ছেড়ে 'হরমন্ত্র' গ্রহণ করতে বললে সুন্দর যে বিষয় অবতারণা করেছেন তাতে শক্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে-

কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি।

কোন গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি।।

শৈলপুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী।

মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালি।।[৬]

শক্তি ছাড়া শিব থাকতে পারে না, শক্তি আর শিব অভিন্ন। যেখানে দেবী জগৎকে ধারণ করে আছেন তাই তিনি 'জগদ্ধাত্রী' নামে খ্যাত, এখানে শক্তি বিনা শিব নির্গুণ রূপে অবস্থান করে। সাধারণত বলা হয় 'শাক্তমতে শক্তি স্বরূপত চিৎ, তিনি চিন্ময়ী। তিনি স্বতন্ত্রা।'[৭] তাই তাঁকে ছাড়া উপাসনা কার্য চালানো অসম্ভব। শক্তিতত্ত্বের এই গূঢ় ধারণাটি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখিত হয়েছে।

কাব্যে 'কবির ভগবতীর স্তব' অংশে দেবী কালিকার নানান রূপের নাম উল্লেখ করা হয়েছে-

শ্মশানবাসিনী, দনুজনাশিনী, মুণ্ডমালী মা করালী।।

ত্রৈলোক্যবন্দিনী, ভূধরনন্দিনী, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।[৮]

কাব্যে 'বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব' অংশে দেবী কালিকার স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন কবি-

তুমি নিত্যা পরাৎপরা, জন্ম জরা মৃত্যু হরা,

তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব।।[৯]

অর্থাৎ দেবী হতেই সমস্ত জগৎ সংসারের উৎপত্তি। এছাড়াও দেবী সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তা তন্ত্রের মতকেই সমর্থন করে-

তুমি শান্ত পুষ্টি সুধা, তুমি লজ্জা তুমি মেধা,

মহামায়া করালরূপিণী।

শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,

কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী।।

ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ, রূপিণী লিখন কন্দ,

স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।[১০]

তন্ত্রে এই কথার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। *মহানির্ব্বাণতন্ত্র*-এ উল্লেখিত-

মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি।।

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।।

কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।

কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে।।

-অর্থাৎ 'জগৎ সংহারকারক মহাকাল তোমার একটি রূপমাত্র, সেই মহাকাল মহাপ্রলয়ে সমুদয় পদার্থ গ্রাস করিবেন। সর্ব্বভূতকে গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল, তুমি

মহাকালকে গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম কালিকা নামে পরিচিতা। তুমি কালকে গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম কালী, সকলের আদিকালত্ব ও আদিভূতত্ব নিবন্ধন লোকে তোমাকে আদ্যা কালী বলিয়া থাকে।'[১১]

তন্ত্রে দেবী কালিকা যেমন 'আদ্যা শক্তি' বলে অভিহিত করা হয় তেমনি কাব্যের এই অংশে দেবীকে সেই নামেই অভিহিত করা হয়েছে-

একান্ত কাতরা বিদ্যা, তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা,

পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।[১২]

বা

তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, মূঢ়মতি জানি কিবা,

কৃপাময়ি অগতির গতি।[১৩]

এছাড়াও কাব্যে এসেছে নানা তন্ত্রের অনুষঙ্গ। 'সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ' অংশে কবির বর্ণনা-

পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা।

শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা।।

মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গামুণ্ডধরা।

যাম্যে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা।।[১৪]

এখানে দক্ষিণা কালীর প্রসঙ্গ অবতারণার পিছনে তন্ত্রের ইঙ্গিত আছে। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন। *মহাকালসংহিতা* অনুসারে আদ্যা কালী দক্ষিণাকালী। *নির্বাণতন্ত্র*-এর মতকে উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন-'পুরুষকে অর্থাৎ শিবকে বলা হয় দক্ষিণ আর শক্তিকে বামা। বামা দক্ষিণকে জয় করে মহামোক্ষপ্রদায়িনী হন। এই জন্য ত্রিজগতে তিনি দক্ষিণা নামে পরিচিতা।'[১৫] কাহিনীর ঘটনা অনুযায়ী এই বিষয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দর এই উপাসনা করছে মোক্ষ লাভের জন্যই কারণ এর পরেই বিদ্যা-সুন্দর তাদের পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়ে স্বর্গারোহণ করবে। কবির এই বিষয় ভাবনার সাথে তন্ত্রের যোগ স্পষ্ট।

এর পরে এসেছে শবসাধনার প্রসঙ্গ। কবি এখানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-এর *তন্ত্রসার*-এর বচন উদ্ধৃত করে এই শব সাধনার বর্ণনা করেছেন। কবির বর্ণনায় অনেকখানি বিবরণ উঠে এসেছেই এখানে প্রয়োজন ভিত্তিক কিছু কিছু অংশ তুলে ধরব।

যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র। সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র।।

গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী। পূর্ব্বদিগ ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি।।

বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে। যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে।।

অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ। সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ।।

ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়। জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায়।।

তিলোহসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ। তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ।।

শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে। যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে।।

কিন্তু যে সে ঘায়ে মরে না লবে সে শব। বলেছেন গো-বিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব।।

সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর। সে শব প্রসশত লবে হবে যেবা ধীর।।[১৬]

তন্ত্রে উল্লেখিত শূন্য গৃহ, নদীতীর, পর্বত, নির্জন স্থান, শ্মশান বা তার নিকটবর্তী স্থান এই সাধনার জন্য প্রশস্ত। বীরার্দ্দন মন্ত্র, ভূতশুদ্ধি এইসব সাধনার অংশ, এর বিস্তারিত বিবরণ *আগম-তত্ত্ব-বিলাস*[১৭] গ্রন্থে দেওয়া আছে।

শব সাধনার জন্য কোন কোন মন্ত্রের এবং কী কী বস্তুর প্রয়োজন তার উল্লেখ এখানে আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার জন্য কী রকম শব উত্তম তাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কবি এখানে 'অঘোর মন্ত্র', 'সুদর্শন মন্ত্র' উল্লেখ করেছেন। আগমশাস্ত্রে উল্লেখিত 'অঘোর মন্ত্র কিন্তু- ওঁ হ্রী স্ফুর স্ফুর ইত্যাদি মন্ত্র। ওঁ সহস্রারে হূং ফট্-এইটি সুদর্শন মন্ত্র। তাহার পর পূর্বোক্ত ক্রমে ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস সমূহ করিয়া জয়দুর্গামন্ত্রে দিক্ সমূহে সর্ষপ ছড়াইয়া ওঁ তিলোহসি ইত্যাদি মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া বিহিত শবের নিকট গমন করিবেন।'[১৮] তন্ত্রের এই বিবরণের সঙ্গে কবির লিখিত তথ্য মিলে যাচ্ছে। এমনকি শব নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্নতা থাকে তার উল্লেখ নানা তন্ত্রে নানান ভাবে

লিখিত এই কথাও পুরোপুরি সত্যি।দ্র.৪ কাব্যে আরো বিস্তারিতভাবে এই সাধনার কথা উল্লেখিত, এখানে তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কাব্যে দেবী কালিকার আরেকটি রূপের প্রসঙ্গ আছে, সেটি হল ভদ্রকালী প্রসঙ্গ। রাজা চোর ধরার জন্য কোটাল নিয়োগ করলে চোর ধরার পূর্বে কোটালিনী দেবী ভদ্রকালী-র স্তুতি করেছে-

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী।

করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী।।[১৯]

তন্ত্রে দেবী ভদ্রকালীকে আশু শত্রু দমনের জন্যই অর্চনা করা হয়। তন্ত্রে উল্লেখিত-

প্রয়োগমাত্রং কর্ত্তব্যং বৈরিনিগ্রহকারকম্।

ইয়ং দেবী মহাদেবী শত্রুনিগ্রহকারিণী।

যথেষ্টচিন্তয়া চিন্ত্যা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদা।

-অর্থাৎ 'এই দেবীর উপাসনা দ্বারা আশু শত্রুদমন হয়। যে ব্যক্তি যেরূপ কামনা করিয়া এই শত্রুদমনকারিণী ভদ্রকালী দেবীকে উপাসনা করে, তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হয়।'[২০] রাজবাড়ির শত্রু মানে তারও শত্রু। তাকে ধরা তার কর্তব্য। সেই জন্যই কবি এই অনুষঙ্গ ব্যবহারের জন্য দেবী ভদ্রকালীর কথা স্মরণ করেছেন।

তন্ত্রের আরো কিছু সূক্ষ্ম বিষয় এখানে পরিস্ফূট। তন্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তিদের সাধনধর্মের গূঢ় পদ্ধতি ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ এবং তন্ত্রে গুরুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গুরুই প্রকৃত মার্গ শিষ্যকে দেখাবে। কাব্যে বর্ণিত-

গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম।

ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম।।

গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে।

গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে।।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা।

সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্য কথা।।[২১]

রামপ্রসাদের কাব্যেই প্রথম দেখা যায় বিদ্যা ও সুন্দর যোগবলের মাধ্যমে নিজের প্রাণত্যাগ করছে। এইদিক থেকে এটি কাব্যের একটি অভিনবত্ব, আর কোনো বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই রকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না-

হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান।

যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ।।

ধরে অপরূপ পূর্ব্ব রূপ কলেবর।

আছিল যেমন হীরাবতী মালাধর।।[২২]

কবি রামপ্রসাদের কাব্যে তন্ত্রের প্রয়োগ অন্য কবিদের থেকে আলাদা। কবির কাব্যে দেবী কালিকা ভক্তদের কাছে ভয়াল রূপে উপস্থিত হননি কিংবা নিজের দৈবী ক্ষমতা প্রদর্শন করে পূজা আদায়ের চেষ্টাও করেননি। দেবী কালিকা এখানে জগৎ মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে কবি দেবীকে বরাভয়দাত্রীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমালোচক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র মতে-'রামপ্রসাদের শক্তিরূপিণী দেবীর রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে গতানুগতিক চণ্ডী অন্নদা বা কালিকার স্পর্শ কিছু নাই। রামপ্রসাদের তারা বা কালিকা ভয় দেখাইয়া মানুষকে বিপর্যয়ের চক্রে পেষণ করিয়া পূজা আদায় করেন না। রামপ্রসাদের শক্তিস্বরূপিণী মাতৃকাদেবী বাঙালীর স্নেহময়ী জননী।'[২৩] কবি সমাজে বসবাস করেছেন সাধারণ মানুষদের সাথে; তাঁর কাছে তন্ত্রের গূঢ় ও তত্ত্বমূলক জটিল বিষয় কখনোই গৃহীত হয়নি। তিনি জানতেন সাধারণ মানুষের প্রয়োজন একজন আশ্রয়দাত্রীর যার কাছে নিজের মানসিক যন্ত্রণা সবাই খুলে বলতে পারবে; সেই কথা মাথায় রেখে কবি দেবী কালিকাকে স্নেহময়ী মাতারূপে কাব্যে গড়ে তুলেছেন।

তন্ত্রের পাশাপাশি কাব্যে কবি তাঁর সময়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দী সবথেকে আলোড়নের কাল; সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সবদিক থেকেই মানুষের মনে প্রশ্নচিহ্ন আছে সঠিক পথ কোনটা। সাধারণ মানুষ অসহায়, দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ নানা প্রশ্ন চিহ্নের বাণে জর্জরিত। এই প্রেক্ষাপটে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শুনিয়েছেন 'নূতনমঙ্গল'-এর গান। কবি রামপ্রসাদ শুনিয়েছেন আগমনী-বিজয়ার করুণ সুর, তার সঙ্গে সঙ্গে *কালিকামঙ্গল*-এর নব দৃষ্টিভঙ্গি। সমালোচক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র মতে-'রামপ্রসাদের সচেতন সমাজমানস সক্রিয় হইয়াছিল অন্যপথে। তিনিও যে প্রশস্ত প্রাকৃত লোকায়ত জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও মূঢ়তা, দুঃখ-দারিদ্র্য, অত্যাচার, অভাব, অভিযোগ, প্রকৃতির বিপর্যয়ের অভাব ছিল না। সে জীবন ছিল জীবনধনে দীন, আশা ও দুঃখাপহত, দৃষ্টিহীনতায় আচ্ছন্ন।'[২৪] কবি সেইভাবেই কাব্যে তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্ম বিদ্বেষ একটা বড় সমস্যা। সব ধর্মের প্রতিনিধিরা চায় তার ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। কোটোয়াল যখন চোর অন্বেষণ করতে যাচ্ছে তখন ছদ্মবেশ ধারণের সময় তার বক্তব্য-

দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ। কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ।।

কটিতে কৌপিনমাত্র তাহাতে গিরস। সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস।।

গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে। সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে নাটে।।

খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে।।

মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব।।[২৫]

কবির এই বর্ণনা দীর্ঘ। অনেক সমালোচকের ধারণা কবি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বশত এই রকম লিখেছেন, আবার অনেকের মতে সেই সময় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে প্রবল ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, সেইজন্য কবি এই বিবরণ দিয়েছেন। সমালোচক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়-এর মতে-'...অনেকের মতে বৌদ্ধ প্রভাব, তান্ত্রিকমত এবং সহজিয়া মত ও পথ বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বৈপ্লবিক শক্তিকে ধ্বংস করেছিল।'[২৬]

কবির এই ধরণের বর্ণনার পিছনে আরো একটা কারণ থাকতে পারে। সেই সময় মসনদে বসে আছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ধর্মের প্রতি যতটা প্রসন্ন ছিলেন ততটাই বিরূপ ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি। শ্রী হরিদাস দাসের বিবৃতি অনুযায়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে নবদ্বীপের 'শ্রীগৌরমূর্তিকে ছয়মাস যাবৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কাইত রাখা হয়েছিল।'[২৭] কবি রামপ্রসাদের উপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব পড়াও কোনো অযৌক্তিক বিষয় নয়, হতেও পারে কবি রাজার এই মনোভাবের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাথে কবির সদ্ভাব ইতিহাস স্বীকৃত, সুতরাং এই রকম হওয়াও কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কবি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করলেও সর্বধর্মের প্রতি কবি অনাস্থা প্রকাশ করেননি, বরঞ্চ সমন্বয়ের সুর প্রতিফলিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে রাজকর্মচারীদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যেত, বাধ্য হয়ে তারা ঘর ছেড়ে পালাত। সুন্দরকে ধরতে কোটালের অত্যাচার সেই দৃষ্টান্তই উপস্থিত করে-

চোর হেতু ঘরে ঘরে, বিষম বেদাতি করে,

বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।

যাহার বাটীতে থাকে, ইটে খাড়া করে তাকে,

কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া।।[২৮]

এছাড়া রাজবাড়ির কেচ্ছা হলে তার কীরকম প্রতিক্রিয়া হত সমাজে তার বিবরণ কবি দিয়েছেন-

কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কান।।

কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত।

চেষ্টা কর কোনরূপে গর্ভ হয় পাত।।

কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয়।

রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয়।।

কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ি।

রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ি।।[২৯]

রাজবাড়িতে যে এইরকম সেই সময়ে হত, এই বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়। আবার যখন রাজা কোটালকে বলে-

সুরাপানে রাগরঙ্গে, থাক বারবধূ সঙ্গে,

অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি।[৩০]

এখানে কোটালের জীবনযাপনের ছবি কবি শুধু তুলে ধরেননি, সমগ্র সমাজের লাম্পট্যের ছবিকে কবি ইঙ্গিত করেছেন; বা অন্যভাবে বিদ্যাকে যখন রাণী ভৎর্সনা করছেন তাতেও বোঝা যায় সমাজের ছবি কীরূপ-

এই রাজ্য ত্যজ্য করে, যদ্যপি ভাতার ধরে,

বেরুতিস সেও ছিল ভালো।।[৩১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সামগ্রিক ছবিই এটি। কদাচার, ব্যভিচারে মগ্ন সমাজব্যবস্থা। নারী-পুরুষ কেউ এর বাইরে নেই। সুন্দর দর্শনে নগর-নাগরীদিগের উক্তি থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে মেয়েদের সংসার জীবন কতটা অতৃপ্তিপূর্ণ ছিল-

কেহ কহে আজি, ওকে করো রাজি, শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে।

শাশুড়ি-শ্বশুর, নাহি পতি দূর, শূন্য মোর পুর, কে দিবে তেড়ে।।

কহে কোন নারী, হয় আজ্ঞাকারী, ভুলাইতে পারি, এ গুণ আছে।

বিধবা যে গুলা, বিষম ব্যাকুলা, চক্ষে দিয়া ধূলা, লবে গো পাছে।।[৩২]

কুলীন বিবাহ, কম বয়সে স্বামী বিয়োগ, সতীনপূর্ণ সংসার ইত্যাদি নানা কারণে মেয়েদের সংসার সুখের হত না; তাদের কামনা পরিতৃপ্তি না হবার দরুন এই আক্ষেপ বাণী কবি তাদের মুখ দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কবি শুনিয়েছেন কলিকালের মাহাত্ম্য যা সেই যুগের ফিরিস্তিও বটে-

কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।

সবে মাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি।।

ব্রাহ্মণ করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।

অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম।।

অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।

মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য।।[৩৩]

এছাড়াও কবি যাত্রা বিষয়ক লোকসংস্কারের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ‘সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা’ অংশে উল্লেখিত-

সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা।

দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা।।

ধেনু বৎস প্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা।

পূর্ণকুম্ভ কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা।।[৩৪]

কাব্যে কবি এই সব অপেক্ষা দেবী কালিকার শরণের কথাই অধিক বলেছেন। এই কথা মনে রাখতে হবে তিনি প্রথমে সাধক, তারপর কবি। সমস্ত সমাজ, সংসারকে তিনি সহানুভূতি ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। সমালোচক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র মতে-‘ কিন্তু প্রসাদের দৃষ্টি ছিল প্রেমসিক্ত। যেহেতু সে সমাজের দোষ-গুণ, উন্নতি-অনুন্নতি, দৈন্য বা ঐশ্বর্য্য-সকলই সেই মায়েরই লীলাবৈচিত্র্য প্রসাদ সে জীবনের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন, তাহার ক্ষতে প্রীতির প্রলেপ বুলাইয়াছেন।’[৩৫]

এই প্রশ্নচিহ্ন উঠতেই পারে, যেখানে ভারতচন্দ্র কাব্যে তুলে ধরছেন অসঙ্গতির সুর ব্যঙ্গের তীব্র কটাক্ষ সেখানে কবি রামপ্রসাদ নতুন করে কী আর শোনাবেন? এটা মাথায় রাখতে হবে দু’জন কবি *কালিকামঙ্গল* কাব্য লিখছেন কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে। ভারতচন্দ্রের কাব্য আধুনিক; নব নব ছন্দের পাশাপাশি সামাজিক বিকৃতিকে স্থান দিয়ে তিনি

তাকে ব্যঙ্গের নজরে প্রশ্ন করেছেন। তাকে শুধরে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, তাই প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থেকেছেন। তিনি নিজেও রাজকীয় পরিবেশে বড় হয়েছেন, কাব্যও লিখেছেন রাজাদেশে। সেক্ষেত্রে তাঁর দেখাটা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অপরদিকে কবি রামপ্রসাদের দেখার দৃষ্টি একদম সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে। সাধক হলেও আর্থিক কষ্ট তাঁর জীবনকেও পীড়িত করেছে। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া দ্বন্দ্ব, ধর্ম নিয়ে ব্যভিচার সবকিছুই তিনি প্রত্যক্ষত দেখেছেন। সবথেকে বড় কথা কারোর আদেশ তাঁর উপর শিরোধার্য ছিল না, তিনি লিখে গেছেন আপন প্রাণের আনন্দে। তাই সেক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের মতো তাঁর কাব্য জনপ্রিয় নাহলেও কাব্যের সহজ সুর তাঁর কাব্যে ছিল, সেটাই ছিল কাব্যের স্বাভাবিক ছন্দ।

দ্রষ্টব্য

১. কবি রামপ্রসাদের আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট সংশয় আছে। নির্দিষ্ট সাল ও তারিখ কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেননি। সম্ভাবনা ও ধারণার উপরে সবাই কবির কালসীমা নির্দেশ করেছেন। সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম* গ্রন্থে সব মতামতকেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সম্ভাব্য কালসীমা নির্দেশ করেছেন। পৃ. ৩২০-৩২২।

২. সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় *রামপ্রসাদ* নামক জীবনী গ্রন্থে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন-'সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশের একজন সাধক ছিলেন রামকৃষ্ণ চৌধুরী। তিনি একটি সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হালিশহরে, তাঁদের বাড়ির কাছে। তারই নাম 'রামকৃষ্ণমণ্ডপ'। প্রবাদ ছিল, ওখানে কোটিবার হোম হয়েছে, কোটিবার মহাবিদ্যা কালিকার নামজপ হয়েছে। স্বপ্নাদেশের কথা শুনে আনন্দে উৎসাহে ভরে গেল রামপ্রসাদের মন। তন্ত্রমতে এক শুভ তিথি দেখে নিষুতিরাতে এই আসনে বসে সাধনা শুরু করলেন।' পৃ. ২৮-২৯।

৩. সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস তন্ত্রের গ্রন্থাদিতে দশমহাবিদ্যা বাদে আরো যেসব দেবীদের নাম পাওয়া যায় তার বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। সংখ্যার নির্দিষ্টতা নেই, অগণিত। পৃ. ৪৬১-৪৬২।

৪. শবসাধনার বিবরণ নানান তন্ত্রে নানা তথ্য দিয়েছে। *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ* গ্রন্থে নানান তন্ত্রের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। শবসাধনার স্থান, শবের প্রকৃতি কী রকম হওয়া উচিত এবং কীভাবে এই সাধনা সম্পন্ন হবে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। পৃ. ৫৫৭-৫৫৮।

তথ্যসূত্র

১. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র *সাধক কবি রামপ্রসাদ*, ছোঁয়া, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২০ জানুয়ারি, পৃ. ৪৫০।

২. তদেব, পৃ. ৪০২।

৩. তদেব, পৃ. ৪০৪।

৪. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ১ম খণ্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৩১৮।

৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতচন্দ্র*, সূত্রধর, কলিকাতা, ২০২০, পৃ. ১৪।

৬. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪০৮।

৭. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*, প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৬৬।

৮. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪২৮।

৯. তদেব, পৃ. ৪২৭।

১০. তদেব, পৃ. ৪২৭।

১১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূ., *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্*, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৭, চতুর্থ উল্লাস, পৃ. ৪৩।

১২. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪২৭।

১৩. তদেব, পৃ. ৪৯১।

১৪. তদেব, পৃ. ৪৮৭।

১৫. উপেন্দ্রকুমার দাস, ঐ, পৃ. ৪৬৮।

১৬. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪৮৭।

১৭. পঞ্চানন শাস্ত্রিণা অনূ., রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য কৃত *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯২, পৃ. ৫৫৮।

১৮. তদেব, পৃ. ৫৫৮।

১৯. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪৪৫।

২০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৬৭।

২১. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪৮৯।

২২. তদেব, পৃ. ৪৯০।

২৩. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, *ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, পৃ. ১৭৭।

২৪. তদেব, পৃ. ২০০।

২৫. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪৪৮।

২৬. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন,১৭০০-১৭৫৭),* কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১১৭।

২৭. সুধীর চক্রবর্তী, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও উপসম্প্রদায়* ; অবন্তীকুমার সান্যাল, অশোক ভট্টাচার্য সম্পা., *চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান,* সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২২৯ ।

২৮. সনৎকুমার নস্কর ও দেবায়ন চৌধুরী সম্পা. , ঐ, পৃ. ৪৪৬।

২৯. তদেব, পৃ. ৪৩৭।

৩০. তদেব, পৃ. ৪৪২।

৩১. তদেব, পৃ. ৪৩৯।

৩২. তদেব, পৃ. ৪১৪।

৩৩. তদেব, পৃ. ৪৮৯।

৩৪. তদেব, পৃ. ৪০৭।

৩৫. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ঐ, পৃ. ৫৪।

গোসানীমঙ্গল

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে যেসব মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে উঠেছে তা প্রধানত অপ্রধান মঙ্গলকাব্যেরই অংশবিশেষ। এই মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনী বিশ্লেষণ বা ঘটনা পরম্পরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে,বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবিরা তাদের পৃষ্ঠপোষকের অনুমতিক্রমে কাহিনী পরম্পরাকে সংঘটিত করেছেন কিংবা সামাজিক-অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় ভাবানুষঙ্গে কাহিনীর কলেবর বর্ধিত করেছেন। কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ বা বিশেষ কোনো ঘটনার অনুষঙ্গ বহন সেক্ষেত্রে কাহিনীকে নব মর্যাদাও দান করতে পারে-এই আশঙ্কাও কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য-র মতে-'প্রধানত খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি স্থানীয় লৌকিক দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য থাকিলেও রচনার কোনোই মৌলিকতা ছিল না। এই শ্রেণীর একখানি মঙ্গলকাব্যের নাম গোসানীমঙ্গল।'[১]

যেকোন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পিছনে সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমভাগের একটি ভাগ নিয়ে কোচবিহার রাজ্যের সূচনা। বিভিন্ন বিবরণী বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায় যে,এই অঞ্চলটি কামরূপ রাজ্যের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ভাগের সংযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এই অঞ্চল বা এলাকা সর্বাধিক গুরুত্ব পায় যখন এখানে কামরূপের পশ্চিম অংশে খেন বংশের 'কামতা' নামের স্বাধীন রাজবংশের আরম্ভ হয়। কোচ রাজবংশের আগের রাজবংশ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে এখানে রাজত্ব করেন; কিন্তু ঐতিহাসিক মহলে এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এরও বহু পূর্বে খেন রাজবংশ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সমালোচক নৃপেন্দ্রনাথ পালের মতে-'খেন রাজবংশের সর্বশেষ শাসক নীলাম্বর 'কান্তেশ্বর' নামেও পরিচিত।ইনি একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তাঁর রাজ্যে এবং দুর্গ (কামতাপুর) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৮ খ্রি. অবরোধ জয় এবং ধ্বংস করেন। খেন রাজবংশের ধ্বংসাবশেষের উপর কামতাপুরের রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় ১৫১০ থেকে ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোচ রাজবংশের রাজত্বের শুভ সূচনা হয়।'[২] তবে খেন রাজবংশ ও কোচ রাজবংশের শাসকগণ প্রারম্ভিক সময়ে 'কামতেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করতেন। এর নিরিখে বলা যায় সেইসময়ে রাজবংশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কামতাপুর।

সময়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে গোসানীদেবী এবং তাঁর পীঠস্থান গোসানমারীকে কেন্দ্র করে *গোসানীমঙ্গল* কাব্য রচিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে কেন এই সময়ে এই কাব্য রচিত হল? মঙ্গলকাব্যগুলির রচনার সময় দেখলে দেখা যায়-ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী হল মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে ওঠার প্রশস্ত সময়। উনিশ শতকে এই কাব্য রচনার নেপথ্যে কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপট ছিল কিনা তাও বিচার্য বিষয়।

রাজা কান্তেশ্বরের আবির্ভাবের পূর্বে কামতাপুর তথা কোচবিহার রাজ্যের জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

আমানতউল্লা আহমদ খাঁ চৌধুরী *কোচবিহারের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড-তে বিস্তারিতভাবে সেইসময়কার অবস্থা বর্ণনা করেছেন-'সেইসময়ে পার্শ্ববর্তী মোগল অধিকারের তুলনায় কোচবিহারের অধিবাসী গণের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। বহিরাক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগে কোচবিহারবাসীগণ বিত্তহীন হইয়া পড়িয়াছিল, অধিকন্তু তাহাদের প্রাণেরও কোন মূল্য ছিল না।'[৩] রাজাবিহীন দেশের অবস্থা কেমন হওয়ার কথা তা সহজেই অনুমেয়। রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, অপশাসন ইত্যাদি ঘটনার কারণে বহু প্রজা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতাও সারা দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, দেবতার কাছে অভীষ্ট মঙ্গল প্রাপ্তির কামনায় দেবমাহাত্ম্যও বর্ণিত হয়েছে যথেচ্ছভাবে এবং সুকৌশলে। কাব্যে এর আভাসও আছে-

বেহারে নাহিক রাজা ব্যাকুল হইল প্রজা

অরাজক কত কাল ছিল।

হইল আকাশ বাণী, পূজা কর মা ভবানী

পুনঃ হবে রাজ্যের ঈশ্বর।[৪]

প্রথমে 'গোসানী' নামের বিশেষত্বটুকুর প্রতি লক্ষ করা যাক। 'গোসানী' শব্দটি স্থানীয় লৌকিক দেবীর নাম হিসাবে ধরা যেতে পারে। সমালোচক সুবোধরঞ্জন রায়ের মতে-'চট্টগ্রাম অঞ্চলে সব দেবদেবীমূর্তিকেই বলা হয় 'গোঁয়াই' (গোঁসাই)। চণ্ডী হলেন ঐ নামে উদ্দিষ্টা দেবী, তাই গোঁসাঞি+নী (স্ত্রী প্রত্যয়) ='গোসানী' হওয়া স্বাভাবিক।'[৫] কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন 'গোসানমারি' অঞ্চলের নাম থেকে অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডিকার নাম 'গোসানী দেবী'। সমালোচক চিত্রা দেব-এর মতে-'ভিন্নমতে,'গোসাইনী' থেকে গোসানী নামের উৎপত্তি। নামটি 'গোসাপিনী' থেকেও আসতে পারে। চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডী গোসাপের রূপ ধরে ভক্ত কালকেতুর কাছে ধরা দিয়েছিলেন, তাই গোসাপিনী থেকে গোসানী হওয়া বিচিত্র নয়।'[৬] দেবী চণ্ডীরই মাহাত্ম্য কীর্তন কবি করেছেন, সুতরাং এ ধারণাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, খেন রাজারা 'কামতেশ্বর' উপাধি ব্যবহার করতেন। 'কামতেশ্বর' উপাধিটির সাথে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। সমালোচক শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মতে-'কামতেশ্বর শব্দটি কামদেশ্বর শব্দ থেকে এসেছে এবং সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে কামতেশ্বর বা কান্তেশ্বর।*কালিকাপুরাণ*-এ কামদা হলেন কামাখ্যা। যিনি কাম দেন তিনিই কামদা এবং এই আখ্যা দিয়ে যে মাতৃদেবীকে পূজা করা হয় তিনি দেবী কামাখ্যা। এই মাতৃকাদেবীর প্রতীক হল

পৃথিবীর আদিম প্রতীক যোনী; *কালিকা পুরাণে* এই অঞ্চলে যে নয়টি যোনীপীঠের উল্লেখ আছে সিদ্ধপীঠ বা সিদ্ধেশ্বরী এবং কামপীঠ বা কামতেশ্বরী তার অন্যতম।'[৭] 'কামাখ্যা যোনিরূপা মহাবিদ্যা' তন্ত্রেও এর স্বীকৃতি আছে-

[যোনিরূপায়াঃ কামাখ্যাদেব্যাঃ স্বরূপম্]
ওঁ নমঃ কালিকায়ৈ। শ্রীকামাখ্যা জয়তি।।[৮]

এবং তন্ত্রে এও বলা হয়-'কামাখ্যা যোনিমণ্ডল দেবীক্ষেত্র অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ফলপ্রদায়ক। ঐ যোনিমণ্ডলে মহামায়া স্বয়ং অবস্থান করেন.ইহা ধ্রুব সত্য।'[৯] মধ্যযুগে কামতাপুর প্রসিদ্ধ থাকলেও রাজনৈতিক মর্যাদার দিন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয় এবং বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারতার জন্য তান্ত্রিক ধর্মের আসন নষ্ট হলে কামতেশ্বরী ফিরে এসে পরিণতি নেন গোঁসাঞী দেবী রূপে এবং এই দেবীর থান রূপে কামতাপুরের নাম হয় গোসানীমারী।

তৃতীয়ত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও 'গোসানী' শব্দটি মাতা অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের অপর শাখা *মনসামঙ্গল* কাব্যধারার কবি নারায়ণদেব-এর *পদ্মাপুরাণ*-এ 'গোসানী' শব্দটির উল্লেখ পাই। তিনি এখানে মাতা অর্থেই ব্যবহার করেছেন-

সাসুড়ির স্থানে গিয়া মাগিল মেলানি।
মায়ের অধিক তুমি সাসুড়ি গোসানি।।[১০]

কাব্যে চণ্ডীর অভিন্না রূপকেই 'গোসানী' নামের সমার্থক রূপে বলা হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভে 'মঙ্গলাচরণ' অংশে বলা হয়েছে-

গোসানী করহ পূজা, সুখে রবে যত প্রজা
রাজা হবে নাম কান্তেশ্বর।।[১১]

অর্থাৎ কাব্যের আরাধ্যা দেবী যেখানে গোসানী,সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন রূপে দেবীর নাম উচ্চারিত হয়েছে। দেবীর মহিমা কীর্তনে অনিবার্যভাবেই এসেছে দেবী চণ্ডীর নাম-

স্বামী মুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ।।[১২]

এবারে কাহিনীর আলোচনায় আসা যাক। খেন রাজাদের পতন ঘটে ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। এঁদের পরেই আগমন কোচ রাজবংশের ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনজন খেন রাজাকে ঘিরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তি পুরাকালে গড়ে উঠেছিল।

প্রথম রাজা নীলধ্বজ, ইনি পরিচিত ছিলেন 'কান্তনাথ' নামে। দ্বিতীয় রাজা চক্রধ্বজ ও তাঁর কবচ কাহিনী এবং তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের রানী ঘটিত কাহিনীর করুণ পরিণতি ও রাজ্যলোপের কথাও কিংবদন্তী। কবি রাধাকান্ত দাস বৈরাগী ঐ তিনজন রাজার কাহিনীকে একত্র করে আরোপ করেছেন কাব্যের নায়ক কান্তেশ্বরের উপর এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যলোপের ঘটনা বিবৃত করেছেন। কাহিনীর শুরুতেই কাব্যের শিরোনামে সেটির উল্লেখ চোখে পড়ে-'গোসানী-মঙ্গল অর্থাৎ রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত।' কবি মঙ্গলকাব্যের আবরণটুকু মাত্র নিয়েছেন বাকি তিনি রাজবংশের কাহিনীরই নির্মাণ করেছেন। সমালোচক নির্মল দাসের মতে-'এই 'খেন' বংশীয় রাজারাই ছিলেন গোসানীচণ্ডীর উপাসক। এঁদের রাজ্যলাভ ও রাজ্যলোপ নিয়ে এ অঞ্চলে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল সেগুলি নিয়েই গোসানীমঙ্গলের কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে।'[১৩] কাব্যে দেবী ছলে বলে কৌশলে নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করেননি, তিনি তাঁর ভক্তের মাধ্যমে সবকিছু করিয়ে নিয়েছেন।

গোসানীমঙ্গল-এর কাহিনী অতীব সরল। প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন,পরে ভগদত্তের রাজ্যারম্ভ হয়। ভগদত্ত বংশ লুপ্ত হলে, কামতাপুরের নিকটস্থ জামবাড়ী গ্রামে মহাদেবের বরে কান্তেশ্বর নামে একটি বালক জন্মায়। তাঁর পিতার নাম ভক্তীশ্বর ও মাতার নাম অঙ্গনা। দরিদ্রের সন্তান কান্তেশ্বর প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের গরুর রাখাল ছিল কিন্তু তার কাজে মন ছিল না। একদা তার প্রভু কান্তেশ্বরের সন্ধানে গিয়ে দেখতে পান দুটি বিষধর সাপ ফণা বিস্তারিত করে ঘুমন্ত কান্তেশ্বরকে ছায়া প্রদান করছে। পরবর্তীকালে বালকের কাছ থেকে রাজগুরুর পদ পাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন ব্রাহ্মণ। রাজা হবার পূর্বে তার বাসস্থানের নিকটবর্তী 'কাজলীকুড়া' নামক জলাশয়ের তীরে গমন করতে এবং জলাশয় থেকে যেকোনো দ্রব্য হতে উত্থিত হলে সেগুলি স্পর্শ করার জন্য দেবী চণ্ডী কর্তৃক স্বপাদিষ্ট হন কিন্তু সে আদেশ অনুযায়ী কার্য করতে অসমর্থ হন। কুম্ভীর, মকর, সাপ দেখে সে ভীত হয়ে পড়ে। তার হাত একটি সাপের পুচ্ছদেশ স্পর্শ করায় মাত্র একপুরুষ বংশ স্থায়ী হবার কথা দেবী চণ্ডী তাকে বলে। দেবীর নির্দেশে বিশ্বকর্মা তাঁর জন্য সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। একরাত্রির মধ্যেই রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠল। পরদিন চণ্ডীর আদেশে কান্তনাথ রাজা হলেন। দেবীর স্বপাদেশে শশীপাত্র হলেন মন্ত্রী এবং বীরভদ্র কোটাল।

এবার রাজা ভাবতে বসলেন পাটরানী নিয়ে। দেবীর নির্দেশ মতো সুকাঞ্চনা, অকাঞ্চনা, সুশীলা, সুশীতলা, বনমালার সঙ্গে রাজার বিবাহ হল। আনন্দে রাজা সবসময় মত্ত, দুর্গানটীর বাড়ি গিয়ে সময় কাটান তার রূপ-মাধুর্যে খুশি হয়ে তার নামে নগরের নাম করেন 'দুর্গানগর'। রাজা এবার শিকারে যাবার জন্য উদ্দ্যোগী হলে জ্যোতিষী তাকে যেতে বারণ করলে কাজলীকুড়ায় মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হল। অনেক চেষ্টা করেও মাছ উঠল না, দেবীর নাম স্মরণ করে যদিও বা শোল মাছ উঠল তাও চিল এসে সে মাছ নিয়ে গেল। এই দেখে জালীপত্নী উপহাস করলে জালী ও জালীপত্নীর মধ্যে বিবাদ শুরু হল। শেষে কোটালের মাধ্যমে রাজার কাছে আনীত হলে জালিনী পূর্বকথা বলতে থাকে। এখানেই আসে দুটি উপকাহিনী। প্রথমটি শ্রীবৎস চিন্তার উপাখ্যান দ্বিতীয়টি ভগদত্তের কবচ কথা।রাজা ভগদত্ত কবচ সম্বন্ধে জানালে তা শীঘ্র উদ্ধারের ব্যবস্থা হয়। 'গোসানী' লেখা কবচটি একটি গাছের তলা থেকে

উদ্ধার হয়। রাজা গোসানীর মণ্ডপ স্থাপন করে চণ্ডালিনীর উপর তার দায়িত্ব দিয়ে তাকে দেউরীর কাজ দেন। কান্তেশ্বর এরপর মৃগয়ায় গেলে বনে শিবলিঙ্গ দেখেন এবং রাত্রে মহেশ্বরের স্বপাদেশে তিনি নানা জায়গায় শিবের নামে কোটেশ্বর, বাণেশ্বর, জল্পেশ্বর, বিদেশ্বর মন্দির স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে রাজার কনিষ্ঠ পত্নী বনমালা মন্ত্রীপুত্র মনোহরের সাথে অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে লিপ্ত থাকলে রাজা মনোহরকে বধ করে তার পিতা শশিশেখরকে সেই নিহত পুত্রের মাংস ভক্ষণ করান। রাজার এই অন্যায় আচরণে মন্ত্রী দিল্লির মোগলের স্মরণাপন্ন হন এবং তার সাহায্যে কান্তেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরবর্তীকালে কাজলীকুড়ায় স্নানকালে কান্তেশ্বর দেবী চন্ডীর কৃপায় অন্তর্হিত হন, নবাব মনে করেন তাকে কুমিরে খেয়েছে। শশিপাত্রও যবন সংসর্গে যবন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন রাজার অনুপস্থিতিতে দেশের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে, শেষে শিবের ঔরসজাত পুত্র বেহারের রাজা হয়। দেবী গোসানীর কৃপায় আবার শান্তি ফিরে আসে। এই হল *গোসানীমঙ্গল*-এর কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে অলৌকিকতার আভাস থাকলেও ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহেও এই ঘটনার সমর্থন মেলে। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরি-র *The Cooch Behar State*, আচার্য যদুনাথ সরকার-এর *The History of Bengal*, আমানতউল্লা আহমদ খাঁ চৌধুরী-র *কোচবিহারের ইতিহাস*, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *বাঙ্গালার ইতিহাস*-এ এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য *গোসানীমঙ্গল*-এ তন্ত্রের উপাদান খুব বেশি নেই। কিন্তু কিছু সূত্র বর্তমান। *যোগিনীতন্ত্র*-এর দ্বাদশ পটলে লিখিত আছে যে, কামাখ্যা সেবক নরকাসুর আচরণে বশিষ্ঠ ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন এবং তার ফলে কামাখ্যা দেবী নীলাচল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজার উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, নরকাসুরই বশিষ্ঠ শাপে 'কান্তেশ্বর' হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে যে, এই প্রকারে অনেক রাজা অতীত হলে বশিষ্ঠ ঋষির অভিশাপে পুনরায় নরক রাজা কামতাপুরে জন্মগ্রহণ করে 'কান্তেশ্বর' নামে রাজা হয়ে অনেক রাজ্য স্বাধীন করবে। *যোগিনীতন্ত্র*-এ উল্লেখিত হয়েছে-

বসিষ্ঠো ব্রক্ষণঃ পুত্রস্তারামারাধিতুং মুনিঃ।
মদযোনিমণ্ডলে নাথ দ্বারং মে সমুপাগতঃ।।
প্রাতস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণো মাং যজতে মানবেশ্বরঃ।
দ্বারপালোহভবদ্রাজা যাবন্মে পূজনং ভবেৎ।
তাবৎ কোহপি ন ক্ষমো হি গন্তুং মদযোনিমন্ডলম্।।
এবং নিত্যং নিয়মিতং নরকেণাসুরেণ চ।
ততস্তং বারয়ামাস নরকো ব্রক্ষনন্দনম্।।
ততস্তেনৈব মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।

-অর্থাৎ 'কামাখ্যা কহিলেন,হে নাথ ! ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ তারার আরাধনা করিবার জন্য আমার যোনিমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে মানবপ্রবর ব্রাহ্মণ যখন আমার পূজা করেন সেইসময় আমার যোনিমন্ডলে কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। যে পর্যন্ত আমার পূজা হয়, সেইপর্য্যন্ত রাজা নরকাসুর দ্বারপালরূপে অবস্থিত করেন।নরকাসুর এইরূপ নিত্যনিয়ম করিয়াছে। নরকাসুর সেই ক্রমাগত ব্রহ্ম নন্দন বশিষ্ঠকে বারণ করিয়াছিল, সেই হেতু সেই মুনি সুদারুণ অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন।'[১৪] *গোসানীমঙ্গল* কাব্যেও এর অনুরূপ ঘটনা দেখি। 'কান্তশ্বরের জন্ম' অংশে চণ্ডী পদ্মাকে ডেকে নির্দেশ দেন ও তাঁকে জানান-

কান্তনাথ প্রিয় ভক্ত মম দ্বারী ছিল।
শাপেতে হইয়া ভ্রষ্ট ভূমিতলে গেল।।
কিছুকাল রাজ্য ভোগি আসিবে কৈলাস।
এইত বৃত্তান্ত তার জানিবে নির্যাস।।[১৫]

তন্ত্রের এই কাহিনীর সাথে পরোক্ষ যোগ যে কাব্যে আছে তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া কয়েকটি জায়গায় বলিদান প্রসঙ্গ এসেছে। চণ্ডীর ক্ষেত্রে গোধা বলিদান মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রণীত *অভয়ামঙ্গল*-এ লক্ষণীয়। সেইরূপ গোসানী পূজার উপাচারে বলিদান প্রসঙ্গ এসেছে যা তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বহন করে। কাব্যে বর্ণিত-

চণ্ডীর মণ্ডপে রাজা আসি শীঘ্রগতি।
গলায় বসন দিয়া করে নানা স্তুতি।।
ছাগাদি মহিষ কাটি করিল পূজন।
হোম মহোৎসবে পূজা করে সমাপন।।[১৬]

তন্ত্রে লিখিত-

ছাগে দত্তে ভবেদ্ বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।

মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ মৃগে মোক্ষফলং ভবেৎ।।

-অর্থাৎ 'ছাগকে বলি দিলে বাগ্মী হয়,মেষকে বলি দিলে কবি হয়। মহিষকে বলি দিলে ধনবৃদ্ধি হয়। হরিণকে বলি দিলে মোক্ষফল লাভ হয়।'[১৭] এখানে রাজা কান্তেশ্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় বলিদান কার্য করেছেন, এর থেকে সহজেই বোঝা যায় রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্যে এই কাজ তিনি সমাধা করেছেন। এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে তন্ত্রের অনুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে কাব্যে। মঙ্গলকাব্যের ন্যায় স্বপাদেশ, দৈববাণী ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ যুক্ত উপাদান থাকলেও মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর ব্যাপকতা এখানে অনুপস্থিত।

কাব্যে সেইসময়কার সমাজচিত্রের ছবিও ফুটে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে কবি সেই আমলের যথাযোগ্য বর্ণাত্মক ছবি এঁকেছেন। কোচবিহার অঞ্চলের লোকসংস্কারকে কবি কাব্যমধ্যে পরিবেশন করেছেন, যেমন-কান্তেশ্বরের মায়ের মৃত্যুর পর সহজলভ্য আমকাঠে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় এবং ক্ষত্রিয়মতে পিণ্ডদান করা হয়। কান্তেশ্বরের প্রাসাদ নির্মাণের সময় সহজলভ্য শালখুঁটি ও বেতের 'ছাঁটিনী' দিয়ে খড়ের ঘর নির্মিত হয়।বিবাহ রীতিতে আঞ্চলিক প্রথার বৈশিষ্ট্য বহন করে, যেমন- গুয়াপান কাটা, সম্ভবত বিবাহে কন্যাপণ দেওয়ার ব্যাপারও ছিল। কাব্যে বর্ণিত-

পঞ্চ কন্যায় পঞ্চশত রত্ন দেহ মোরে।
এত শুনি কান্তেশ্বর হাসিতে লাগিল।
পঞ্চশত স্বর্ণ মুদ্রা ততক্ষণে দিল।।
এইরূপে সেই স্থানে লগ্ন-পত্র হ'ল।[১৮]

এছাড়া অধিবাসের সময় দই, চিনি, গুড়, মাছ পাঠাবার রীতি ছিল। কাব্যে কিছু লোকসংস্কারের ছবিও ফুটে উঠেছে, রাজার শিকারে যাবার আগে গণকের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ জ্যোতিষচর্চা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেইসময় আনন্দ-বিনোদনের ক্ষেত্রে নগরনটীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাও জানা যায়। রাজা কান্তেশ্বর দুর্গানটীর নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হয়ে তার নামে নগরও নির্মাণ করেছিলেন-

দুর্গাপুর বলি নাম তাহার হইল।।
দুর্গার নামেতে নাম হ'ল দুর্গাপুর।[১৯]

কবি রাজকাহিনীকেই অলৌকিকতার মোড়কে গ্রন্থিত করে মানব সমাজের প্রেম, ভালোবাসা, ষড়যন্ত্র, হিংসা সবকিছুর সাথে একাত্ম করে পরিবেশন করেছেন। সমালোচক স্মৃতিকণা চক্রবর্তী-র মতে-'*গোসানীমঙ্গল* এর কাহিনিতে *অন্নদামঙ্গল*-এর সামান্য ছায়াপাত ঘটলেও এ কাহিনি চণ্ডীমঙ্গলের আর এক উপধারার এক সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনি। মধ্যযুগের পরিসরে দেবতাকে প্রচ্ছন্নে রেখে নরনারীর প্রেমপ্রীতিমূলক সমস্যা নিয়ে কাব্যরচনা মঙ্গলকাব্যধারায় কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ছাড়া আর বিশেষ দেখা যায় না।'[২০] মঙ্গলকাব্যের মূলধারার থেকে পৃথক হয়ে অনন্য উপস্থাপনায় কবি যে কাব্য পাঠক সমাজে উপস্থাপন করেছেন তা তৎকালীন ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনন্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত।

তথ্যসূত্র

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪৮১।

২. নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল* ,অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৬।

৩. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, *কোচবিহারের ইতিহাস* , ১ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুর্নমুদ্রণ ২০১৫।

৪. নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল* , ঐ, পৃ.৭০।

৫. তদেব, পৃ. ৪৪।

৬. চিত্রা দেব, *কিংবদন্তীর কাব্য* ; নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল,* অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৭৯।

৭. শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *গোসানীমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক উপাদান;* নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল,* অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩৯।

৮. জ্যোতিলাল দাস ও সৌম্যানন্দ নাথ সম্পা., *কামাখ্যাতন্ত্রম্* ,নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১।

৯. তদেব, পৃ. ৮৫।

১০. তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পা., *নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ* , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুর্নমুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১০৬।

১১. নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল* , ঐ, পৃ. ৭০।

১২. তদেব, পৃ. ৭২।

১৩. তদেব,পৃ. ১৭৭।

১৪. স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সম্পা., *যোগিনীতন্ত্রম্* ,নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ১২৫-২৬।

১৫. নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল* ,অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা,২০১৬, পৃ. ৭৫।

১৬. তদেব, পৃ. ১০০।

১৭. পঞ্চানন শাস্ত্রী অনু., *মুণ্ডমালাতন্ত্রম্* ,নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২০।

১৮. নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল* , ঐ, পৃ. ১০২।

১৯. তদেব ,পৃ. ১০৫।

২০. স্মৃতিকণা চক্রবর্তী, *মঙ্গলকাব্য:পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* , বিদ্যা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪৩৩।

বাশুলীমঙ্গল

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র রচিত *বাশুলীমঙ্গল* বা *বিশাললোচনীর গীত* দ্বাদশ পালায় বিভক্ত। কবি মূলত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্যের আখ্যানভাগ গড়ে তুললেও লৌকিক ধুসদত্তের কাহিনীকেও কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুঁথিতে সাতটি পালায় মূল মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে অষ্ট মন্বন্তরকথা, সুরথ রাজার আখ্যান, মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রভৃতি উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। অবশিষ্ট আটটি পালায় বর্ধমানের ধুসদত্ত সদাগরের উপাখ্যান ব্যাখ্যাত হয়েছে। দেবী বিশালাক্ষী বা বাশুলীর পূজা প্রত্যাখ্যান করায় সদাগর ধুসদত্ত বাণিজ্য উপলক্ষে পাটনে গিয়ে দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকবার পর পুত্র গুণদত্ত কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় কাহিনীর সাথে ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মিল আছে। অতএব কাহিনীর একদিকে পুরাণের কাহিনী অপরদিকে লৌকিক কাহিনীর উপস্থিতিতে কবি আখ্যানভাগ সাজিয়েছেন।

এবার দেবী পরিকল্পনার দিকে লক্ষ করা যাক। এই কাব্যে দেবী বাশুলী বা বিশাললোচনী হিমালয় নন্দিনী উমা পার্বতী এবং *মার্কণ্ডেয়পুরাণ*-এর দেবতেজঃসম্ভূতা চণ্ডীর সাথে অভিন্না। গুণদত্ত দেবী বাশুলীর স্তুতি সম্পর্কে বলেছেন-

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শরদিন্দুমুখী জয়া চকোরনয়ানী।।
হরের ডমরু মাঝা মৃগত্রিলোকনী।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী।।[১]

রুক্মিণী চণ্ডী বাশুলীর স্তুতি করতে গিয়ে বলেছে-

দ্রুহিণী-গৃহিণী তুমি বচন দেবতা।
কমলানিলয় তুমি হরের বনিতা।।
পর্ব্বতনন্দিনী তুমি হরসহচরী।
কি বলিতে পারি আমি তোমার কিঙ্করী।।[২]

এই কাব্যে দেবী বাশুলী চণ্ডী চামুণ্ডা কালীর সাথে অভিন্না। ইনিই তন্ত্রের বিশালাক্ষীর সাথে তুলনীয়া। *তন্ত্রসার*-এ বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্র-

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাম্।
নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্।
মুণ্ডমালা-বলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।

সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ।

এবং ধ্যাত্বা মহাদেবীমুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ।।

-অর্থাৎ 'বিশালাক্ষী দেবী প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, দ্বিভুজা, কোপনস্বভাবা ও খড়্গখেটকধারিণী। ইনি নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা, রক্তবস্ত্রপরিধানা; সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় সুদৃশ্যা। বিশালাক্ষী দেবীর বদন প্রসন্ন, ইনি ত্রিনয়না; গলাতে মুণ্ডমালাবলী আছে। স্তনযুগল স্থূল ও উন্নত। ইনি শঘরূপশিরোপরি উপবিষ্টা, জটা ও মুকুটে সুশোভিতা। দেবী সাধকের শত্রু বিনাশ করিয়া অভীষ্ট বর প্রদান করেন এবং সর্ব্ববিষয়ে সৌভাগ্য ও সর্ব্বসম্পত্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাসম্ভব উপাচার দ্বারা সামান্য-পূজাপদ্ধতির প্রণালীতে মহাদেবীর পূজা করিবে।'[৩]

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ বা বৈষ্ণব সাহিত্যে দেবী বিশালাক্ষীকে 'যোগিনী' বা 'ডাকিনী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *পৌরাণিকা*-য় দেবী বিশালাক্ষী সম্পর্কে বলা হয়েছে-'৬৪ যোগিনীর অন্যতমা। ২,৪,৮ বা ১০ হাত; পদ্মপুরাণে অবস্থান বারাণসীতে; দেবী পুরাণে কামাখ্যাতে।'[৪] অনেক সমালোচকের মতে, বৌদ্ধ 'বজ্রধাতেশ্বরী' বা 'বজ্রেশ্বরী' থেকে বাশুলীর উৎপত্তি।দ্র.১ সমালোচক দেবব্রত নস্কর-এর মতে-'বাংলার বিশিষ্ট লোকদেবতা দেবী বিশালাক্ষি। প্রধানত জলপথে ঝড়ঝঞ্ঝা তরঙ্গ বিক্ষোভ হতে মাঝি-মাল্লা মৌলে-বাউলে ও বাণিজ্য যাত্রীদের ত্রাণকর্ত্রীরূপে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত। বর্তমানে জলপথে যাত্রার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দরিয়ার বিপদ কমেছে এবং বিশালাক্ষির মাহাত্ম্যও হ্রাস পেয়েছে।'[৫] কাব্যেও এর প্রতিফলন দেখা যায়, ধুসদত্ত পাটনে যাবার আগে দেবী পূজাকে অবজ্ঞা করেন সেই জন্য তাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কাব্যে বর্ণিত-

তোমার বাপের কথা অতি বিপরীত।
বাঘাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত।।
মহেশসেবক সাধু না পূজে ভগবতী।
বিধি বিড়ম্বিল তারে আচ্ছাদিল মতি।।[৬]

সেই কারণে গুণদত্ত ব্রাহ্মণ দিয়ে বাশুলীর পূজা করিয়েছে এবং নিজের অভীষ্ট কামনা জানিয়ে পাটনের পথে পা বাড়িয়েছে।

কবি কাব্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাশুলী দেবীকে যোগিনীর বেশে উপস্থিত করেছেন। কাব্যে 'চণ্ডীর যোগিনী বেশে আবির্ভাব ও রুক্মিণীর পুত্রলাভ' বা 'দেবীর যোগিনীরূপ ধারণ' অংশে কবি যোগিনী প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। *ভূতডামরতন্ত্র* থেকে কৃষ্ণানন্দের *তন্ত্রসার*-এ অষ্টযোগিনী পূজার ও যোগিনী সাধনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শিবানুচরদের যেমন ভূত, প্রেত ইত্যাদি বলা হয় তেমনি দেবীর সাঙ্গপাঙ্গদের ডাকিনী, যোগিনী বলা হয়।এখানে স্বয়ং দেবী বাশুলী যোগিনীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। *যোগিনীতন্ত্র*-এ যোগিনীদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে দেবী কালী দানবেশ্বরকে পরব্রহ্মের রূপ প্রদর্শনের জন্য নিজ দেহ থেকে কোটি কোটি যোগিনীদের উৎপন্ন করেন এবং তাদের সূর্যসম দীপ্তি চারিদিকে প্রকাশিত হতে লাগল।

'মহারাবৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু যতো ঘোরপরাক্রমৈঃ।

রশ্মিবৃন্দসমুদ্ভূতা যোগিন্যঃ কোটিকাটিশঃ।।

সমন্তাদ্ ঘোররূপস্থা মহাযুদ্ধবমহোৎসুকাঃ।

প্রতিলোমকূপমধ্যে ব্রহ্মান্ডং কোটিকাটিশঃ।

ভাসন্তে সততং দেবি সর্ব্বাঃ সূর্য্যময়াঃ পুনঃ।।'[৭]

এঁরা দেবীরই অঙ্গ এবং দেবীরূপেরই নানা রূপান্তরমাত্র। প্রয়োজন সাপেক্ষে দেবীর সঙ্গিনী রূপে এঁরা বিরাজ করেন।*বাশুলীমঙ্গল* কাব্যেও গুণদত্তকে বাঁচাতে দেবী এই রূপ ধারণ করেছেন। এমনকি বাংলার সুপ্রাচীন 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা'-তেও দেবী চণ্ডীর প্রসঙ্গে যোগিনীর বিষয় অবতারণা করা হয়েছে-

নমঃ বন্ধু নমঃবন্ধু নমঃ বন্ধু নমঃ নারায়ণী।
তারিণী ভৈরবী মায়ের সিদ্ধের যোগিনী।।
সংসারের সার মায়ের ঈশের ঝিয়ারী।
ভক্তকে বুঝতে মা হলেন দিগম্বরী।।
হনি হনি দৈত্য মারি রুধির খাপর ধরি।
চৌষট্টি যোগিনী নিয়ে নাচেন মা মহেশ্বরী।।[৮]

সমালোচক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে-'চৌষট্টি যোগিনীগণের তালিকার মধ্যে বিশালাক্ষীর উল্লেখ দেখা যায় কালীর সহচরীরূপে। আলোচ্য বিশালাক্ষী 'যোগিনী' 'ডাকিনী' হতে পারেন কিন্তু কালী বা চণ্ডীর মহাসমরকালীন রক্তপিপাসু সহচরী নন।'[৯] দেবী প্রয়োজন বিশেষে যে এই রূপ ধারণ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবার স্থানবিশেষে কবি মুকুন্দ মিশ্র দেবী বাশুলীকে দেবী ত্রিপুরার সাথে অভিন্ন করে তুলেছেন। কাব্যের বহুস্থানে এর উল্লেখ আছে-

ত্রিগুণজননী দেবী ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরা।।
জয় জয় শব্দ করে গগনবাসিনী।
দেবতেজোময়ী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।।[১০]

তন্ত্রসার-এ উদ্ধৃত মন্ত্রে দেবী রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা, পাশ ও অংকুশধারিণী, রক্তবসনা, ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিতা। ত্রিপুরা দেবীর এই বিবরণগুলিতে যে ব্রহ্মাণী সরস্বতী ও কালীর মিশ্রণ ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। ত্রিমূর্তিতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন বলে তিনি বেদরূপা এবং প্রলয়ে ত্রিলোক পূরণ করেন বলে দেবীর নাম ত্রিপুরা। তন্ত্রসাধনায় ত্রিপুরা দেবীর স্থান অতি উচ্চে। এমনকি কামাখ্যা দেবী ও 'ত্রিপুরা' নামেও পরিচিতা-'ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী।'[১১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবি *বাশুলীমঙ্গল* কাব্যে দেবী বাশুলীকে 'রংকিণী' বলেও উল্লেখ করেছেন-

গলে নরশিরোমালা   শিরে শোভে শশিকলা
প্রেতাসনে রঙ্কিণী বাশুলী।[১২]

সমালোচক দেবব্রত নস্কর-এর মতে-'রঙ্কিণী শব্দের অভিধানিক অর্থ রনোন্মাদিনী। রণপ্রিয়া দেবী কালীকা ও দেবীদুর্গা প্রকৃত অর্থে রঙ্কিণী বা রণকিণী।'[১৩] সাধারণত দেবী রঙ্কিণী গ্রাম্য অঞ্চলে পূজিতা হন। কবি মুকুন্দ মিশ্র এখানে দেবী দুর্গার বিশিষ্ট রূপ বোঝাতে এই নাম ব্যবহার করেছেন।দ্র.২

এবার প্রথম পর্বে পৌরাণিক কাহিনীর দিকে লক্ষ করা যাক। কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র কবি মূলত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীর মাধ্যমে দেবী চণ্ডীর একটি রূপকে পরিদৃশ্যমান করতে চেয়েছেন। কাব্যে 'মেধস-সুরথ-সংবাদ' অংশের পর মহামুনি মেধস রাজা সুরথকে 'মহামায়ার উপাখ্যান'-এ বলেছেন-

কারে ভাল মন্দ করে কারে করে দয়া।
জ্ঞানী জনেরে মোহ দেই মহামায়া।।
মহামায়া রূপে বিরাজিল চরাচর।
যাহার কৃপায় মুক্তি পায় দেব নর।
জগতপালন হেতু নির্ব্বাণ কারণ।
সকল পরমবিদ্যা সেই ত্রিভুবন।।[১৪]

তন্ত্রেও এই আখ্যান বলা হয়েছে-

মেধসোক্তং বলবতী মহামায়া গদাভৃতঃ।
তয়া সংমোহ্যতে বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।।

-অর্থাৎ 'মহারাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহামুনি মেধস বললেন---ভগবদ্বিষ্ণুর মহামায়া অত্যন্ত বলবতী। সেই মহামায়াই জগতের সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তিনিই এই বিশ্বের সৃজনকারিনী, পালনকর্ত্রী এবং ধ্বংসকারিনী।।'[১৫]

পুরাণের আশ্রয় যেমন তিনি নিয়েছেন তেমনি লৌকিক কাহিনীর সমন্বয়ও ঘটাতে চেয়েছেন। কাব্যে বর্ণিত-

মহামায়া বঞ্চিল অসুর দুই বল।
কাটিয় আমার মাথা যথা নাহি জল।।
এই বচন সত্য অন্যথা না করি।
মিলিলা দুই ভাই যথা দেব শ্রীহরি।।
সুদর্শন কমল ধরিয়া শঙ্খ গদা।
জঘনে কাটিল মধু কৈটভের মাথা।।[১৬]

সমালোচক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-র মতে- 'দুর্গা দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি থেকে আবির্ভূতা ব'লে তিনি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী শক্তিরূপিণী,----মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী-শ্রীশ্রীচণ্ডী। দুর্গার অপর একটি নাম 'নারায়ণী', অর্থাৎ শেষনাগ,-শয়নশায়ী নারায়ণের অংশ যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া আদ্যাশক্তি।'[১৭] কাব্যের প্রথম আখ্যানভাগে পৌরাণিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে,তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তন্ত্রের যোগ লক্ষণীয়। কাব্যের 'মধুকৈটভ বধ' অংশে তন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। *লক্ষ্মীতন্ত্র*-এ বলা হয়েছে-

যোগনিদ্রা হরেরুক্তা যা সা দেবী দুরত্যয়া।
মহাকাল্যাস্তানং বিদ্ধি তাং মাং দেবীং সনাতনীম্।।
মধুকৈটভনাশার্থং মোহিতৌ চ তদা তয়া।
জঘ্নাতে বরলোভেন দেবদেবেন বিষ্ণুনা।
এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।
স্তত্যা বশীকৃতা কুর্যাৎ দিশঃ স্তোতুশ্চরাচরম্।।

-অর্থাৎ 'যিনি হরির যোগনিদ্রা, তিনিই দুরধিগম্যা দেবী। তাঁহাকে মহাকালী-রূপা এবং আমাকে সনাতনী দেবী বলিয়া জানিবে। দেবী কর্তৃক মোহিত হইয়া মধু ও কৈটভ বিষ্ণুকে বর দেন। সেই বরলাভ করিয়া দেবদেব বিষ্ণু অসুরদ্বয়কে নাশ করেন। ইনিই দুরতিক্রমণীয়া মহাকালী। ব্রহ্মার স্তবের দ্বারা ইনি সহজে পরিতুষ্টা হন। উক্ত স্তোত্রপাঠে চরাচর ও দশ দিক বশীভূত হয়।'[১৮]

দ্বিতীয় আরেকটি অংশে 'মহিষাসুর বধ' অংশেও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। কাব্যে মহিষাসুর বধের প্রসঙ্গ আছে। কাব্যে মহিষাসুর বধে চণ্ডীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

ত্রিগুণজননী দেবী ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরা।
জয় জয় শব্দ করে গগনবাসিনী।
দেবতেজোময়ী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।।
দেখিয়া হরিষ হইল যত দেব গণ।
দুর্জ্জয় মহিষাসুর ভয়াকুল মন।।[১৯]

বৈকৃতিরহস্যতন্ত্র অনুসারে দক্ষিণাধঃকরক্রমে অক্ষমালা, কমল, বাণ, অসি, কুলিশ, গদা, চক্র, শূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম, চাপ, সুরাপাত্র, কমণ্ডুলু- এই ১৮ টি আয়ুধ সর্বদেবময়ী মহালক্ষ্মীর অষ্টাদশ হস্তে শোভিত। *লক্ষ্মীতন্ত্র*-এ লক্ষ্মীদেবী বলেন-

মহালক্ষ্মীরহং শক্র পুনঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
হিতায় সর্বদেবানাং জাতা মহিষর্দিনী।।
মদীয়া শক্তিলেশা যে তত্র দেবশ রীরগাঃ।
ধৃত ময়া তৈঃ সম্ভূতৈঃ রূপং পরমশোভনম্।।
আয়ুধানি চ দেবানাং যানি যানি সুরেশ্বর।
মচ্ছক্তয়স্তদাকারাণ্যায়ুধানি মমাভবন্।।

-অর্থাৎ 'হে ইন্দ্র, আমি মহালক্ষ্মী। আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সকল দেবতার মঙ্গলের জন্য মহিষর্দিনীরূপে পুনরায় আবির্ভূতা হয়েছিলাম। দেবশরীরস্থিত আমারই শক্তিকণাসমূহ হতে সম্ভূত পরমশোভন রূপ আমি ধারণ করেছিলাম। হে সুরেশ্বর, দেবগণের যে সকল আয়ুধ আছে সেগুলি আমারই শক্তির অংশ। আমার আয়ুধসমূহও দেবায়ুধের আকারসদৃশ হইয়াছিল।'[২০]

কাব্যের প্রথম অংশে চণ্ড-মুণদ বধ, রক্তবীজ নিধন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি কাহিনীতেও পৌরাণিকতার পাশাপাশি তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। কবি কাব্যে এই বিষয়গুলির বর্ণনা দিয়ে গেছেন, দেবতারা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চণ্ডীস্তুতি করেছেন, কাব্যে বর্ণিত-

আপুনি নাশিবে যত অসুরের পুরী।।
নমো দেবি ভগবতি জয় বিষ্ণুমায়া।
দানব নাশিয়া কর দেবতারে দয়া।।[২১]

এবং চণ্ডীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে কাব্যে বলা হয়েছে-

তনুকোষে জনমিলা দ্বিতীয় রূপিণী।
কৌষিকী বলিয়া স্তুতি করে দেব মুনি।।
প্রথম শরীর তাঁর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
কালিকারূপিণী হিমালয় কৈল স্থান।।
কৌতুকে নিবসে মধুমতী হিমাচলে।
জয় জগত্রয়ী মোহন রূপ ধরে।।[২২]

প্রথমে 'জগত্রয়ী মোহন রূপ' ধারণ তারপর যুদ্ধের সময় কখনো 'সিংহবাহিনী', কখনো 'কালিকা' রূপে দৈত্যবধে দেবী অবতীর্ণা হন। কাব্যে বর্ণিত-

সহস্র লোচনে চাহে চড়ি ঐরাবতে।
বজ্র পেলিয়া কথো মহাসুর বধে।।
অবশেষে আছিল যতেক দৈত্যগণে।
ভক্ষিল কালিকা শিবদূতী পঞ্চাননে।।
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী।।[২৩]

কিন্তু কাহিনীর সূত্রে তন্ত্রের সূক্ষ্ম যোগ দৃশ্যমান। তন্ত্রে বর্ণিত-

কালিকা শিবদূতী চামুণ্ডা মূর্ত্তিধরা পরা।।
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা ধূম্রনেত্রং নিপাতিতম্।

চণ্ডং মুণ্ডং রক্তবীজং রক্তবিন্দুসমুদ্ভবম্।।
কন্ ব্বম্বয়ং কোটিবীর্য্যং কালকেয়ঞ্চ কালকম্।
ধৌম্রং মৌর্যং দৌহৃদঞ্চ ষড়শীতিসহস্রকম্।।
কালকেয়াদি সৈন্যঞ্চ সর্বং নায়কভূষিতম্।
পুনঃ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দৈত্যরাজং জঘান সা।।

-অর্থাৎ ‘কৈলাসে অবস্থিত দৈত্যনিপীড়িত দেবগণ কর্তৃক স্তুতা হয়ে সেই পরাদেবী মহামায়া তামসী কালিকা, শিবদূতী, চামুণ্ডা প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করে সুগ্রীবের বাক্য শুনে ধূম্রনেত্র নামক অসুরকে বধ করলেন।তারপর সে তামসী দেবী---চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবিন্দুজাত রক্তবীজ, কোটিবীর্য্য, কলকেয় কীলক, ধৌম্র, দৌহৃদয়,তাদের নায়কীভূত প্রভৃতি দৈত্য সেনাপতিদের নিধন করে পুনরায় শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যরাজকে নিহত করলেন।’[২৪]

বাশুলীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয়ভাগে ধুসদত্তের লৌকিক কাহিনী সন্নিবেশিত করেছেন মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ইন্দ্রের রাজসভায় তালভঙ্গের অপরাধে মোহিনী নর্তকীকে মর্ত্যকুলে জন্মাতে হয়। মর্ত্যে কনকার গর্ভে জন্ম নিয়ে তার নাম হয় রুক্মিণী। স্বাভাবিক ক্রমেই ধুসদত্তের সাথে তার বিবাহ হয়। ধুসদত্তের সংসারে সত্যবতী ও রুক্মিণী দুই স্ত্রী সহযোগে সংসার চলতে থাকে। পরবর্তীকালে ধুসদত্ত বাণিজ্যে যাবার সময় দেবী বাশুলীর ঘট উপেক্ষা করলে তাকে দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। ধুসদত্তের পুত্র গুণদত্ত জন্মালে সে পিতার উদ্ধারকার্য সমাধা করে দেবী বাশুলীর পূজা প্রচার করে-এই হল আখ্যান; এছাড়াও বিস্তৃতভাবে আরো অনেক কিছু ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু দেবীর পূজা প্রচার করাই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য।

কাব্যের দ্বিতীয় অংশে সেই সময়কার সমাজচিত্রও ফুটে উঠেছে। স্ত্রী সত্যবতী থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রন্ধনের ছুতোয় পুনরায় বিবাহ করা একটি পুরুষের পক্ষে যতটা আনন্দের, একটি মেয়ের কাছে ততটাই হৃদয়পীড়ার কারণ, সেইজন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করেছে-

প্রাণনাথ সতিনী না দিহ তুমি।
বিভা কর দূর শুন হে ঠকুর
নিবেদিল তোহে আমি।[২৫]

এমনকি সে সইয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতেও ছুটে গেছে, কারণ সতীন সমস্যার মতো কষ্টকর জীবন আর নেই। স্বামী মন্দ হোক আপত্তি নেই, কিন্তু সতীন যেন না জোটে। বাংলার প্রাচীন ব্রতকথায়ও সেই একই চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়, 'সেঁজোতি ব্রত'-এ উল্লেখিত-

ময়না ময়না ময়না।
সতীন যেন হয় না।।
হাতা হাতা হাতা।
খাই সতীনের মাথা।।
বেড়ি বেড়ি বেড়ি।
সতীন মাগী টেরী।।
পাখী পাখী পাখী।
সতীন মাগী মর্ত্তে যাচ্চে
ছাদে উঠে দেখি।।[২৬]

এখানে দেখা যাচ্ছে সতীনের মৃত্যু কামনার ক্ষেত্রেও আরেক স্ত্রী পিছপা হচ্ছে না,কাব্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়-সত্যবতী কপট পত্ররচনা করে রুক্মিণীকে পীড়ন করছে। কাব্যে রুক্মিণী দেবী বাশুলীর কৃপায় রক্ষা পেলেও সেই যুগে সতীনের প্রতি সতীনের অত্যাচার সমাজের এক বিষময় ফল। কাব্যে বর্ণিত-

দুই গালে মারি দুই মুঠকি।
কারে গালি দেই আই ভাইখাকী।।
গালে হাত দিয়া রহিল পানি।
বলে মর তোরা দুই সতিনী।।
সাধুর ঘরে মারামারি শুনি।
রড়ে আইল যত প্রতিবাসিনী।। [২৭]

এ অবস্থা শুধুমাত্র ধুসদত্তের পরিবারের নয়, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই একই সমস্যা। এছাড়াও স্বামীর প্রতি খেদ নারীর জীবনে একটি বড় অপ্রাপ্তির কারণ। সেই সময়ে নারী স্বাধীনতা, তাদের চাহিদার কোনো কিছুরই মূল্য দেওয়া হত না, নির্দিষ্ট বয়স হলেই তার বিবাহ হয়ে যেত। কাব্যে ঘটক ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর বারো বছর হওয়া সত্ত্বেও তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন না করায় ব্যঙ্গ করেছে-

এ হেন যুবতী ঘরে   চমকিত নাহি তোরে
কেন মতে পাইয়াছ প্রসন্ন।।
নিকলঙ্ক তুমি সাধু   তোর ঘরে কোন হেতু
হেন কন্যা আছে অবস্থিতা।
করিয়া এ সব কাজ   বণিকে আনিল লাজ
বিভাকার্য্য না কর তুরিতা।।[২৮]

এমতাবস্থায় নারীদের জীবন কৈশোর উত্তীর্ণ না হতে হতেই তাকে ঠেলে দেওয়া হত সংসারে, সংসারে থাকাকালীন তাদের জীবনের অপ্রাপ্তিই তাদের মুখে ফুটে উঠেছে-

আর রামা হাস্যা বলে তুমি তবু ভাল।
ছয় বুড়ির তৈল আনি এক গোদে গেল।।
আর রামা বলে দিদি শুন গো বল্লভা।
জীয়ন্ত ভাতারে আমি হইলাঙ বিধবা।।
চারি পণ পোস্ত খায় গায়ে নাহি বল।
যুগল করের খাড়ু বেচিল সকল।।[২৯]

কিন্তু এ সত্ত্বেও কাব্যে কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

নিজ পতিনিন্দা করে যত দুষ্ট জন।
সুমতি রহিয়া তবে বলিল বচন।।
শুন লো দুর্ম্মতি রামা ছাড় দুরাচার।
পতির নিন্দন নহে স্বধর্ম্ম বিচার।।[৩০]

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এর থেকে সহজেই বোঝা যায়। কাব্যের কিছু কিছু অংশে লোকাচার ও লোকসংস্কার পরিলক্ষিত হয়, যেমন- 'রুক্মিণীর যৌবনসমাগমে উৎসব' অংশে মেয়েদের ক্রিয়াকর্ম দেখা যায়। 'সাধুর পাটনযাত্রা' অংশে যাত্রা সম্পর্কিত সংস্কার উঠে এসেছে-

আওয়াস তেজিয়া সাধু দেখিল শকুনী।।
মুক্ত চিকুরে ধায় পরি কৃষ্ণপট।
বেদীর নিকটে গিয়া দেখে শূন্য ঘট।।
অশুভ দেখিয়া সাধু ভাবিল মানসে।[৩১]

অর্থাৎ লোকসংস্কার অনুযায়ী বলাই হয় শূন্য কলস, শকুনের অনাবশ্যক অবস্থিতি যাত্রায় অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে। আবার গুণদত্ত যখন পাটনে যাচ্ছে তখন অবস্থাটা এইরূপ-

দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন।
আনিল ধবল পুষ্প মালির নন্দন।।
পল্লবিত তরুবর দেখিল সমুখে।
অনুকূল পবন কোকিলী বামে ডাকে।।
আনন্দিত হইল যত সাধবের পুরী।
দক্ষিণে থাকিয়া বামে চলিল শৃগালী।।[৩২]

লোকসংস্কার অনুযায়ী বলা হয়-

ডাইনে ফনী, বামে শিয়ালী,
দহিলে দহিলে বলে গোয়ালী
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি।[৩৩]

এখানে গুণদত্তের যাত্রাকালে বামে শিয়ালের অবস্থান, গোয়ালিনীর দই বিক্রি করতে যাওয়া এবং ধবল পুষ্পের ইঙ্গিত সবকিছুই শুভ যাত্রার ভাবকেই ফুটিয়ে তোলে। কবি এখানে কাহিনীর অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যই এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা সহজেই বোঝা যায়।

সমাজে যতই ক্রিয়াকলাপ মেয়েদের থাকুক না কেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের পরিচয়ই বড়। তাই গুণদত্তকে তার পিতার পরিচয় তার গুরু জানতে চাইলে সে বলতে না পারলে তাকে 'জারজ' বলে অভিহিত করে। এখানে আরো একটি ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, সেটি হল যদি গুণদত্তকে পিতৃপরিচয় জিজ্ঞেস না করত তাহলে কি সে পিতার অনুসন্ধানে দূরদেশে পাড়ি দিত ? অর্থাৎ কাহিনীর অগ্রগতির জন্য কবি এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'মায়াদহে আশ্চর্য্য দর্শন' অংশে ধুসদত্ত দেবীশক্তির নানা রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। পরবর্তী অংশে তার পুত্র গুণদত্ত এই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কবি মুকুন্দ মিশ্র বাশুলী দেবীকে 'রঙ্কিণী', 'চন্ডী', 'ত্রিপুরাসুন্দরী', 'নারায়ণী' এমনকি 'পার্বতী'ও বলেছেন। কবির মতে দেবী বাশুলী ও দুর্গা অভিন্না। নাম আলাদা হতে পারে কিন্তু রূপের স্বরূপে তাঁরা অভিন্না। কবি বর্ণনা এইরকম-

শঙ্খিণী শূলিনী রঙ্কিণী রঙ্গিণী
মানবমস্তকমালা।
তুমি মাহেশ্বরী বাশুলী খেচরী
দানবদলনী ভীমা।।
সিন্ধু জলদেবী লোকভয়ঙ্করী
নাসিকা দিঘল খর্ব্বা।
প্রচুরহাসিনী দেবতাজননী
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা।।
অচলনন্দিনী বিশাললোচনী
তুমি ত্রৈলোক্যমাতা।।[৩৪]

তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বে দেবী অভিন্না রূপের অধিকারী। তন্ত্রের ভাষায়-'...চণ্ড শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ প্রত্যয় করে চণ্ডী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছন্ন পরব্রহ্ম। অর্থাৎ চণ্ডী অর্থে পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি।'[৩৫] কবি এই ব্রহ্মশক্তিরই আরাধনা করেছেন, যিনি সৃষ্টিরহস্যের মূলে অধিষ্ঠিতা-

সত্ত্ব রজ তম গুণ ক্রমে ব্রতী তিন জন
বিধি নারায়ণ শূলপাণি।
ত্রিকাল শঙ্করী নিত্যা কৃপাণ তিমির বিদ্যা
সৃজন পালন সংহারিণী।।[৩৬]

আবার এটিও হতে পারে যেহেতু লোককাহিনী ও পৌরাণিক কাহিনীর সমন্বয়ে কবি কাব্যদেহ গড়ে তুলেছেন তাই সেক্ষেত্রে দেবী বিশালাক্ষীর লোকায়ত প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সমালোচক দেবব্রত নস্কর-এর মতে-'...ভারতবর্ষের বিভিন্ন নামে বিশালাক্ষীর পূজা হয়। রঙ্কিনী, বাসলী, দেবী নিত্যা, বাচ্ছলী, চণ্ডী, যোগিনী, ডাকিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, বিশালাক্ষী প্রভৃতি নামে তিনি পরিচিতা।'[৩৭]

কবি কাব্যে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কারকে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে নতুন চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাই *বাশুলীমঙ্গল* বা *বিশাললোচনীর গীত* গৌণ মঙ্গলকাব্যে হলেও মধ্যযুগের গূঢ় দলিল রূপে স্বীকৃত।

দ্রষ্টব্য

১. বৌদ্ধ দেবী বাগীশ্বরী ও দেবী বিশালাক্ষী এক হলে সমালোচক অর্জুনদেব সেনশর্মা-র মতে, '...বৌদ্ধতান্ত্রিকরা হিন্দুসমাজের কোঠায় ঢুকে বিশালাক্ষীকে হিন্দুসমাজে ঢুকিয়ে আনেন। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি তার প্রমাণ(*'বাসলীমঙ্গল' কাব্য অনুসারে আমাদের মতে বাসলী প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয়াবিদ্যা 'ত্রিপুরা'*)।'

-*হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ : আদি-মধ্যযুগ*, পৃ. ১১৪।

২. রঙ্কিণী দেবীর পূজা প্রসঙ্গে সমালোচক দেবব্রত নস্কর *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি* গ্রন্থে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখিয়েছেন- 'রঙ্কিণী পূজা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মহিষমর্দন সংস্কার পালন। মহিষমর্দন সংস্কারটি ধলভূমের সামন্ত রাজাদের তত্ত্বাবধানে পালিত হয়। প্রথমে দুটি মহিষ মন্দিরের সামনে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। তারপর ধলভূমের সামন্তরাজা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে প্রথমে মহিষদুটিকে আঘাত করেন। তারপর মহিষকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী যুবকেরা টাঙ্গি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা মহিষ দুটিকে আঘাত করে। সেই সঙ্গে বেজে ওঠে আদিবাসী বাদ্য যন্ত্র ঢাক, ঢোল, মাদল, শিঙ্গা, ধুমসা প্রভৃতি। শত আঘাতে মহিষ দুটি লুটিয়ে পড়লে রাজপুরোহিত তাদের মুণ্ডদুটি কেটে দেবীকে উৎসর্গ করেন।' এর থেকে বলা যায় দেবী রঙ্কিণীকে দেবী দুর্গার আরেকটি বিকল্প রূপ হিসাবে সমাজে পূজা করা হয়। কবি মুকুন্দ মিশ্র সেই রূপকেই কাব্যে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা., *কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলীমঙ্গল* বা *বিশাললোচনীর গীত* , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৭।

২. তদেব, পৃ. ১০০।

৩. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ৩৯৯।

৪. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা,* ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮, পৃ. ১৯৯।

৫. দেবব্রত নস্কর, *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮,পৃ. ১২১।

৬. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৯।

৭. স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সম্পা., *যোগিনীতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৯১।

৮. শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় সম্পা., অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর *মেয়েলি ব্রত,* প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৯৯৭,পৃ. ২৮।

৯. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* দে'জ পাবলিশার্স,কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭, পৃ. ২৮।

১০. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৮।

১১. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা., *মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিতম্ কালিকাপুরাণম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পুর্নমুদ্রণ ১৪১৯।

১২. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪।

১৩. দেবব্রত নস্কর, *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি,* আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ১২৩।

১৪. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০।

১৫. স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব(গিরি),*শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ২৭।

১৬. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭।

১৭. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ২০৪।

১৮. স্বামী জ়গদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পা., *শ্রীশ্রীচন্ডী,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৪১৪, পৃ. ৮০।

১৯. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৮।

২০. স্বামী জ়গদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূ. ও সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮২।

২১. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮।

২২. তদেব, পৃ. ৩৯।

২৩. তদেব, পৃ. ৫৯।

২৪. স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব(গিরি), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১।

২৫. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭১।

২৬. শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় সম্পা.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮।

২৭. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮১।

২৮. তদেব, পৃ. ৬৯।

২৯. তদেব, পৃ. ৭৫।

৩০. তদেব, পৃ. ৭৫।

৩১. তদেব, পৃ. ১০০।

৩২. তদেব, পৃ. ১১৭।

৩৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ১৫০।

৩৪. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩।

৩৫. স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩।

৩৬. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু সিংহরায় সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৭।

৩৭. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪২।

শীতলামঙ্গল

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যেরধারা গুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে দেবী মনসা, চণ্ডী ভক্তের পূজা পাবার জন্য নানা রকম ক্রূর অভিসন্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, অনেক সময় প্রাণও নিয়েছেন নির্দ্বিধায়। সেই ধারায় দেবী শীতলা অন্যতম সংযোজন। দেব-দেবীদের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শীতলা মঙ্গলকাব্যধারার প্রধান শাখার মধ্যে অগ্রগণ্য নন। দেবী শীতলার উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে পুরাণ ও তন্ত্রের নানা গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা আছে। *স্কন্দপুরাণ* ও *পিচ্ছিলাতন্ত্র*-র মধ্যে দেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- শীতলা শ্বেতবর্ণা, গর্দভবাহিনী, দুই হস্তে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী দিয়ে অমৃতময় জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ শান্তি করছেন, তিনি দিগম্বরী, মস্তকে কুলা, সুবর্ণ মণিভূষিতা, ত্রিনেত্রা এবং বিস্ফোটকের কঠিন তাপ প্রশমনকারিণী। শীতলার ধ্যান-

শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসম্মার্জনীপূর্ণকুম্ভাং

মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়ং জলং তাপশান্তৈ ক্ষিপন্তীম্।

দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নিসূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং

বিস্ফোটাদুগ্রতাপ প্রশমনকারী শীতলা ত্বাং ভজামি।[১]

শীতলার আরেকটি ধ্যানমন্ত্র:

শূর্পালংকৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা।

বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা।।

দিগ্বাসামূরুহাসসুন্দরমুখীং সম্মার্জনীং দক্ষিণে।

পাণৌ তাং দধতীং ভবার্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবিণীম্।

-'মাথায় শূপ(কুলা) দেবগণের দ্বারা স্তুতা, বামহাতে কুম্ভ, মুখ মেঘসদৃশ গর্দভে আসীনা, দিগ্বাসা, হাস্যমুখী ভবদুঃখবিলাসিনী দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীধারিণী, সংসার দুঃখনাশিনীকে বন্দনা করি।'[২]

এখানে মন্ত্রের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে-'শূর্প' অর্থে কুলো। শূর্প বা কুলো দিয়ে দুটি কাজ করা হয়। প্রথমত কুলোর সাহায্যে ধান্যদি শস্য থেকে আগাছা আবর্জনাগুলি ঝাড়াই করে আসল বস্তুগুলিকে আহরণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে মাঙ্গল্যের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয় সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত শূর্প বা কুলো। শূর্পের এই উপযোগিতা বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শূর্পমৌলী শীতলার মাহাত্ম্যও দ্বিবিধ। আধি-ব্যাধি, শোক তাপ,

অকাল মৃত্যু-এগুলি আমাদের আবর্জনাস্বরূপ। দেবী শীতলা তদীয় মঙ্গল শূর্পে সেই আবর্জনারাশি দূরে অপসারিত আমাদিগকে দান করে শান্তি, অভয়, আরোগ্য ও দীর্ঘ পরমায়ু।[৩]

অন্যদিকে ‘সম্মার্জনী’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শোধনী। সকলে যে কার্যটি তুচ্ছতার কারণে সরিয়ে রাখে-দেবী তা স্বেচ্ছায় বরণ করে। সংসারের যেখানে যত অশুচি অমঙ্গল, আধি-ব্যাধি, আবর্জনা আছে, অতন্দ্রিতা দেবী নিরন্তর তা সম্মার্জনীর সাহায্যে কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। যা কিছু পাপ সব দূরে নিক্ষেপ পূর্বক মানুষকে কলুষ মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ জীবন ধারণের উপযোগী করে দিচ্ছেন। তাপ শান্তির জন্য অমৃতময় জলসিঞ্চনের সীমিত ক্ষেত্রেই শীতলার সম্মার্জনীর ব্যবহারের কথা ধ্যানমন্ত্রাদিতে উল্লেখিত হয়েছে। আর দেবী শীতলাকে দিগস্ত্রা বলা হয়েছে। ‘দিক্’-এর অর্থ শূন্যতাজ্ঞাপক। ‘দিগস্ত্রা’ অর্থে আবরণহীনা। আবার দিক্ শূন্যতাজ্ঞাপক হলেও আছে তার বিপুল বিস্তার। দেবী শীতলা প্রাকৃত দেবী নন, তিনি সর্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তিরই আরোগ্যময় প্রকাশ। তাই তিনি দিগস্ত্রা।

স্কন্দপুরাণ-এও শীতলার স্তবমন্ত্রেও বলা হয়েছে তিনি সর্বরোগহারিণী, *স্কন্দপুরাণ*-এর *শীতলাস্তোত্রম্* প্রসঙ্গে *স্তবকবচধ্যান-রত্নমালা*[৪]-তে একই বন্দনার কথা বলা হয়েছে:

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।

মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।।

অন্যান্য দেবীদের সাথে তুলনা করে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য-র বলেছেন-‘শীতলা নামে শীতলামৃতবাহিনী গঙ্গার শৈত্যের ইঙ্গিত বহন করে। সরস্বতী শুভ্রা, গঙ্গা শুভ্রা, ষষ্ঠী শুভ্রা-শীতলাও শুভ্রাবর্ণা। সরস্বতীর হাতে রত্নকুম্ভ, লক্ষ্মীরও রত্নঘট থাকে; শীতলার হাতে অমৃতকুম্ভ। লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর মতই শীতলা ও সরস্বতীর অংশরূপে আবির্ভূতা। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ধূমাবতীর হাতে থাকে শূর্প বা কুলো, শীতলার মস্তকে শূর্প।’[৫]

কামাক্ষ্যা-তন্ত্রমন্ত্র সার গ্রন্থে *শীতলা কবচ* -এ বলা হয়েছে-

ওঁ শ্রাং শ্রীং শ্রূং শ্রৈং শ্রৌং শ্রং শ্রঃ।
ওঁ খরস্থাং দিগম্বরাং বিকটনয়নাং তোয়স্থিতাং ভজামি স্বাহা, সাঙ্গস্থাং প্রচণ্ডরূপাং নমাম্যাত্মবিভূতয়ে শ্রীং শীতলায়ৈ নমঃ।। ইতি মন্ত্রং ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনয়া লেখিত্বা কবচং ধারয়েৎ। তেন বসন্তরোগাক্রমণ শঙ্কা ন স্যাৎ।।

-‘ওঁ শ্রাং শ্রীং ইত্যাদি হইতে শ্রীং শীতলায়ৈ নমঃ পর্যন্ত মন্ত্রটি ভূর্জ্জপত্রে গোরচনার দ্বারা লিখে কবচ ধারণ করলে বসন্তরোগের আক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না।’[৬] এটা সম্ভবত সেই সময়ের রচনা হতে

পারে, যে সময় বসন্ত রোগ নিয়ে রীতিমতো সাধারণ জনমানসে ভয় ছিল। তাই দেবীকে পূজার মাধ্যমে এই রোগের নিরসন সম্ভব এই বিশ্বাস থেকে এই মন্ত্রের উৎপত্তি বলা যেতে পারে। সমালোচক দেবব্রত নস্কর-এর মতে- 'প্রকৃত তাৎপর্যে বসন্ত রোগ ট্রপিক্যাল জোন তথা উষ্ণ অঞ্চলের ব্যাধি। বসন্তরোগের টীকা আবিষ্কারের পূর্বে এ রোগের চিকিৎসা বলে কিছুই ছিল না, ছিল কেবল ভয়াবহতা; বসন্ত মহামারীর রূপ নিলে গ্রামের মানুষ জীবজন্তু উজাড় হয়ে যেত। এ যেন যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড তথা যজ্ঞকুণ্ড। এর থেকে বাঁচার উপায় ছিল না। সান্ত্বনার উপকরণ ছিল শীতলার পাষাণ বা মৃণ্ময়মূর্তি, হরিনাম সংকীর্তন ও পালাগান।'[৭] কাব্যেও এর প্রতিফলন দেখা যায়-

শীতলার পুত্র আমি বসন্তঈশ্বর।।
আমার ঘটে পূজা কর না পাইবে দুখ।
অনেক তোর বাড়িবেক নানাজাতি সুখ।।[৮]

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শীতলার সাথে অন্যান্য দেবীদের মিল পাওয়া যায়। ধূমাবতীর স্বরূপ লক্ষ করলে দেখা যাবে শীতলা সাথে তাঁর মিল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মন্ত্র হল:

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
সূর্প হস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃত হস্তা বরান্বিতা।
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া।
বিরলদ্বিজা বিরলদন্তা।

-'ধূমাবতী দেবী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা ও দীর্ঘাঙ্গী। ইঁহার পরিহিত বস্ত্র মলিন, কেশকলাপ বিবর্ণ ও রুক্ষ; দন্তসকল বিরল ও স্তনযুগল লম্বিত। ইনি বিধবা-রূপধারিণী ও কাকধ্বজ রথে উপবিষ্টা আছেন। দেবীর নয়নযুগল রুক্ষ; ইনি সর্ব্বদা হস্ত কম্পিত করিতেছেন; ইঁহার এক হস্তে সূর্প ও অপর হস্তে বরমুদ্রা। ইঁহার নাসিকা বৃহৎ, প্রকৃতি ও নয়ন কুটিল। ইনি ক্ষুধা ও পিপাসাতে কাতরা, ভয়ঙ্করাকৃতি ও কলহতৎপরা। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।'[৯]

ধূমাবতী-র সাথে কিছুটা নীতিগতভাবে মিল আছে। নীতিগত মিল থাকার দরুন সমালোচকরা দেবী শীতলার সাথে তাঁকে মিল করে দেখতে চেয়েছেন। অন্যান্য জায়গায় যেমন *স্কন্দপুরাণ*-এর *আবন্ত্য খণ্ড*-এ দেবী শীতলাকে শুধু বিস্ফোটকনাশই নয়, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য থেকেও রক্ষা করেন শীতলা একথাও বলা হয়েছে :

উত্তরে তূ প্রবক্ষ্যামি মর্কটেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র তীর্থঞ্চ বিখ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্।।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্য ফলং লভেৎ।
বিস্ফোটানাং প্রশান্ত্যর্থং বালানাং চৈব কারণে।।
মাপেন মাপিতান্ কৃত্বা মসূরাংস্তত্র কুট্টয়েৎ।
শীতলায়াং প্রভাবেন বালাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।।
যে পশ্যতি নরা ভক্ত্যা শীতলাং দুরিতাপহাম্।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং দ্বিজোত্তম।।
ন চ রোগভয়ং তেষাং গ্রহপীড়া তথৈব চ।।

-'বিদ্যাধর তীর্থের উত্তর দিকভাগে মর্কটেশ্বর নামে এক তীর্থ আছে, ঐ তীর্থ বিখ্যাত এবং সর্ব্বকামপ্রদায়কম। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মানব গোশতদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। বালকদিগের বিস্ফোট নাশের জন্য মান দ্রব্য দ্বারা মাপিত করিয়া ঐস্থানে মসূর কুট্টন করিতে হয়! এরূপ করিলে শীতলা দেবীর প্রসাদে বালকগণ নিরাময় হয়। যে জন দুরিতাপহা শীতলাদেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহার কিছুমাত্র দারিদ্র্য, দুষ্কৃত, রোগভয় বা গ্রহপীড়া হয় না।'[১০]

ভবিষ্যপুরাণ-এ শীতলা পূজাবিধিতে নিরাকার ও সাকার দুরূপেই শীতলার্চনা স্বীকৃত। সেখানে শীতলা সর্পদেবী, দেবী মনসার মতোই বৈধব্যনাশিনী, সন্তান-সুখপ্রদায়িনী। *পিচ্ছিলাতন্ত্র* ছাড়াও *মুণ্ডমালাতন্ত্র* এবং *কলিদুঃখবিমোচনীতন্ত্র*-এ শীতলার পূজাবিধি আছে। *মুণ্ডমালাতন্ত্র*-এ ইনি কালীর অংশ।দ্র.১ *কলিদুঃখবিমোচনীতন্ত্র*-এ চণ্ডিকা ও শীতলা দেবী হিসাবে এক বন্ধনীভুক্ত। এই তন্ত্রে চৌষট্টিরকম বসন্তের পূজাবিধি আছে। শীতলার সহচর ও অনুচর হিসাবে চর্ম রোগদেবতা ঘণ্টাকর্ণ, জ্বরাসুর, রক্তাবতী শিশুরক্ষক দেবতা পঞ্চানন ও রাসভের ধ্যানমন্ত্র রয়েছে। *পিচ্ছিলাতন্ত্র*-এ শুধু ঘণ্টাকর্ণের ধ্যান ও শীতলানুচর রাসভের পূজাবিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সমালোচক দেবী শীতলার সঙ্গে বৌদ্ধ দেবী হারীতী দ্র.২ ও দেবী পর্ণশবরী-র দ্র.৩ মধ্যে মিল খুঁজে পান। দেবী হারীতী সন্তানদাত্রী ও শিশুমারী নিবারণের দেবী। দেবী পর্ণশবরীও মহামারি নিবারণ করেন। এজন্যই দেবী শীতলার সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

একটি বিষয় পরিষ্কার দেবী শীতলা প্রাচীন গ্রামবাংলায়-এর ভিত্তিভূমি থাকলেও তন্ত্রের অনুষঙ্গে পূজাবিধি বা তার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা বহু পূর্ব থেকেই তন্ত্রের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখিত। পুরাণের ক্ষেত্রে *স্কন্দপুরাণ*-এর *কাশীখণ্ড* থেকেই শীতলার বাহন সহ স্বীকৃতিলাভ শুরু। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজে নিম্নশ্রেণি তথা সাঁওতাল, কোল, ভিল ইত্যাদি জাতির কাছে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেবী শীতলার পুরাণে উত্তরণ বা অনুপ্রবেশ বহু পরে ঘটে। সমাজের স্তরের বিন্যাসে লৌকিক দেবতার স্থান মূল পরিসরে দেবতার পাশে ঠাঁই পেতে বহু লড়াই প্রয়োজন। তাই সেক্ষেত্রে দেবী শীতলার ঠাঁই হলেও তাঁর অনুচরবর্গের স্থান তাঁর পাশাপাশি থাকলেও মূল দেবতারূপে তাদের সমাজে স্থান অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। *শীতলামঙ্গল*-এর কবিরা সেইজন্য তাঁদের অনুচর বা সহযোগীরূপেই দেখিয়েছেন কাব্যে।

দেবী শীতলার পরিবারের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে-তাঁর পরিবারের সদস্যরা হলেন- জ্বরাসুর, ঘণ্টাকর্ণ, রক্তাবতী, পঞ্চানন, বসন্ত রায় প্রমুখ। এছাড়াও আছে চৌষট্টি বসন্ত,সাত ভগিনী। জ্বরাসুর সমস্ত রকম জ্বরের নিরাময়কারী দেবতা। সমালোচক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু জানিয়েছেন-'জ্বরাসুরের আকৃতি বিচিত্র। দেহের রং নীল, কোন কোন স্থানে গাঢ় কালো কাজলের মতো। তিনটি মাথা, নয়টি চোখ, ছয়টি হাত, পা তিনটি। চুল ও গোঁফ কটা রঙের। তিন মাথার ওপর তিনটি মুকুট, গলা ও হাতে নানা অলঙ্কার। হলদে রঙের ওড়না, ধুতি ও বেনিয়ান জাতীয় ছোট জামা পড়েন। এঁর কোন বাহন বা প্রহরণ দেখা যায় না।'[১১] নানা কবির লেখা *শীতলামঙ্গল*-এর নানা ভাষ্যে জ্বরাসুরের উৎপত্তি নিয়ে নানা আখ্যান আছে। তবে সব কাব্যেই জ্বরাসুরের হল দেবী শীতলার মন্ত্রদাতা ও অনুচর। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত *তারানাথ তান্ত্রিক* গল্প সংকলনে জ্বরাসুরকে নিয়ে একটি গল্প আছে; সেখানে তন্ত্রের অনুষঙ্গে জ্বরাসুরকে বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জ্বরাসুরকে নিয়ে জ্বরের ঝাড়ন মন্ত্রও প্রচলিত আছে-

জ্বরাসুরা মহাবীরা মান্য দুই ভাই।
রাত্রিদিন খেটে মরে মহাদেবের ঠাঁই।।
ফুরছুদে ছত্রিশ রূপ মুহূর্ত্তেকে ধরে।
নারাজ মানুষে বর ফিরে ঘরে ঘরে।।
জ্বালাজ্বর পালাজ্বর কালাজ্বর বিশাখি।
দাহজ্বর উমাজ্বর জ্বর কুমতি।।
ছাড় জ্বর ভূতাজ্বর ছাড় ভালুকি।
ভাজ ঘুটিতে ডাকে তাদের ভাঙ্গের পিনাকি।।
ও জ্বর জ্বরাসুরা কোন্ দিকে চাও।
শীঘ্র শীঘ্র উমকার অঙ্গ ছাড়ি তুমি যাও।।[১২]

শীতলার আরেক সন্তানসম অনুচর- বসন্ত রায়। গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, পিঠে ধনুক, কানে কুণ্ডল, হাতে তরবারি। ইনি শীতলার সহচর ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রক দেবতা। শীতলা মহিমায় অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আরেকজন হলেন ঘণ্টাকর্ণ। ইনি শীতলার স্বামী, চর্মরোগের দেবতা। বিষ্ণুর অভিশাপে এই দেবতা পিশাচকুলে জন্মান। বিষ্ণুনাম শ্রবণ করবেন না বলে দু'কানের পাশে দুটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখেন বলে তাঁর নাম ঘণ্টাকর্ণ। গ্রামাঞ্চলে লৌকিক দেবতারূপে ঘণ্টাকর্ণ 'ঘাঁটু ঠাকুর' নামে পরিচিত। লৌকিক স্তরেই এর অধিবাস; উচ্চস্তরে অর্থাৎ সমাজের উচ্চসীমায় এর অবস্থান হয়নি। কাব্যে বর্ণিত-

ঘণ্টাকর্ণ মহাতেজা চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজা
সুদ্ধভাবে পূজে যেই জন।
অপূত্রির পুত্র হয় খণ্ডে রোগ সোক ভয়
নিবারয়ে অকাল মরণ।।
হেন স্বামি লয়ে সঙ্গে শীতলা রহিলেন রঙ্গে
হেতা ব্রহ্মা বিষ্টু ত্রিনয়ান।। [১৩]

শীতলার সহচরীদের মধ্যে অন্যতম হল রক্তাবতী। ইনি শীতলার প্রিয় সহচরী এবং সেবিকা। এর বর্ণ লাল, দুই হাত, পরিধানে নীলাম্বরী, রক্তবর্ণ অলঙ্কার শোভিতা। বাম হস্তে জল পাত্র, দক্ষিণ হস্তে তাম্বুল। ইনি শিশুসংহারকারী, বিস্ফোটকনাশিনী। শীতলার আদেশে তিনি পান-সুপারি দিয়ে ব্যাধিদের নিমন্ত্রণ করেন। রক্তবর্ণা রক্তাবতী একদিকে প্রলয়ঙ্করী, অন্যদিকে তিনিই জলধারা নিবারণ করেন, প্রলয়াগ্নি-তাঁর হস্তধৃত জলপাত্র কল্যাণ কামনায় পরিপূর্ণ। আর শীতলার পরিবারের মধ্যে বাকি থাকল তাঁর সাতবোন। আরণ্যক উপজাতি লোধা বা শবর উপজাতিরা মনে করেন-এই বোনেরা হলেন চালতাফুল, বইচা, লোহাগড়া, পদ্মফুলা, মিলমিলা ও কাদাবসন্ত। এরা হলেন বসন্তের রকমফের। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে শীতলার সাতবোনকে বলা হয় 'সাতভউনি'।[১৪]

বিভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শীতলার কথা লিখলেও সাধারণভাবে পালাগুলির মধ্যে আখ্যানগত সাদৃশ্য আছে।খড়-মাটি তৈরি শাস্ত্রানুগৃহীত শীতলা তিন রকমের-রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ। শীতলার জন্মপালায় দেখানো হয়েছে শীতলা যজ্ঞাগ্নি থেকে উদ্ভূত কৃষ্ণবর্ণা শীতলার কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। কবি নিত্যানন্দের *শীতলামঙ্গল*-এ পরিপূর্ণভাবে কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা নহুষের যজ্ঞাগ্নি থেকে দেবী শীতলার জন্ম এখানে দেখানো হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর নামকরণ করেন শীতলা। কবি নিত্যানন্দের *শীতলামঙ্গল*-এ দেবী রক্তবর্ণা ও শ্যামবর্ণা দুইই জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন। শীতলার প্রথম জন্ম বৈকুণ্ঠে-আদ্যাশক্তির অংশ হিসাবে দেবী তখন ছিলেন

রক্তবর্ণা বা ভগবতীবর্ণা। এরপর জ্বর-ব্যাধি মহামারি আক্রান্ত স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালকে রক্ষার জন্য শীতলা দ্বিতীয় জন্ম নেন। ব্রহ্মার স্খলিত বিন্দু থেকে পদ্মফুলের মধ্যেজাত সেই কন্যাই শ্যামবর্ণা শীতলা। জন্মকাহিনীর বর্ণনা মোটামুটি সবক্ষেত্রে একইরকম।

শীতলামঙ্গল-এর কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। এছাড়া অন্যান্য যেসব কবির নাম পাওয়া যায় তারা হলেন-কৃষ্ণরাম দাস, হরিদেব, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ দুর্গারাম, মানিকরাম গাঙ্গুলী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়া অপ্রকাশিত *শীতলামঙ্গল* কবি রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-রামেশ্বর ঘোষ, কবিবল্লভ, দ্বিজ শম্ভুসুত প্রমুখ। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ছাড়া কোনো কবিরই পূর্ণাঙ্গ কাব্য পাওয়া যায় না। অনেকের ক্ষেত্রে পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। হরিদেব-এর *শীতলামঙ্গল* আটটি পালা পাওয়া যায়। অন্যান্য কবিদের খণ্ড খণ্ড পালার সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন- শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর-এর '*শীতলার বিবাহপালা*', দ্বিজ দুর্গারাম-এর '*শীতলার জন্মপালা*', মাণিকরাম-এর '*মুনিপুর পালা*', রামেশ্বর ভট্টাচার্য-এর '*মগপূজা পালা*'ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বন্দনাখণ্ড, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড, নরখণ্ড এই ছককে অবলম্বন করে কবিরা কাব্য লেখেননি। কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী-র কাব্যরচনায় দেবখণ্ড, নরখণ্ড এরকম মান্যতা দেওয়া হয়নি। দেবী শীতলা নিজেই প্রচারে করেছেন তাঁর পূজা। কোনো অভিশপ্ত পুরুষ বা নারীও দেখা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবিরা পুরাণ, *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল* প্রভাব স্বীকার করে কাব্য লিখেছেন; আবার কিছু ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ এসেছে।*শীতলামঙ্গল*-এর কাহিনী খুব সহজ, সরলভাবে প্রকাশ করেছেন কবিরা। দেবী শীতলা তার অনুচরবর্গদের সাহায্যে প্রথমে স্বর্গ, তার পর পাতাল, শেষে মর্ত্যলোকে পূজা প্রচার করেন।

কাহিনীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মৌলিকতা অপেক্ষা *মনসামঙ্গল* বা *চণ্ডীমঙ্গল*-এর পরোক্ষ প্রভাবিত বা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাহিনীর নিরপেক্ষতা নেই বললেই চলে। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে-'...এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃত কাহাকে যে নায়ক করিয়া কাব্যরচনা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না; সেইজন্যে শীতলা-মঙ্গল কাব্যে নির্দিষ্ট কোনও কাহিনী নাই, সুগ্রথিত নহে, সর্বোপরি কোনও প্রথম শ্রেণীর কবিও এই বিষয় লইয়া কাব্যরচনা করেন নাই।'[১৫] দেবী শীতলাকে কবিরা যেভাবেই উপস্থাপন করুন না কেন সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে তিনি গ্রহণীয়। বহু গ্রামে আজও হিন্দুরা ছাড়াও মুসলিম, কোল, ভিল, মুণ্ডা ইত্যাদি বহু ধর্মের মানুষ তাঁর পূজায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণরা ছাড়াও সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষরাও দেবীর পূজার পৌরহিত্য করেন। কাব্যেও হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সমন্বয়ের প্রতিফলন দেখা যায়-

এখন বুঝিলাম ভাবি   শীতলা পরম দেবী

পূজিব তাহার পদযুগ।
তিনি সকলের সার   যতো ব্যাধি আদি তার
নিন্দ অধম পায় দুখ।।
বিচার করিএ দেখি   কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্বঘটে।
হিদুঁকি মোচোলমানে   পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদাজুদা বটে।।
শুনিএ কাজির স্তুতি   দয়াল হইএ অতি
জ্বরবান গেলো কুতূহলে।
কবি কৃষ্ণরাম বলে   শীতলার পদতলে
পরিতুষ্ট যাহারে ভবানী।। [১৬]

সমালোচক অশোক মিত্র তাঁর *পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন কোথায় কোথায় এখনো আড়ম্বরের সাথে এই পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উড়িষ্যায় ‘ঠাকুরাণী’, অসম প্রদেশে ‘আই’, মধ্যপ্রদেশে ‘মারই’, অন্ধ্রে ‘সোলাপুরী মা’ ইত্যাদি নানা প্রদেশে নানা নামে দেবী শীতলার পূজা প্রচলিত আছে। কিছু কিছু শীতলা দেবীর পূজা উপলক্ষে বলির প্রথাও প্রচলিত আছে। বলি প্রসঙ্গে কিছু তন্ত্রোক্ত রীতি প্রচলিত থাকলেও লৌকিক দেবী প্রদত্ত এলাকার সংস্কারই মূলত থাকা স্বাভাবিক বলে মনে হয়।*শীতলামঙ্গল* কাব্যের ক্ষেত্রে দেবী শীতলা বা তাঁদের অনুচরবর্গের মধ্যে তন্ত্রের অনুষঙ্গ থাকলেও কবিরা তন্ত্র অপেক্ষা লৌকিক সংস্কারকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কবিরা দেবী শীতলার ক্ষেত্রে নিজস্ব রীতি উদ্ভাবন করলেও দেবী আদ্যাশক্তির সাথে এবং তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের সাথে অভিন্ন করে দেখেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই -

স্তুতি করে মুনিগণ হয়্যা কৃতাঞ্জলি   ভব ভয়বিনাশিনী তুমি ভদ্রকালী।
মাহেশ্বরী মঙ্গলা শীতলা মহামায়া   জয়ন্তী মঙ্গলা তুমি তুমি সর্বজয়া।
পরমকারিণী তুমি পতিতপাবনী   আদ্যাশক্তি অষ্টভুজা অনন্ত রূ(পি)ণী।
অনুকূল হবে মাতা এই মুনিপুর   আজি হতে সর্বকাল পূজিবতোমারে। [১৭]

দ্রষ্টব্য

১. সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্ত *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,* দ্বিতীয় ভাগে (পৃ. ১২৬) দেবী শীতলা সম্বন্ধে জানিয়েছেন-' ইনি শিব-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইঁহার কবচের মধ্যেও মুন্ডমালিনী কালীর স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

শীতলা পূর্বদিগভাগে আগ্নেয্যাং রোগনাশিনী।
দক্ষিণে দক্ষিণাকালী মুণ্ডমালাবিধারিণী।
নৈর্ঋত্যাং পাতু মাং নিত্যং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকা।
পশ্চিমে পাতু মাং নিত্যং সম্মাজর্নীধরা তথা।

২. সমালোচক সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য-র মতে-'...হারীতী বস্তুতঃ শিশুমারীনিবারক এবং সন্তানদাত্রী দেবী। সে যক্ষিণী, কুবেরের স্ত্রী। তাহার মূর্তির সহিত শীতলার ধ্যানস্থ মূর্তিরও কোন সাদৃশ্য নাই। হারীতীর সহিত একাধিক সন্তানের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থলে শীতলা- মূর্তির সহিত সন্তান দেখা গিয়াছে। হারীতী ও ষষ্ঠীর প্রথম দিকের ক্ষতিকারক গুণের প্রভাব যে শীতলার উপর পড়িয়াছে, ইহা হইতে তাহাই মনে হয়।'

-*কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* পৃ. ক ৭৩।

৩. সমালোচক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *পৌরাণিকা,* দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ২৫) দেবী পর্ণশবরী-র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-'...ইনি পিশাচী, ঠিক দেবী নয়। অমোঘসিদ্ধি কুলে হরিত বর্ণ। অপর নাম পিশাচী ও সর্বমারী প্রশমনী।

তথ্যসূত্র

১.হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব* , ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫ ।

২. তদেব, পৃ. ১৫১ ।

৩. স্বামী নির্ম্মলানন্দ*, দেবদেবী ও তাঁদের বাহন,* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা, নবম সংস্করণ ১৪২৪ ।

৪. বৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত, *স্তবকবচ-রত্নমালা,* বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৮২।

৫. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য,পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫২ ।

৬. সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পা.,*কামাক্ষ্যা-তন্ত্র মন্ত্রসার* , অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০১৭।

৭. দেবব্রত নস্কর, *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮।

৮. অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় সম্পা., *দশদিশি শীতলামঙ্গল সমগ্র সংখ্যা* , ৩৩ ও ৩৪ তম একত্রিত সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৭-২০১৮, পৃ. ২০০ ।

৯.উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সংকলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ* , ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭ ।

১০.পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা., *বেদব্যাস বিরচিত স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড, নবভারত* পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৭ ।

১১. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭ ।

১২. সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ ,পৃ. ১১১।

১৩. অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩৩৪ ।

১৪. তদেব, পৃ. ১৪ ।

১৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন,কলকাতা, ২০১৫ ।

১৬. অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় সম্পা., পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০৬।

১৭. তদেব, পৃ. ৫২৬।

উপসংহার

প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের কবিদের জীবনে নানা ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তার মধ্যে তন্ত্রোক্ত বিষয় কবিদের কাব্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহু স্থানে দেখা যায়। দেবীর শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে নানা তথ্যের সমাবেশ কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রে একই বিষয় ঘুরে ফিরে নানা কবিদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে তন্ত্রোক্ত উপাদান গুলির সূত্র এই গবেষণায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তন্ত্রের উপাদানের পাশাপাশি সেকালের সমাজের বিবরণ কিছু কিছু কবিদের রচনায় বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়; আবার অনেক কবিদের রচনায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অংশ অনুপস্থিত থেকেছে। সেখানে শুধুমাত্র সেই দেবতার বিষয় ছাড়া আর কিছু প্রতিপাদ্য হয়নি। কবিদের কাব্যে এই বিষয়গুলির পাশাপাশি তৎকালীন যুগধর্মের নানা পরিচয় পাওয়া যায় যা সময়ের নিরিখে অতুলনীয় সম্পদ। গবেষণাপত্রে সেই বিষয়গুলিও দেখানো হয়েছে। মানুষের জীবনে লোকায়ত সংস্কার অনেকাংশে তাকে চালিত করে, সেই অনুযায়ী তার জীবনচর্যা নির্মিত হয়। গবেষণাপত্রের মধ্যে সেই বিষয়গুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ভূমিকা কতখানি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে । তাই সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেটুকু বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রতিপাদ্য করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যে তন্ত্রের উপাদান এই বিষয়ের নিরিখে যতটা যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দেখানো সম্ভব আমি এই গবেষণাপত্রে দেখিয়েছি। এর পাশাপাশি পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি তুলে বিষয়টির সঙ্গে পারম্পর্য কোথায় সেটিও দেখানোর চেষ্টা করেছি। মঙ্গলকাব্যের কবিরা নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন, কাব্যে নানাবিধ বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা কাহিনী নির্মাণে কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন; মৌলিকতার পাশাপাশি কুম্ভীলক বৃত্তিরও আশ্রয় নিয়েছেন। আমার এই গবেষণাপত্রে সেইদিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। কাব্যের তুল্যমূল্য বিচার করে কবির কাব্যপ্রতিভা কতখানি সুদূরপ্রসারী তাও দেখানোর চেষ্টা করেছি।

মঙ্গলকাব্যের কবিরা কাহিনী নির্মাণে নানা কৌশল অবলম্বন করলেও তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী দেনার দায়ে ভিটে ছাড়া হয়েছিলেন; কবি ভারতচন্দ্র খাজনা শোধ করতে পারেননি বলে তাঁকে কারাগার বাস পর্যন্ত করতে হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁদের জীবনের দুঃখ, কষ্ট সবকিছুই ধরা পড়েছে কাব্যে। সাধারণ মানুষের অভাব, অভিযোগের পাশাপাশি কবিদের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিগুলি কাব্যে ধরা পড়েছে। কবিদের জীবনবোধের এইদিকগুলি আমার এই গবেষণাপত্রে ধরার চেষ্টা করেছি। কবিদের জীবনে শত ঘাত-প্রতিঘাত থাকলেও সবকিছুর ঊর্দ্ধে গেয়েছেন জীবনের জয়গান। স্বীকৃতি দিয়েছেন মানবিকতাকে। সেই মানবিকবোধগুলি কাব্যের মূল অংশ জুড়ে বর্তমান। যুগ যুগ ধরে মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা সেইজন্যই কখনো ধূলিধূসরিত হয়নি। গবেষণাপত্রে সেই বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

তন্ত্র নিয়ে সাধারণভাবে নানা জনশ্রুতি থাকলেও তন্ত্র বিষয়টি মানুষের জীবনের গভীর জীবনচর্চার ফসল। তন্ত্র আবার দর্শনশাস্ত্রের শাখাও বটে। প্রচলিত ধারণা থেকে কোথায় কোথায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াগুলি আলাদা সেগুলি গবেষণাপত্রের একটি অংশে দেখানো হয়েছে। তন্ত্রের নানা উপাচার, অভিচার, ক্রিয়া ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের হিতার্থে নিয়োজিত হয়। কবিদের কাব্যে সেই বিষয়গুলি উঠে এসেছে। গবেষণাপত্রে সেই নির্দিষ্ট অংশগুলির বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

তন্ত্রের দুটি দিক আছে; একটি ব্যবহারিক দিক, আরেকটি কার্যকরী দিক। কার্যকরী দিককেই কাব্যে নানা বিষয়ের সঙ্গে অন্বিত করেছেন কবিরা। দেখিয়েছেন তন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি জীবনের সঙ্গে জড়িত। তন্ত্রের প্রতি সদর্থক মনোভাব কবিরা কাব্যে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গবেষণাপত্রে এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

তন্ত্রের যে উপাদানগুলি আমি ব্যবহার করেছি মঙ্গলকাব্যের সাযুজ্যে তার বাইরে আরো অনেক উপাদান হতে পারে, কিছু উপাদান আমি মিলিয়ে দেখিয়েছি মাত্র। এছাড়াও আরো তত্ত্বমূলক উপাদান এখানে ব্যবহার করা যেতে পারত কিন্তু বিষয়ের থেকে তার পরিধি বহু যোজন বর্ধিত হয়ে যাওয়ার কারণে তা ব্যবহারে আমি বিরত থেকেছি।

মঙ্গলকাব্য এবং তন্ত্র দুইই খুব চর্চিত বিষয়। উভয়ের পরিধি নির্দিষ্ট পরিসীমায় ব্যাপ্ত করা যায় না। আমার এই আলোচনায় যতটা সম্ভব দুটি বিষয়কে একে অপরের পারম্পর্যে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই গবেষণার নিরিখে ভবিষ্যতে পাঠক মহলে কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাব তা সময়ই ঠিক করবে, আপাতত সেই বিষয় থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. করীম মুন্সী, আব্দুল সম্পা., *মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল* , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলকাতা, ১৩২৪বঙ্গাব্দ।

২. কয়াল, অক্ষয়কুমার সম্পা., *প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল* , সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯১।

৩. কয়াল, অক্ষয়কুমার সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল* , ভারবি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫।

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ সম্পা., *রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯।

৫. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ সম্পা., *বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল* , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৭ ও ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৬. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ সম্পা. , *বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী* , বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৫।

৭. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার সম্পা., *রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল* , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলকাতা, ১৪৪৫ বঙ্গাব্দ।

৮. চৌধুরী রায়, রাধানাথ, *পদ্মাপুরাণ* , দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ২০১৭ জুন।

৯. দত্ত, বিজিত ও দত্ত, সুনন্দা সম্পা., *মাণিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল* , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

১০. দত্ত, রাজচন্দ্র সম্পা., *ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

১১. দাস, আশুতোষ সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

১২. দাস, আশুতোষ সম্পা., *দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

১৩. দাস, আশুতোষ সম্পা., *কবিকঙ্কণচণ্ডী*, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১৭।

১৪. দাস, সজনীকান্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পা., *ভারতচন্দ্র রচনাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪২৫।

১৫. নস্কর, সনৎকুমার সম্পা., *কবিকঙ্কণচণ্ডী,* রত্নাবলী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৭।

১৬. নস্কর, সনৎকুমার সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

১৭. নস্কর, সনৎকুমার সম্পা. , *কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল* , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪।

১৮. নস্কর, সনৎকুমার ও চৌধুরী, দেবায়ন সম্পা. , যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র *সাধক কবি রামপ্রসাদ,* ছোঁয়া, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০20 জানুয়ারি।

১৯. পাল, নৃপেন্দ্রনাথ সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত গোসানীমঙ্গল,* অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৪২৩ আষাঢ়।

২০. প্রামাণিক, বর্ণালী, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই কবি-মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি: তুলনামূলক অধ্যয়ন,* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র ও সিংহরায়, শুভেন্দু সম্পা., *কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলীমঙ্গল* বা *বিশাললোচনীর গীত,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

২২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য সম্পা., *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* রত্নাবলী, কলিকাতা, ২০১৫।

২৩. বিশ্বাস ,অচিন্ত্য সম্পা., *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল,* রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০ ফেব্রুয়ারি।

২৪. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ সম্পা., *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

২৫. ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ সম্পা., *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , ১৯৬৫।

২৬. ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র ও দাস, আশুতোষ সম্পা., *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

২৭. মণ্ডল, পঞ্চানন সম্পা., *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* ভারবি, কলকাতা, ২০১৭।

২৮. মহাপাত্র, পীযূষকান্তি সম্পা., *ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

২৯. মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন সম্পা., *শীতলামঙ্গল সমগ্র, দশদিশি* পত্রিকা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৮ (৩৩ ও ৩৪তম একত্রিত সংখ্যা)।

৩০. মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু সম্পা., *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১৭।

৩১. সেন, সুকুমার সম্পা, *মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল* , সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৩।

৩২. রায়, ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী* , বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৭।

তন্ত্রের আকর গ্রন্থ

১. *অন্নদাকল্পতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৩।

২. জ্যোতির্লাল সম্পা., *কুব্জিকাতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪২৫।

৩. দাস, উপেন্দ্রনাথ সম্পা., *কুলার্ণবতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০৭।

৪. তর্কতীর্থ, হেমন্তকুমার সম্পা., *মাতৃকাতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২০।

৫. তর্কতীর্থ, হেমন্তকুমার সম্পা., ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্রম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৪।

৬. দাস, উপেন্দ্রকুমার সম্পা. ,*পরশুরামকল্পসূত্রম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১২।

৭. দাস, জ্যোতিলাল ও নাথ, সৌম্যানন্দ সম্পা., *কামাখ্যাতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১।

৮. দাস, জ্যোতির্লাল সম্পা., *মায়াতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৫।

৯. দাস, জ্যোতিলাল সম্পা. , *কামধেনুতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৫।

১০. দাস, জ্যোতির্লাল সম্পা., *যোনিতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৯।

১১. দাস, জ্যোতির্লাল সম্পা., *নীলতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৮।

১২. নাগভট্ট, মহাত্মা, *বশীকরণ-তন্ত্রম্-* বা *কামরত্ন,* অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৭।

১৩. নাথ, সৌমানন্দ ও গোস্বামী, বিহারী বিজন সম্পা., *রুদ্রযামলম্(উত্তরতন্ত্রম্),* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৪।

১৪. বিদ্যালঙ্কার, রামতোষণ সংকলিত *প্রাণতোষণীতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৩।

১৫. ভৈরব (গিরি),পরমাত্মানন্দনাথ স্বামী, *শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪ ।

১৬. ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রমোহন সম্পা.,*কামাক্ষ্যা-তন্ত্র মন্ত্রসার* ,অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০১৭।

১৭. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ও মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সংকলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ* , ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭

১৮. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ও মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ,* ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭ ।

১৯. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ অনূ., *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৭।

২০. শঙ্করাচার্য, *আনন্দলহরী* , নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৮।

২১. শাস্ত্রী, অযোধ্যানাথ অনূ. , *কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১২।

২২. শাস্ত্রী, পঞ্চানন অনূ., *মুণ্ডমালাতন্ত্রম্* ,নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫।

২৩. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা., *তোড়লতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪২৫।

২৪. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা. ও ব্রহ্মানন্দগিরি সংকলিত, *শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০৮।

২৫. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা. ও অনূ. *শারদাতিলকতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৮।

২৬. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা. রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫।

২৭. শীল, কানাইলাল অনূ., *জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র,* ১২৬৯।

২৮. সর্ব্বেশ্বরানন্দ, স্বামী সম্পা., *যোগিনীতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫।

২৯. সরস্বতী, মহাবিদ্যানন্দ স্বামী, *মহাবিদ্যাতন্ত্রম্ (তারাখণ্ডম্),* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯০।

৩০. ত্রিপুরানন্দনাথ, শ্রীমৎ ভৈরব ও চট্টোপাধ্যায়, কুমার সুরজিৎ সম্পা., *নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অমৃতত্বানন্দ, স্বামী ,*শক্তি,* রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৭।

২. আহমদ , আমানতউল্লা, খাঁ চৌধুরী ,*কোচবিহারের ইতিহাস* , ১ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুর্নমুদ্রণ ২০১৫।

৩. কবিরাজ, গোপীনাথ, *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫।

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, অমাবস্যার গান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুন ১৯৫৫।

৫. গোস্বামী, মদনমোহন, *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র,* নালন্দা প্রেস, কলিকাতা, ১৯৫৫।

৬. ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., *অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [দ্বিতীয় ভাগ],* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯।

৭. ঘোষ, বিনয়, *জনসভার সাহিত্য,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৭ ।

৮. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার , *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা,* ডি.এম, লাইব্রেরি, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪২০।

৯. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার,* প্রথম খণ্ড, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

১০. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, *নিবন্ধ সংগ্রহ ১ তন্ত্র,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০।

১১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার , *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৬।

১২. চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি সম্পা., বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-র *বৌদ্ধদের দেবদেবী,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫ জুলাই।

১৩. চক্রবর্তী, সুমিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত, প্রমথ চৌধুরী *প্রবন্ধসংগ্রহ,* প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৩।

১৪. চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা, *মঙ্গলকাব্য:পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* , বিদ্যা, কলকাতা, ২০১১।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী ও সেন, নবেন্দু সম্পা., *অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা,* সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ২০০৬।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন,* নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৩, ১৪১৬।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলেখা সম্পা., অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর *মেয়েলি ব্রত,* প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৯৯৭।

১৮. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, *শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮।

১৯. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ২০০৮।

২০. জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী* , উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৪।

২১. জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, *দেবী-মাহাত্ম্য,* শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৯।

২২. ঠাকুর, পরিতোষ, গোস্বামী, বিজনবিহারী ও আমান-আল আব্দুল আযীয সম্পা. *বেদ,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২-১৩।

২৩. ঠাকুর, স্বপনকুমার, *দেব দেবীর বিয়ে,* কারিগর, কলকাতা, ২০২১।

২৪. ঠাকুর, স্বপনকুমার, *নাগ দেবদেবী ও সর্প ঐতিহ্য,* কারিগর, কলকাতা, ২০২৩।

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্য,* বিশ্বভারতী, ১৪১৭ মাঘ।

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ , *লোকসাহিত্য,* বিশ্বভারতী, ১৪১৯ বৈশাখ।

২৭. তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পা., *বৃহদ্ধর্মপুরাণ,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৬।

২৮. তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পা. ,*মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিতম্ কালিকাপুরাণম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৯।

২৯. তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পা., বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দপুরাণ,আবন্ত্য খন্ড, নবভারত* পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৭।

৩০. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা,* দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৮।

৩১. দাশগুপ্ত, চন্দ্র, তমোনাশ সম্পা., *নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ* , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুর্নমুদ্রণ ২০১১।

৩২. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ১৪২৩ আশ্বিন।

৩৩. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ভারতীয় সাধনার ঐক্য,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৭।

৩৪. দাস, উপেন্দ্রকুমার , *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০।

৩৫. দাস, উপেন্দ্রকুমার ,*শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০।

৩৬. নস্কর, দেবব্রত , *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮ অক্টোবর।

৩৭. নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩৮. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী , *দুই দেবী,* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৪১২ ।

৩৯. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী , *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন,* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা, নবম সংস্করণ ১৪২৪ ।

৪০. পোদ্দার, অরবিন্দ , *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯।

৪১. প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী,* শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪২৫।

৪২. প্রজ্ঞানানন্দ,স্বামী, *তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০১৮ জুলাই।

৪৩. প্রজ্ঞানানন্দ,স্বামী, *তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০১০ এপ্রিল।

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, *পৌরাণিকা,* ১ম খণ্ড, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫

৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, *পৌরাণিকা,* ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮।

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* তৃতীয় খণ্ড: প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮-১৯।

৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার , *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* , তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯-২০২০।

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পা., দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১।

৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন রচিত, চৌধুরী, কমল সম্পা., *মধ্যযুগে বাঙ্গলা সাহিত্য,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫ মে।

৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, *পঞ্চোপাসনা,* ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।

৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *রাজসভার কবি ও কাব্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮।

৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম , *রামপ্রসাদ,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১৪।

৫৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *ভারতচন্দ্র,* সূত্রধর, কলিকাতা, ২০২০।

৫৪. বসাক, বৈষ্ণবচরণ সংগৃহীত, *স্তবকবচ-রত্নমালা,* বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৮২।

৫৫. বসু ,পথিক সম্পা., *বিভাব প্রবন্ধ সংকলন,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৪ জানুয়ারি ।

৫৬. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা* , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭ ।

৫৭. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, *কবি ভারতচন্দ্র* , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭ ।

৫৮. বিশী, প্রমথনাথ *বাংলা সাহিত্যের নরনারী,* মৈত্রী, কলকাতা, ১৯৬৬ ।

৫৯. ব্রহ্মচারী, তারাপ্রণব , *সাধনজীবন ও দশমহাবিদ্যা,* দে'জ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১৮ মে ।

৬০. ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত, *সপ্তসতী-সমন্বিত চণ্ডীচিন্তা,* শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৯।

৬১. ভট্টাচার্য, আনন্দ সম্পা., *রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ,* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৩।

৬২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগ, কলিকাতা, মে ২০১৫।

৬৩. ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ , *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮।

৬৪. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ , *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস,* জেনারেল প্রিন্টার্স য্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০০।

৬৫. ভট্টাচার্য,নরেন্দ্রনাথ, *ধর্ম ও সংস্কৃতি/প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯ জানুয়ারি।

৬৬. ভট্টাচার্য্য, শিবপ্রসাদ, *ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৭।

৬৭. ভট্টাচার্য, সুখময়, *তন্ত্রপরিচয়,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

৬৮. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব* , ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫।

৬৯. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলা দেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড [মধ্যযুগ], জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. , কলকাতা, ২০০৩।

৭০. মিত্র, অমলেন্দু, *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪০৭।

৭১. মুখোপাধ্যায়, অণিমা, *সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৬।

৭২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত, *মনসামঙ্গলের ইতিবৃত্ত* , সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ২০১২।

৭৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত, *বাংলায় ধর্মসাহিত্য,* ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮৮ আশ্বিন।

৭৪. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,* ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ২০১৯।

৭৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার , *প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭),* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২।

৭৬. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দী,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৭।

৭৭. রায়, কার্তিকেয়চন্দ্ররচিত *ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত* ; কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩,* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ২০০২ জানুয়ারি।

৭৮. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৪১৬।

৭৯. রায়, বিশ্বনাথ সম্পা., *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪।

৮০. রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী সম্পা., *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১২।

৮১. রায়, অশোক, *মাতৃকাশক্তি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২০ জানুয়ারি।

৮২. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* প্রথম খণ্ড , নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১৪।

৮৩. শংকরানন্দ, স্বামী, *মনসাচরিত* , সোপান, কলকাতা, ২০২১।

৮৪. সরকার, দীনেশচন্দ্র, *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৮৯।

৮৫. সরকার, মহেন্দ্রলাল, *তন্ত্রের আলো,* নবপত্র প্রকাশন , কলকাতা, ২০০৬।

৮৬. সরকার, সোমব্রত , *মাতৃকা রহস্য,* সিসৃক্ষা, কলকাতা, ১৪২৭।

৮৭. সরকার, সোমব্রত, *তন্ত্রের চৌষট্টি যোগিনী ও যোগি-যোগিনীদের কথা* , গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২১।

৮৮. সরকার, সোমব্রত , *ভারতের তন্ত্রসাধক ও তান্ত্রিক সাহিত্য সংস্কৃতি,* কারিগর, কলকাতা, ২০২২।

৮৯. সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক সম্পা., *চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান,* সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০২।

৯০. সারদানন্দ, স্বামী, ভারতে শক্তিপূজা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দশম সংস্করণ ১৯৬৭।

৯১. সেন, সুকুমার , *প্রবন্ধ সংকলন ৩,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৭।

৯২. সেন, সুকুমার , *প্রবন্ধ সংকলন ৪,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮।

৯৩. সেনশর্মা, অর্জুনদেব, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ,* ভারবি, কলকাতা, ২০১৫ এপ্রিল।

৯৪. সুর, অতুল, *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১৬।

ইংরেজি গ্রন্থ

1. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Introduction To Tantra Sastra*, Jyoti Enterprises, India, 1 jan 2019.

2. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *The Serpent Power*, Dover Publications, INC. , New York, 1958.

3. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Principles Of Tantra*, New Bhartiya Book Corporation, India, 2006.

4. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *The Garland Of Letters*, Classic Wisdom, India, Reprint 2019.

5. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Hymns To the Goddess And Hymn To Kali*, Ganesh & Company, Madras, Third Edition 1982.

6. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Sakti And Sakta*, Celephais Press, Leeds, Third Edition 2009.

7. Banerji, D. *R. Pre-historic Ancient and Hindu India*, Blackie and Son (India) Limited, Bombay ,1939.

8. Bandhopadhay, Pranab. *Tantra Occultism And Spirituality*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1994.

9. Banerjea, Nath, Jitendra. *Pauranic and Tantric Religion*, Calcutta University, 1966.

10. Banerjea, Nath, Jitendra. *Development of Hindu Iconography*, Calcutta University, 1941.

11. Banerjee, C. S. *A Brief History Of Tantra Literature*, Naya Prokash, India, 1 jan. 1989.

12. Banerjee, C. S. *New Light Of Tantra* , Punthi Pustak, Calcutta ,1992.

13. Banerjee, C. S. *Tantra In Bengal* , South Asia Books, India, 2nd Edition 1991.

14. Chakraborty, ChintaHaran. *The Tantras; Studies of Their Religion and Literature*, Punthi Pustak, Calcutta ,1999.

15. Sircar, C. D. Ed. *Sakti Cult and Tara*, Calcutta University, 1960.

সহায়ক পত্রপত্রিকাপঞ্জি

১. *আমাদের চারুপাঠ,* জয়দেব দাস সম্পা., প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২ সেপ্টেম্বর,

২. *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা সংখ্যা, তাপস ভৌমিক সম্পা., শারদীয়, কলকাতা, ২০১৬।

৩. *তবু একলব্য* , মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা, দীপঙ্কর মল্লিক সম্পা., চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, তবু একলব্য, জানুয়ারি ২০১৯।

৪. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* অঙ্কুশ ভট্ট সম্পা., উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০ মার্চ।

৫. *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা,* বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পা., দ্বিতীয় বর্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০।

৬. *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা,* অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., ষষ্ঠ বর্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯-৮১।

৭. *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা,* উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পা., একাদশ বর্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

৮. *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা* , বিশেষ সংখ্যা ভারতচন্দ্র-১, প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর সম্পা., কলকাতা, ভাদ্র-মাঘ, ১৪০৯।

৯. *রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা,* অরুণকুমার বসু সম্পা., দ্বাবিংশ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই-ডিসেম্বর, কলকাতা, ১৯৮৪।

১০. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* ডাইনী বিশেষ সংখ্যা, সনৎকুমার মিত্র সম্পা., কার্ত্তিক-পৌষ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৯৫।

১১. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* লৌকিক দেবদেবীর বাহন বিশেষ সংখ্যা, সনৎকুমার মিত্র সম্পা., কার্ত্তিক-পৌষ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৬।

১২. *সুচেতনা পত্রিকা,* গৌতম মণ্ডল সম্পা., এক বিংশতিতম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, একচল্লিশতম সংকলন, জ্যৈষ্ঠ , কলকাতা, ১৪২৪।